অশোক উদ্ভিদ মাত্র

অশোক উদ্ভিদ মাত্র

চাণক্য সেন

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :

এপ্রিল ১৯৬৩

প্রকাশিকা :

অপর্ণা জানা

১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ :

জে. ডি. প্রেস

৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

ওয়েলনোন প্রিন্টার্স

১২৪/বি, রাজা রাম মোহন সরণী

কলকাতা-৭০০০০৯

প্র থ ম অ ব চ্ছে দ

ব্যবধান

রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি ; অস্থির উত্তেজনা চেপে শুয়ে পড়ার পরেও অনেকক্ষণ কেটেছে জেগে ; বার বার চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারেন নি ; নিঃশব্দে উঠে আস্তে দরজা খুলে বসবার ঘর পেরিয়ে বারান্দায় এসে একবার কিছুক্ষণ বসে থেকেছেন; বিরাট লন জুড়ে পাতলা অন্ধকার, গাছগুলি নিথর নিস্তব্ধ জমাট মৌন ; আকাশভরা তারাগুলিও নির্বাক ; সবকিছু মিলে এক বিপুল দুঃসহ চাপা প্রতীক্ষা ; অথচ অন্তত মধ্যরাত্রির আগে ব্যাপারটা ঘটে যাওয়া উচিত ছিল, গত এক সপ্তাহ ধ'রে একটু একটু ক'রে ঘটে আসছিল, কখনও খুব আস্তে, চুপে চুপে, আড়ালে, আবার হঠাৎ বেশ কদম তুলে, সপ্তাহ ধ'রে ঘটনার ছায়া বাড়ছিল, কমছিল, কিন্তু একেবারে কখনই মিলিয়ে যায় নি ; এবং গুজবে চারদিক সরগরম হয়ে গিয়েছিল ; কাল সকাল থেকে শেষ গুজবটা প্রকাণ্ড আকার ধারণ ক'রে সন্ধ্যার দিকে প্রায় সত্যে পরিণত হ'তে চলেছিল ; তিনবার টেলিফোনে তিনি অন্তত তাই জানতে পেরেছিলেন ; সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ঘটনার ছায়া ছোট হয়ে গেল, খবর পেলেন এখন ঘটবে না ; কিন্তু মাঝরাতের আগে ঘটবেই ; আপিস থেকে বাড়ি এলেন ; ক্লান্ত লাগছিল ; মুখের চেহারা দেখে অরুণা পর্যন্ত কথা বলতে গিয়েও বলেন নি ; তারপরও তিন ঘণ্টা কেটে গেল ; রাত এগারোটার শেষ বেতার-খবর শোনবার জন্যে লাইব্রেরি ঘরে তিনি একা একা বই মুখে ব'সে রইলেন ; খবর শেষ হল, ঘটনাটা ঘটল না ; অরুণা শুয়ে পড়লেন, ঘুম এল ; তিনি কিছুতেই ঘুমুতে পারলেন না, টুকরো টুকরো তন্দ্রা ছাড়া ; ঘটনাটা না-ঘটবার মতো দুর্ঘটনা সহ্য করবার ক্ষমতা তাঁর প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, ঘটবে-যে না, এ সম্ভাবনা তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না।

পাঁচটায় শয্যা ছেড়ে, লনে আধঘণ্টা হেঁটে, সকালের নিত্যিকার কর্তব্য শেষ ক'রে, স্নান সেরে, তিনি যখন প্রথম প্রভাতী বেতার-সংবাদের জন্যে রেডিয়ো খুললেন খুব আস্তে, যেমন রোজ খুলে থাকেন, এবং যখন প্রথম মিনিটেই ঘটনাটা ঘটে গেল, অর্থাৎ ঘটবার সংবাদ সম্প্রসারিত হল, তখন তিনি যা সচরাচর করেন না তাই ক'রে বসলেন, উত্তেজিত হয়ে শোবার ঘরে ঢুকে অরুণাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'এই! এই! শুনছ! শুনছ!'

অরুণা ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন : 'কি হল? তুমি এমন সাত সকালে চেঁচাচ্ছ কেন?'

তিনি তখনও সত্যিকারের চেঁচাচ্ছিলেন : 'চেঁচাব কেন? তোমাকে বলছি!'

'কি বলছ? আস্তে বল।'

'এক্ষুনি রেডিয়োতে বলল!'

'কি বলল?'

এবার তিনি একটু রাগলেন : 'তোমার মাথা সকালে একেবারে আলুসেদ্ধ হয়ে থাকে।'

অরুণা বিরাট হাই তুললেন : 'ক'টা বাজল?'

'ছ'টা পাঁচ।'

'আমাকে আটটার সময় তুলে দিও।'

'তুমি আবার ঘুমুচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ।

'ছ'টার সময় যারা ওঠে তাদের দলে তুমি নও। ঘুমুবার আগে কি ঘটল একবার শুনবে তো!'

'এই আধঘণ্টায় যখন বলতে পারলে না, তখন দু'ঘণ্টা পরে বোলো। তোমরা কি ক'রে যে রাজত্ব কর।'

'আরে শুনে নাও! তিনি গেছেন!'

'কিনি?'

'মন্ত্রী মশাই। মাঝরাত্রের পর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ঘোষণা বেরিয়েছে। তিনি গেছেন।'

বড় একটা গাছ মাটিতে পড়লে যে রকম হবার কথা, হাত দিয়ে তিনি তেমনি ইংগিত করলেন।

'তাই নাকি?' অরুণার চোখে ঘুম। 'সুখবর।'

'সুখবর বলে সুখবর! আজ সাতদিন ধরে যেতে যেতেও যেমন টিকে যাচ্ছিলেন

আমি তো ভাবলুম বুঝি বা'...।

অরুণা ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে তিনি থেমে গেলেন। তাকিয়ে রইলেন ঘুমন্ত মুখের দিকে। শ্রাগ্ করলেন। জোর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন খবরের কাগজওয়ালা গেট খুলে ভেতরে আসছে। সোজা চলে এলেন বারান্দায়। খবরের কাগজ নিয়ে চেয়ারে বসলেন। শুনতে পেলেন গাছে গাছে বাতাস বইছে, পাখি ডাকছে।

খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় ঘটনাটা বিনা সমারোহে পরিবেশিত। কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী জনার্দন দীক্ষিত নেপালে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন। আগামী সপ্তাহে তিনি নতুন পদ গ্রহণ করবেন। দু-একদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এ সুযোগে তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে বিভাগ-বণ্টনের ব্যাপক অদলবদল করতে পারেন।

চারখানা সংবাদপত্রের রাজনৈতিক অথবা 'বিশেষ' সংবাদদাতা আপাত দৃষ্টিতে চার রকম আলোকপাত করলেও, তিনি তাচ্ছিল্য হাসির সঙ্গে দেখতে পেলেন, বিষয়টি বেশ অন্ধকারই রয়ে গেছে। একজন 'নির্ভরযোগ্য' সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন, প্রধানমন্ত্রী অন্তত তিনটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়ে 'যথেষ্ট ভাবে সুখী' নন ; জনার্দন দীক্ষিতের প্রস্থানের সুযোগ নিয়ে এবার তিনি 'এক কলমে' চার মন্ত্রণালয়ের কুলপতিদের এদিক-ওদিক করতে পারেন। দ্বিতীয় সংবাদদাতার 'নিশ্চিত খবর' জনার্দন দীক্ষিতের মন্ত্রিত্ব হারানোর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভার ব্যাপক অদলবদলের কোনও সম্পর্ক নেই। তৃতীয় সংবাদদাতা বর্তমান ঘটনার সুযোগ নিয়ে দপ্তরবণ্টনে অদলবদলের প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, সূচনা-ও-সম্প্রসারণ ; এবং বহিঃবাণিজ্য দপ্তরগুলির মন্ত্রীদের মধ্যে অদলবদল হ'লে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম উন্নততর ধাপে চলতে পারে, এ উপমহাদেশের সমর্থনে পুরো আধ-কলম 'যুক্তি' দেখিয়েছেন। পড়তে পড়তে তাঁর মজা লাগল, হাসি পেল। জনার্দন দীক্ষিতের অপসারণের সুযোগ নিয়ে মন্ত্রীদের মধ্যে বেশ ক'জন তাঁদের আপন আপন স্বার্থরক্ষার কাজে অনুগৃহীত সাংবাদিকদের সদ্ব্যবহার করছেন ; এতে ক'রে আরও একবার প্রমাণিত হল, প্রমাণ তো রোজই পাওয়া যাচ্ছে, যে প্রশাসন ও সংবাদপত্র এক অতিকায় কর্পোরেশনের দুই প্রধান শরিক ; ফার্স্ট এস্টেট ও ফোর্থ এস্টেটের সঙ্গে আপাত-বিবাদের পেছনে রয়েছে শক্তিশালী আঁতাত। চতুর্থ সংবাদদাতা জনার্দন দীক্ষিতকে

'অন্যায় ভাবে' সরাবার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে মৃদু তিরস্কার করেছেন : 'জনার্দন দীক্ষিত বেশ কিছুকাল মন্ত্রিত্ব থেকে স'রে যাবার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন' ; পাঠ ক'রে তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন, 'এবং একাধিকবার প্রধান মন্ত্রীর কাছে অবসর চেয়েছিলেন। একে তো বছর খানেক ধ'রে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, তা ছাড়া দলের বড় বড় নেতারা সবাই মন্ত্রিত্ব করবেন এ নিয়ে তাঁর নীতিগত আপত্তি রাজনৈতিক মহলে অজানা নেই। নেপালে রাষ্ট্রদূত হবার আগ্রহ তাঁর ছিল না, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে, এবং ভারতবর্ষের পক্ষে কাঠমুণ্ডুর জটিল ও জরুরি কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্বের কথা স্মরণ ক'রে, শেষ পর্যন্ত এ পদ গ্রহণে তিনি রাজি হয়েছেন। বস্তুতপক্ষে চীন-পাকিস্তানের মিলিত ভারত-বিরোধী কর্যকলাপ নেপালে সম্প্রতি যে মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে তাতে জনার্দন দীক্ষিতের মতো ঝানু রাজনৈতিক নেতাকে কাঠমুণ্ডুতে রাষ্ট্রদূত নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা ও জাতির স্বার্থ-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। এর চেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত সহজে ভাবা যাচ্ছে না।'

এ সংবাদের রচয়িতা কে তিনি জানেন। তিনি যদি অন্য কেউ হতেন, তাকে ফোন ক'রে বাহবা দেওয়া যেত। 'রাজনৈতিক সংবাদে' সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংমিশ্রণ প্রায়ই ঘটে থাকে, সাংবাদিকরা পেশাগত, ব্যক্তিগত, এবং তথ্যগত কারণে মন্ত্রীদের স্বার্থ পাহারা দেয়, যতদিন মন্ত্রীরা মন্ত্রী থাকেন অথবা না থাকলেও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন না। তাহলেও বর্তমান সংবাদটির চতুরতা এমন প্রকট, উদ্দেশ্য এমন নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতায় পরিবেশিত যে সংবাদদাতাকে অভিনন্দন জানাবার এ এক অতি যোগ্য সময়। অবিশ্যি তিনি ফোন তুলবেন না ; আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কর্মজীবনে কদাপি তিনি চতুর্থ এস্টেটের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন নি ; তাঁর সঙ্গে সংবাদদাতাদের বরং খানিকটা 'ঠাণ্ডা-লড়াই'এর সম্পর্ক থেকে এসেছে। কাল, অথবা আজই দেখা হবে উক্ত সংবাদদাতার সঙ্গে—হতে পারে, তিনি হিম হাসিতে তার দিকে তাকাবেন, সে বুঝবে, বলবে না কিছু, তিনিও জানেন অনেক কিছু, মুখের কথায় তার কিছু প্রকাশ পাবে না।

চারখানা সংবাদপত্র খুঁটিয়ে পড়া তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাস। অবশ্যি, আমাদের দেশের পত্রিকাগুলি এতো বেশি একে অন্যের পুনরাবৃত্তি যে একটি পড়া হয়ে গেলে অন্যটিও প্রায় পঠিত হয়ে যায়। তথাপি কোন পত্রিকায় 'বিশেষ' কি সংবাদ এলো খুঁটিয়ে দেখতে হয়। ছোটবেলা থেকে যে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি ইংরেজি ভাষা ও 'স্টাইলে'র নিদর্শন হিসেবে মনোযোগ দিয়ে পড়া বাধ্যবাধকতায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এখনও, কয়েকটি বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ইংরেজিতে মুনশিয়ানার

কল্যাণে, সে ভাষা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নিরেট ভারতীয় ইংরেজিতে পরিণত হয নি, সে পত্রিকার সম্পাদকীয় তিনি এখনও পাঠ করেন ; বাকি কাগজের এডিটোরিয়ালে চোখ বুলান মাত্র। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় রাজনৈতিক টীকাকারদের প্রবন্ধগুলি নিয়ে বাছবিচার কিন্তু চলে না। এ সব নিবন্ধের মাপকাঠি ইংরেজি ভাষার উৎকর্ষ নয়, টীকাকারদের একান্ত নিজস্ব 'সংবাদ' এবং মতামত। এসব সাংবাদিকরা সমালোচনার আড়ালে মন্ত্রীদের স্বার্থরক্ষা করে থাকেন, কখনও কৌশলে, কখনও খোলাখুলি, আবার কখনও বা দুর্বল মন্ত্রীদের ভুপাতিত করবার জন্যে কঠিন আঘাত হানে।

যেমন আজ

'ন্যাশনাল টাইম্‌স' পত্রিকার রাজনৈতিক টীকাকার গিরিশ মাথুর মজবুত ও ধারাল ইংরেজি লেখে না। তাই বলে তার সাপ্তাহিক নিবন্ধ 'জাতীয় রঙ্গালয়ে' উপেক্ষা করা যায় না। জনার্দন দীক্ষিতের পদত্যাগ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে গিরিশ মাথুরের মন্তব্য পাঠের সময় তাঁব ভ্রূ কুঞ্চিত হল। 'শ্রীদীক্ষিতের মন্ত্রিত্ব থেকে স'রে যাওয়া ঘটনাটাকে খুব সাধারণ ব্যাপার মনে করলে ভুল হবে। তাঁর স্বাস্থ্য কিছুদিন ভালো যাচ্ছে না ; কিন্তু অস্বাস্থ্য এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অরুচি আনে না। রাজধানীর নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে কি ঘটে না ঘটে তার সঙ্গে যাদের কিছুটা পরিচয় আছে তারা জানে যে ক্ষতের অপসারণের কারণ তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ নয়। প্রথম ও প্রধান কারণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ। দ্বিতীয় কারণ, মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসি দলাদলি। দল-উপদলের নেতা হিসেবে যে ব্যক্তি জনবিদিত নিঃসন্দেহ অযোগ্যতা সত্ত্বেও বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, জনার্দন দীক্ষিত তাঁর চক্ষুশূল। প্রধানমন্ত্রীর কাছে, তারই জন্যে, শ্রীদীক্ষিত এখন অতিরিক্ত, দুর্বহ বোঝা। কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব জাতীয় পর্যায় থেকে রাজ্য-পর্যায়ে স্থানান্তরিত হ'তে চলেছে। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে দিল্লি আর ভারত শাসন করছে না ; ভারত দিল্লি শাসন করছে। মুখ্যমন্ত্রী অথবা শক্তিশালী প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতাদের দাবি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্রমশ দুর্লঙ্ঘনীয় হয়ে উঠছে।....

'এ ছাড়াও আর একটা দিক আছে এই আপাতদৃষ্টিতে 'সাধারণ' ঘটনার। এ কথা আজ প্রায় সবাই জানে যে আই-সি-এস সেক্রেটারিদের সঙ্গে বেশির ভাগ মন্ত্রীদের বনিবনাও হচ্ছে না। মন্ত্রিসভায় যাঁরা প্রধান প্রধান দপ্তরের অধিকারী, যেমন স্বরাষ্ট্র, বিত্ত, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা, সেই সব মন্ত্রীদের সমস্যা এটা নয়। সেক্রেটারিরা তাঁদের মেনে চলেন ; না মানলে, অথবা না বনলে, এ-সব মন্ত্রীরা অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়াসে নতুন সেক্রেটারি নিয়োগ করিয়ে নেন। সমস্যা হল অন্য মন্ত্রীদের। তাঁদের অনেকেরই অভিযোগ, তাঁরা সেক্রেটারিদের পূর্ণ সহযোগিতা পান না, বরং অনেক

সময় বিরোধিতা পেয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গের মোদ্দা কথা হল : শাসন করবে কারা? নীতির বিন্যাস ও প্রস্তুতিতে কার প্রভাব পড়বে বেশি? রাজনৈতিক নেতার অথবা সিভিল সার্ভিসের? এর সঙ্গে সংযুক্ত হল আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : নীতিকে কার্যে পরিণত করবার দায়িত্ব প্রধানত প্রশাসনের। সিভিল সার্ভিসের নেতারা যদি মন্ত্রীদের নীতি ও সিদ্ধান্ত উৎসাহ, শ্রদ্ধা ও সমবেদনার সঙ্গে গ্রহণ না করেন তাহলে প্রশাসনের মাধ্যমে তার বাস্তব রূপায়ণ ভেজাল ধোঁয়াটে হ'তে বাধ্য। মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকের অভিযোগ তাঁরা আই-সি-এস সেক্রেটারিদের মাধ্যমে নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে পদে পদে ব্যাহত হন। জনার্দন দীক্ষিতের ক্ষেত্রে এ সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছিল।

'শ্রীদীক্ষিত প্রায় দুবছর যাবৎ পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারির বদলি চেয়ে আসছিলেন। এ বিষয়ে তিনি একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজে দরবার করেছেন। শেষ পর্যন্ত যাঁর 'বদলি' হল তিনি সেক্রেটারি নন, মন্ত্রী স্বয়ং। এ ঘটনার প্রভাব অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ওপর একেবারে পড়বে না এমন অনুমান বোকা মানুষ ছাড়া কেউ করবে না। আজ সকালে এই প্রথম হেমন্তের দিলখুশ দিল্লিতে একটি ব্যক্তি ভগ্নহৃদয়। তাঁর নাম জনার্দন দীক্ষিত। অন্য আর একটি ব্যক্তি রঙ্গালয়ের নেপথ্যে নিশ্চয় শ্রীদীক্ষিতের বিপর্যয়ে খুশি। আমাদের রাজনীতির খেলায় এ ব্যক্তির ভূমিকা অব্যক্ত। অতএব তাঁর নাম করলে খেলার নীতিভঙ্গ হবে।'

গিরিশ মাথুরের প্রবন্ধ প'ড়ে তাঁর মুখে বিস্বাদ লাগল। কোমরের নিচে আঘাত। সংবাদপত্রের এসব পণ্ডিতরা, তিনি অনুধ্যান করলেন, যা বোঝে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে। জনার্দন দীক্ষিতের সঙ্গে তাঁর আই-সি-এস সেক্রেটারির সদ্ভাব ছিল না : ঠিক। কিন্তু দীক্ষিতের মন্ত্রিত্ব হারানোয় এ অসদ্ভাবের প্রভাব ছিল : ভুল। আসলে আমাদের নিয়ে এ পণ্ডিতদের মস্ত মুশকিল, তিনি পুরনো সত্যকে আবার অনুভব করলেন। মন্ত্রীরা রাজনৈতিক জীব। সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিজ্ঞাপন-কোম্পানির সম্পর্কের মত। অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ, পরস্পর-নির্ভরশীল। সাংবাদিকরা মন্ত্রীদের সঙ্গে লেগে থাকে, মন্ত্রীদেরও তাদের ছাড়া চলে না। আমরা এসব পণ্ডিতদের পরোয়া না ক'রেও পারি। আমি কখনও করিনি। কেউ কেউ করে। আমি সে দলে নই। তাই এসব পণ্ডিতরা আমাকে নেকনজরে দেখে না। ঈর্ষা করে। জানে আমি ওদের লোক নই। গিরিশ মাথুর, দুবছর আগে তার ছেলের চাকুরির জন্যে আমার কাছে এসেছিল, আমি, যতদূর মনে পড়ে, বলেছিলাম : আজ পর্যন্ত কোনও আবেদকের হয়ে কোথাও আমি সুপারিশ করিনি, কর্মজীবনের বাকি দিনগুলিতে করবার ইচ্ছে নেই, আপনি বরং এইচ-এমকে বলুন, তিনি তো

আপনাকে স্নেহ করেন ; সে ঘটনা গিরিশ মাথুর নিশ্চয় ভোলে নি, এইচ-এম তার ছেলের চাকুরিটাও করে দিয়েছিলেন, অবশ্যি হয়তো নিজের যোগ্যতাতেই সে পেয়ে যেত, শুনেছি ছেলেটি ভালো, সে গিরিশ মাথুর আজ সুযোগ পেয়ে আমাকে কোমরের নিচে আঘাত ক'রে বসল, অথচ একবারও তার মনে হল না যে আজ জনার্দন দীক্ষিত ভগ্ন হৃদয় হ'তে পারেন, কিন্তু অন্য, অনুক্ত ব্যক্তিটি, যার নাম উচ্চারণ না ক'রে গিরিশ মাথুর সে-নামের প্রতি রাজধানীর কৌতূহল পরিকল্পিত ভাবে বাড়িয়ে দিল, সে মানুষটি সত্যিকারের 'খুশি' নয়! জনার্দন দীক্ষিতের মন্ত্রিত্ব যাওয়াতে আমি কি খুশি?

'ন্যাশনাল টাইমস্' পত্রিকাটি মুঠোর মধ্যে জোরের সঙ্গে পিষে তিনি নিঃসঙ্গ সকালের নীরবতা ভেঙে সোচ্চারে নিজেকে প্রশ্ন করলেন : 'অ্যাম আই হ্যাপি? অ্যাম আই?' ভেতর থেকে উত্তর পেলেন, 'না। ওরা তোমাকে চেনে না। নিজেদের ক্ষুদ্র চোখ দিয়ে তোমাকে ওরা ঠিক দেখতে পায় না। ওরা বনমালীশংকর ঝা-কে চেনে না।'

চমকে উঠলেন অরুণার কণ্ঠস্বরে।

'সকালবেলা কার সঙ্গে চেঁচাচ্ছ?'

'তুমি উঠে এলে যে! আটটার এখনও অনেক দেরি।'

'তোমার চেঁচানোয় কি ঘুমুবার উপায় আছে? তুমি জানো আমি চেঁচান একদম সহ্য করতে পারি নে। আই জাস্ট্ কান্ট স্ট্যান্ড নয়েজ।'

'চেঁচাব কেন? কি বলছ তুমি?'

'চেঁচাচ্ছ তো এখনও। কান্ট'য়ু স্পিক স্লো'লি প্লিজ?'

'সরি। বলছিলাম, আমি একটুও চেঁচাই নি। একা বসে বসে কাগজ পড়ছি। চেঁচাব কেন?'

'ওয়েল, অল রাইট, বাট ইউ ডিড শাউট। কি ব্যাপার? কিছু ঘটেছে কি?'

'না, না, এমন কিছু নয়।'

'তাহলে?'

'তাহলে কি?'

'তুমি শেষরাত্রে আমাকে জাগিয়ে কি যেন বললে। মনে করতে পারছি না। তখনও তুমি দারুণ চেঁচিয়েছিলে।'

'শেষরাত্রি নয়। ছ'টা বেজে সাত মিনিট।'

'দ্যাটস্ আরলি এনাফ্।'

'সরি। কিন্তু আমি একটুও চেঁচাই নি।

'তুমি কি বলছিলে মনে নেই, কিন্তু ভীষণ চেঁচাচ্ছিলে পরিষ্কার মনে আছে। (একটু চুপ থাকার পর, খানিকটা বিষণ্ণ স্বরে) তুমি প্রায়ই ভুলে যাও আমার হার্ট একদম চেঁচান সইতে পারে না।'

খুব আস্তে : 'নট ইওর হার্ট, অরুণা, ইওর নার্ভস্।'

'একই কথা। তোমার চেঁচানোয় একদিন আমি টুক ক'রে ম'রে যাবো।

'আই'ম্ সরি।'

'কি ব্যাপার বল তো এবার?'

'এমন কিছু নয়। আমি আটটায় বেরুবো।'

'রামপ্রসাদ উঠেছে।'

'কিচেনে আওয়াজ পাচ্ছ না?'

'আমি তোমার ব্রেকফাস্ট দেখছি।'

'থ্যাংক'য়্যু।'

'লাঞ্চে আসবে তো?'

'না।'

'মালিকদের বাড়িতে কাল ডিনার আছে।'

'মনে আছে।'

'গৌতমকে আজ তোমার চিঠি লেখার তারিখ।'

'তুমি লিখে দাও। আমার আজ সময় নাও হ'তে পারে।'

'আমি? আমি কি লিখব? আই রিয়েলি ফাইন্ড নাথিং টু টেল হিম।'

'তুমি বড্ড দুশ্চিন্তা করো। লেট হিম লিভ হিজ্ লাইফ।'

'তাছাড়া করছে-টা কি?'

'লেট হিম।'

রামপ্রসাদ চা নিয়ে এল। অরুণা চা পরিবেশন করলেন।

'আসচে শুক্রবার রমীর বিয়ের তারিখ।'

'তাই বুঝি?'

'ওকে কিছু একটা কিনে পাঠাতে হবে।'

'পাঠিয়ো।'

'লাঞ্চের পর গাড়িটা পেতে পারি?'

'অনায়াসে। বাট্'—

'বাট্ আই কান্ট ড্রাইভ। ডাক্তার আমাকে ড্রাইভ করতে বারণ করেছেন, তা তুমি জানো।'

'আপিসের ড্রাইভার তোমাকে নিয়ে শহরে ঘুরে বেড়াক এটা আমার পছন্দ নয়।'

'তাহলে তুমি এসো।'

'পাবলে আসতাম।'

'আমি এই হার্ট নিয়ে ড্রাইভ করতে পারবো না। তুমি আসতে অক্ষম। অথচ দোকানে যেতে হবে। তুমি তো এত বড় একটা মানুষ। সল্‌ভ্ দিস্ সিম্প্‌ল্ প্রব্লেম।'

'আজ থাক। আর একদিন যেয়ো।'

'ক্যালেন্ডার নিয়ে আসছি, আজ না গেলে আর হবে না। তুমি যখন বাড়ি ফের দোকানপাট সব বন্ধ। আগামী পাঁচদিন প্রত্যেক সন্ধ্যায় ডিনারের নেমন্তন্ন রয়েছে।'

'কিন্তু অরুণা, আজ থাক। আমি সত্যি চাই নে আপিসের ড্রাইভার নিয়ে আজ তুমি বেরোও।'

'প্লিজ, চেঁচিও না। আজকাল আমি যা করতে চাই তুমি একটা না একটা বাধা দাও। আমাকে এ ভাবে উত্তেজিত করা একদম বারণ তা জান? উত্তেজিত হলে একদিন টুক করে'—

'অলরাইট। গাড়ি আসবে। দোকান সেরে টুক ক'রে বাড়ি ফিরে এসো। আর কোথাও যেও না।'

'তোমাকে আমি সত্যি বুঝতে পারি নে। মিসেস কাপুর রোজ স্টাফ্ কার ব্যবহার করে। সীতা দেশাই স্টাফ্ কার এবং দপ্তরের ড্রাইভার দুটোই দরকার মত পেয়ে থাকে।'

'আমি এইচ পি কাপুর নই, ভি ভি দেশাইও নই। আমি অতি সাধারণ বনমালীশংকর ঝা।'

সাধারণত সকাল ন'টা বাজতে তিনি দপ্তরে হাজির হন। কৃষিভবনের পুরো তিনতলা পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়। তিনতলার দক্ষিণ প্রান্তে পর পর তিনটি স্যুট: মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব। সেক্রেটারিয়েটের চলতি ভাষায় এম আই পি., এম. এস আই পি, সেক্রেটারি। মন্ত্রীর নিজস্ব প্রশস্ত সুসজ্জিত দপ্তর ঘরের সঙ্গে বিরাট বৈঠকখানা, দামি কার্পেটের ওপর চমকদার সোফাসেট, অনুরূপ অন্যান্য আসবাবপত্র। প্রতিমন্ত্রীর আপিস-স্যুট মন্ত্রীর তুলনায় সামান্য ছোট, তফাত সহজে চোখে পড়ার নয়। সেক্রেটারির আপিস-ঘর মন্ত্রীর ঘরের মতোই প্রশস্ত। অর্ধবৃত্তাকার টেবিলের সামনে দু'সারি ডানলোপিলো-রেক্সিন মোড়া চেয়ার,

মাঝখানে প্রশস্ত কার্পেটের ওপর সোফাসেট, এক অংশে বিরাট নরম চামড়া-বাঁধান দেহ-এলাবার চেয়ার, পাশে ছোট টেবিলে কয়েকখানা বই, সিগারেটের ওয়ালনাট বক্স, অ্যাসট্রে। অর্ধবৃত্তাকার টেবিলে চার সেট টেলিফোন, একটিতে সেক্রেটারি দরকার মতো ডায়াল ক'রে কথাবার্তা বলতে পারেন, অর্থাৎ ডাইরেক্ট লাইন, অন্যটি তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে সংযুক্ত, তৃতীয়টি হাউস ফোন, চতুর্থটি, লালবর্ণের সরকারের অন্যান্য সেক্রেটারিদের সঙ্গে যোগাযোগের 'হট-লাইন'। অর্থাৎ প্রয়োজন মত পূর্ত ও বিদ্যুৎ বিভাগের সেক্রেটারি। বি. এস. ঝা 'হট-লাইনে' সরাসরি কথা বলতে পারেন হোম সেক্রেটারি অর্জুনপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে, কিংবা ফরেন সেক্রেটারি কিশোরলাল কাউলের সঙ্গে। ঝা-র দপ্তর স্যুটের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সেক্রেটারিয়েট; পাঁচজন লোক নিয়ে সদা-সন্ত্রস্ত সদা-ব্যস্ত বিরাট ঘর, যার প্রধান হরিপ্রসাদ আগরওয়াল। মন্ত্রণালয়ের বাকি অংশ থেকে এই তিন অংশকে পৃথক ক'রে রাখা হয়েছে একটি সুন্দর নির্মাণশিল্প, যার জনক বি. এস. ঝা নিজে। সি-পি-ডব্লু-ডি'র এনজিনীয়রদের সঙ্গে বসে তিনি যে নির্মাণশিল্প তৈরি করেছিলেন, পাথর, ইট, সুরকি, সিমেন্ট, রং এবং মানুষের মেহনত একত্র হয়ে যখন তার রূপায়ণ হল, দেখা গেল ভারতবর্ষেব একটি বিরাট রিলিফ ম্যাপের ওপর বড় বড় পূর্ত ও বিদ্যুৎ প্রজেক্টগুলো বিজলি আলোয় প্রতিভাত, এবং এই ম্যাপেব মধ্য দিয়ে দ্বারপথে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-সচিবের নির্দিষ্ট, পৃথক অংশ। এ অংশের দেয়াল পূর্ত ও বিদ্যুৎ প্রজেক্টের কল্যাণে সমাজ-বর্ধনের নানাবিধ বঙিন ছবিতে শোভিত। অনেকগুলি ছবি স্লাইড, বিজলি বাতিতে উজ্জ্বলিত।

তিন মহারথীর নীচে মন্ত্রণালয়ের উঁচু-মাঝারি-নিচু-খুব নিচু মানুষের সুনির্দিষ্ট সমাবেশ। এ সমাবেশের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি নিরাময় বায় , তার পবেব পঙ্‌ক্তিতে চাবজন জয়েন্ট সেক্রেটারি, তিনজন ডাইরেক্টর, বারোজন ডেপুটি সেক্রেটাবি, আঠারজন আন্ডার সেক্রেটাবি পঁচিশজন সেকশন অফিসর, একশ' তিনজন অ্যাসিস্টেন্ট, দু'শো তেরজন ইউ-ডি-সি, তিনশ' তেইশজন এল-ডি-সি। তাছাড়া আছেন পঁয়তাল্লিশজন স্টেনোগ্রাফার ও টাইপিস্ট, সাতাশজন পিওন-চাপরাশী-দপ্তরি। অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ের টেকনিক্যাল স্টাফ। এঁদের বেশির ভাগ বসেন অন্য কয়েকটি দপ্তরে, যেখানকার কাজ মুখ্যত পারদর্শিক। মন্ত্রণালয়ে জয়েন্ট সেক্রেটারিদের সমান্তরাল চারজন অ্যাডভাইজর, অর্থাৎ উপদেশক। পূর্ত ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে এঁরা মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেন, প্রজেক্টগুলির পরিকল্পনাকে খুঁটিয়ে বিচার করেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুখ্যাত পারদশী হলেও মন্ত্রণালয়ের পিরামিডে এদের স্থান সবার ওপরে তো নয়ই, বরং বেশ খানিকটা নীচে। জয়েন্ট সেক্রেটারিদের সমান

মর্যাদা এঁরা কেবল কাগজে-কলমেই পেয়ে থাকেন। সেক্রেটারিয়েটে সবাই জানে প্রকৃত ক্ষমতা ও প্রভাব এঁদের চাইতে জয়েন্ট সেক্রেটারিদের অনেক বেশি।

বনমালীশংকর ঝা যেহেতু ন'টায় দপ্তরে আসেন তাই তাঁর সেক্রেটারি হবিপ্রসাদ আগরওয়ালকে পৌনে ন'টায় আপিসে পৌঁছতে হয়। অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি নিরাময় রায় সাধারণত আসেন সাড়ে ন'টায়। জয়েন্ট সেক্রেটারিদের মধ্যে দুজন, মহেশচন্দ্র শর্মা ও পি. বিশ্বনাথন, সাড়ে ন'টায়। অন্য দুজন, বিজনবিহারী ভগৎ ও দীপংকর দয়াল ন'টার একটু আগেই আসেন। মন্ত্রী জনার্দন দীক্ষিত সাধারণত দশটায় উপস্থিত হন, যদি অন্য কাজে আটকে না যান। প্রতিমন্ত্রী জগৎভাই প্যাটেল আসেন নিজের ইচ্ছা-মর্জি মতো, কোনওদিন দশটায় আবার কখনও বারোটার পর, কখনো-বা একেবারে লাঞ্চের পর।

সাড়ে আটটায় দপ্তরে পৌঁছে বনমালীশংকব ঝা দেখতে পেলেন তিনতলা একেবারে জনশূন্য, ঘরের পর ঘর বন্ধ, করিডরে মানুষের ছায়ামাত্র নেই, প্রকাণ্ড মৌন পাথরের সঙ্গে মিশে প্রাচীন হয়ে গেছে। লিফ্‌টম্যানেরা তখনও হাজির হযনি; ঝা নিজেই চাবি দিয়ে লিফ্‌ট্ খুলে তিনতলায় উঠে এসেছেন। তাঁব দপ্তরের সংলগ্ন স্পেশাল লিফ্‌ট্, পঞ্চাশ গজ হাঁটলেই খাস কামরা, কিন্তু পুরো দপ্তরটাকে এমন নির্বাক নীরব দেখে ইচ্ছে হল করিডরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত হেঁটে যেতে, আবার হেঁটে ফিবে আসতে, নিজের পদধ্বনি নিজেব কানে শোনবার জন্যে। একটু এগিয়ে যেতে দয়ালের ঘর থেকে বেরিয়ে এল 'ফরাস', অর্থাৎ জমাদার ; ঝাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সেলাম ঠুকতে ভুলে গেল, তারপব, ভুল শোধরাবার জন্যে, বার বার সেলাম দিতে লাগল। তার দিকে নজর না দিয়ে ঝা নিজেব কামরার দিকে ফিবে এলেন।

আসনে ব'সে টেলিফোনে ডায়াল করলেন।

'আমি বনমালী বলছি।'

'বল।'

'তুমি এরই মধ্যে দপ্তর পৌঁছে গেছ?'

'সাধারণত সোওয়া আটটায় আসি।'

'আমি ন'টার আগে পেরে উঠি নে।'

'আমাকে পারতেই হয। সাড়ে ন'টার আগে জরুরি কাজগুলি না সারতে পারলে সারাদিন আর সময় পাওয়া যায় না।'

'যা বলেছ। আমি তো একদিনও সন্ধ্যা সাতটার আগে বেরুতে পাবি না।'

'আমার প্রায়ই সাড়ে আটটা হ'য়ে যায়।'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হ'লে ভারত সরকারের মোস্ট ইম্পরট্যান্ট সেক্রেটারি।'

'যদি কমপ্লিমেন্ট দিতে চাও বলব, ধন্যবাদ। আর যদি ব্যঙ্গ কর, বলব, কাট অফ্। তা বল, তুমি তো শেষ অবধি জিতলে।'

'নাউ, অর্জুন, ডোন্ট টক্ লাইক্ দ্যাট্ রেচেড্ গিরিশ মাথুর।'

'গিরিশ মাথুর! সে আবার কে?

দুজনে হেসে উঠলেন।

'একটা খবর জানতে চাই।'

'প্রশ্ন কর। জানা থাকলে বলব।'

'আমি কি এখানেই থাকব, না আমাকে অন্যত্র পাঠান হচ্ছে?'

'যতদূর জানি, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় নি। তোমার কি ইচ্ছে?'

'স্থানান্তরে আপত্তি নেই। তবে, একটু পরে হলে....আমার কথাটা বুঝতে পারছ?'

'বোধহয় পারছি।'

'মন্ত্রীরা রাজনৈতিক জীব। আজ আসে, কাল যায়। আজ ওঠে, কাল পড়ে। আমরা প্রশাসনের স্থায়িত্ব রক্ষা করি। তাদের সঙ্গে উঠতে পড়তে হলে আমরাও পলিটিশিয়ান হয়ে যাব। কি বল?'

'একমত।'

'ধরো, আগামি নির্বাচনে কেন্দ্রে যদি কোয়ালিশন হয় ..

'তুমি কি তাই হবে ভাবছ নাকি?'

'হয়তো হবে না, কিন্তু হ'তেও তো পারে! অন্তত একদিন তো হবেই!'

'সেদিন যেন আমি না থাকি।'

'আমিও। বলছিলাম. আমাদের আসল ভূমিকা, প্রশাসনের স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা. তাকে বাঁচাতে গেলে মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠ-বোস করা চলবে না।'

'একমত।'

'শুনে আনন্দ হল। এ বিষয়ে যদি তোমার কিছু করার থাকে...'

'করব। চট ক'রে সম্ভবত কিছু হচ্চে না।'

'বড় রকমের অদলবদল হবে নাকি?'

'জানি না। তবে, এটা তো বোঝ, তোমাকে স্বস্থানে কিছুদিন রাখার সহজতম পথ হল বড় রকমের অদলবদল প্রস্তাব করা।'

'রাইট।' দুজনে একসঙ্গে হাসলেন।

বনমালীশংকর ঝা বললেন, 'তুমি তো আসচে সপ্তাহ বাইরে যাচ্ছ।'

'দশ দিনের জন্যে। হোম মিনিস্টরের সঙ্গে।'

'হোম মিনিস্টর ফরেন ট্যুর করেন কেন, বলতে পারো?'

'ঘর-বার এক হয়ে গেছে, তাই।'

'আচ্ছা, অর্জুন, তোমার সময় আর নেব না।'

'ও-কে, কিছু ভেব না। এবার ছাড়ি। পি. এম.-এর সঙ্গে মিটিং আছে, দশটায়।'

'বাই বাই। একদিন এসো বাড়িতে।'

'যাবো। অরুণা ভালো আছে তো?'

'নার্ভাস সিস্টেমটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তোমাকে আর আটকাবো না। আমারও আজকের দিনটা খুব সহজ নয়।'

'অনুমান করতে পারছি। ওয়েল, গুড লাক।'

বনমালীশংকর ঝা 'হট লাইন' ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন। মাথাটা একটু ধরেছে। গত রাত্রে নিদ্রার অভাব। আজকাল প্রায়ই অতিরিক্ত শ্রম অথবা দুশ্চিন্তা মাথাটা সুস্থতার সঙ্গে সামলাতে পারে না। জনার্দন দীক্ষিতের প্রস্থান বড় ঘটনা। কিন্তু আজ আর সমস্যা নয়। দীক্ষিতের রাজনৈতিক জীবন অস্তগত। আজকার প্রধান সমস্যা হল তাঁর স্থানে কে আসবেন। নতুন মন্ত্রী নিয়ে আসেন নতুন উপদ্রব। আইডিয়ার উপদ্রব খুব একটা ঘটে না। ঘটে অন্য ধরনের, অন্য কায়দার উপদ্রব। প্রত্যেক মন্ত্রী চায় সেক্রেটারি তাঁর 'পছন্দমত' হোক। তাই সম্ভব না হলে, প্রায় হয় না, তিনি জয়েন্ট সেক্রেটারিদের অদলবদল করতে উঠে প'ড়ে লেগে যান। অনুগত, বশংবদ জয়েন্ট সেক্রেটারি না হলে সেক্রেটারিকে 'নিরস্ত্র' এবং নিরংকুশ করা যায় না। বনমালীশংকর ঝা ভাবলেন, চারজন জে. এসের মধ্যে দুজন ছিল দীক্ষিতের তাঁবেদার। মহেন্দ্র শর্মা : মধ্যপ্রদেশের এডুকেশন সেক্রেটারি ছিল, দীক্ষিত নিয়ে এসেছিলেন নিজের মন্ত্রণালয়ে প্রধানত দু কারণে। মহেন্দ্র শর্মা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, দীক্ষিতের রাজনৈতিক শত্রু, দিগম্বরচরণ মিশ্রের, অপ্রিয়পাত্র। তাকে হাতের কাছে পেলে মধ্যপ্রদেশের রাজনীতির ওপর খানিকটা দখল রাখার সুবিধে। আজ তিন বছরে মহেন্দ্র শর্মা অন্ত ত্রিশ বার ভূপালে গেছে এমন সব গোপন কাজে যার সঙ্গে পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। মহেন্দ্র শর্মাকে দিয়ে দীক্ষিতের দ্বিতীয় বৃহৎ কাজ ছিল সেক্রেটারির সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে তার ব্যবহার করা। পি. বিশ্বনাথন, তামিলনাদের লোক, সব দিক বাঁচিয়ে চলার ঝোঁক তীক্ষ্ণ ; তাহলেও সে মধ্যপ্রদেশের আই-এ-এস, দীক্ষিতকে দক্ষিণে না রাখতে পারলে তার ক্ষতির সম্ভাবনা। নতুন মন্ত্রী যদি এ দুজনকে সরিয়ে দুজন নিজের লোক নিয়ে আসেন, বনমালীশংকর ঝা আপত্তি করবেন না। অবশ্যি যারা

আসবে তারা এদের চেয়েও খারাপ হ'তে পারে। অন্য দু'জন জে. এস-কে নিয়ে তাঁরা দুশ্চিন্তা নেই। বিজন বিহারী ভগৎ ও দীপংকর দয়াল মোটামুটি তাঁর নিজের লোক। বিশ্বাস অথবা নির্ভরের যোগ্য একজনও নয় ; দীপংকর দয়াল তো নয়ই। এদের চরিত্রবল নেই, মন্ত্রীদের মেজাজ মত চলবার আগ্রহ এতো প্রকট, এতো সহজে এরা তাঁবেদার হয়ে ওঠে, যে এদের হাতে প্রশাসনের পূর্ণ দায়িত্ব একদিন আসবে ভাবতেও বনমালীশংকর ঝা ভয় পান। নিরাময় রায়কে নিয়েও তাঁর মাথাব্যথা নেই। একে তো সে বাঙালি, সুতরাং দাঁতের জোর কম, তা ছাড়া, বনমালী জানেন, তার প্রধান লক্ষ্য ইউ. এন, অথবা ওয়ার্লড ব্যাংক। শেষ দলের আই. সি. এস ; সেক্রেটারি হবার দেরি আছে, 'অ্যাডিশনাল' থেকে খুশি নয়, না হবারই কথা, আসলে 'অ্যাডিশনাল' ও 'জয়েন্টে' খুব তফাত নেই ক্ষমতার, বরং 'জয়েন্ট'রা 'অ্যাডিশনাল'কে কোণঠাসা ক'রে রাখতে চায় সব সময়। তা ছাড়া নিরাময় লোকটি মন্দ নয়, কালচার-কালচার বাতিক আছে, ওয়েল, বেশ এফিমিনেট্, আর ওর স্ত্রী শিখা মেয়েটি বেশ, সুন্দর ফিগর, বনমালী মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে একটি আকর্ষণীয় নারীমূর্তি দেখতে পেলেন।

আসল সমস্যা এদের নিয়ে নয়। জনার্দন দীক্ষিতের স্থানে নতুন মন্ত্রী কে হবেন তাই প্রধান প্রশ্ন। জগৎভাই প্যাটেলের মন্ত্রী হবার সম্ভাবনা কম, নেই বললেই হয়। দীক্ষিতের সঙ্গে প্যাটেলের সম্পর্ক কোনওদিনই কোমল ছিল না, বছর খানেক কঠিন হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত দুজনেব মধ্যে সরাসরি কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্যাটেল লোকটা যদি আর একটু বুদ্ধিমান হ'ত তাহলে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর লড়াইটা উপভোগ্য হ'তে পারত। জনার্দন দীক্ষিত আর যাই হোন বোকা নন, বরং বুদ্ধিমান ও চতুর। জগৎভাই প্যাটেলের না আছে তীক্ষ্ণবুদ্ধি না আছে প্রশংসা করবার মতো চাতুর্য। কি যোগ্যতা নিয়েই না এঁরা সব মন্ত্রী হচ্চেন আজকাল , ক্ষোভের সঙ্গে বনমালী ভাবলেন ; কেন্দ্রেই এ অবস্থা, রাজ্যে রাজ্যে কি যে ঘটছে ভাবতেও দম আটকে আসে।

দরজায় টোকা দিয়ে আগরওয়াল ঘবে ঢুকল।

'গুড মর্নিং, স্যার। আপনি একটা ফোন করলেই আমি চ'লে আসতাম।'

'দরকার ছিল না।'

আগরওয়াল চটপট বনমালীর টেবিল, বইএর সেলফ্, ফাইলের ট্রেগুলি সব গোছাতে লেগে গেল। এ কাজ রোজ সকালে ফরাস ও পিওনরা ক'রে থাকে, কিন্তু হরিপ্রসাদ দপ্তরে এসে, নিজের টেবিল গুছিয়ে নেবার পরই, স্বয়ং সেক্রেটারিব কাগজপত্র টেবিল-সেলফ্ গুছিয়ে দেয়।

এই সময়ে বনমালীর নিজস্ব পিওন দুখনলাল ঘরে ঢুকল। সাহেবের পরে দপ্তরে হাজির হওয়ার অপরাধ সামলে নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল, ঘরে ঢুকে সেলাম ঠুকে চেয়ার, সোফাসেট সব মুছে ফেলল, বনমালীর পোর্টফলিও সাফ করল, গ্লাসে জল রাখল, অ্যাসট্রেগুলি যত্নে ঘষে চকচকি বাড়াল, তারপর আবার সেলাম দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দরজার অদূরে নিজের কুরসিতে গিয়ে বসল।

বনমালী প্রশ্ন করলেন : 'আজকের এনগেজমেন্ট কি আরও কিছু আছে, না এই সব?' দৃষ্টি তাঁর ডেস্ক ক্যালেন্ডারে।

আগরওয়াল নোটবই খুলে বলল, 'তিনটেয় বিজ্ঞান-ভবনে ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার কমিশনের সেমিনার আছে। ওটা বোধহয় আপনার ক্যালেন্ডারে লেখা হয় নি।'

'হয়েছে।'

'মিঃ গৌতমকে চিঠি লিখবার তারিখ।'

'মনে আছে।'

'পর্শু আপনার মাদ্রাজ যাবার কথা। ওটা কি এখন স্থগিত থাকবে?'

'না। বুকিং কনফার্মড? গুড। একটা 'তার পাঠিয়ে দাও, আমি একদিন, মানে একরাত্রি, থাকব। পরের দিনই চ'লে আসব।'

আগরওয়াল নোট নিল।

'সাড়ে দশটায় এম-আই-পি'র ঘরে মিটিং আছে। ওটা কি হবে?'

(এম-আই-পি—মিনিস্টর ফর ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার)।

বনমালী হেসে ফেললেন : 'খোঁজ নিও।' একটু পরে : 'উনি আসবার সঙ্গে সঙ্গে যেন খবর পাই।'

'এম-এস-আই-পি বরোদায় আছেন। বোধ হয় আজই চলে আসবেন।'(এম-এস-আই-পি=মিনিস্টর অফ স্টেট ফর....)।

'এম-এস-আই-পিকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তাঁর সেক্রেটারি যা করার করবে।'

'প্রফেসর গুলাটি এসেছেন চণ্ডীগড় থেকে। কাল দুবার ফোন করেছিলেন। আসতে চান।'

'সাড়ে চারটায় আসতে পারেন। আসবার আগে যেন একবার চেক করেন। শোন, এম-আই-পির লাইফ স্কেচটা তৈরি রেখো। তুমি বরং পি-আই-বি থেকে ওঁর সম্বন্ধে যা পাওয়া যায় নিয়ে এসো। না, তোমার যাবার দরকার নেই। আই-ও, কে (ইনফরমেশন অফিসর) ব'লে দাও। দু'চারটে বক্তৃতা তো করতে হবে।'

টেলিফোন বাজল।

'গুড মর্নিং স্যর, আমি দয়াল। আপনি ফ্রি আছেন? আসতে পারি?'

'মিনিট পাঁচেক পর।'

বনমালী দীনদয়ালকে বললেন : 'কয়েকটা দরকারি কাজ আছে, নোট করে নাও। প্রেস থেকে কেউ দেখা করতে চাইলে বলবে আজ সময় হবে না, কাল পর্শু যেন খোঁজ নেয়। আই-ও'কে বলবে পাঁচটার সময় আমার কাছে আসতে। মিঃ রায় অফিসে এলেই ঘরে আসতে বলবে। রামস্বামী:কে বলবে ছ'টার সময় আমার সঙ্গে দেখা কবতে। রামস্বামী কে বুঝতে পারছ তো? পাওয়ার সেকশনের ইউ-ডি-সি। ব্যস। এখন এ পর্যন্ত। ও হ্যাঁ, খুব জরুরি, না হ'লে টেলিফোন আমাকে ঘণ্টাখানেক দেবে না। আরও একটা কথা আছে। আমি হযতো বেশি সময় এখানে থাকবো। তুমি চলে যেয়ো। রামনাথন যেন থাকে।'

আগরওয়াল নির্গত হওযার সঙ্গে সঙ্গে দয়াল ঘরে ঢুকল। ছোটখাট মোটাসোটা মানুষটিব সঙ্গে বনমালীর চেহারার প্রভেদ দুজনে একত্র হলে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। বনমালী ছাপ্পান্ন বছর বয়সেও শালপ্রাংশু ; দেহের কোথাও মেদের আধিক্য নেই। রং উজ্জ্বল তামাটে, চওড়া কপালে গভীর কুঞ্চন, মোট ভ্রূর নীচে কোটরাগত চোখ সকৌতুক হাসিতে চকচকে। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট বনমালীশংকর ঝা, এককালে টেনিস খেলায নাম ছিল, এখনও গল্‌ফের মাঠে সুনাম আছে। দয়াল ছাত্রবেলায় খেলে নি, কখন-সখন ফুটবল ছাড়া, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি দেহের ওজন একশ' সাতান্ন পাউন্ড, এক চতুর্থাংশ মনে হয়, ভুঁড়ির। সাতান্ন বছরে মাথার চুল তিনভাগ সাদা। একমাত্র উত্তরপ্রদেশ জন্মভূমি ছাড়া ঝা ও দয়ালের মধ্যে মিল নেই বললেই হয়। ঝা ব্রাহ্মণ, দয়াল কায়স্থ। ঝা জমিদার বংশের ছেলে, এলাহাবাদ য়ুনিভারসিটির উত্তম উৎপাদন, বিলেতে গিয়ে শক্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আই. সি. এস.। দয়াল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র, আইন পাস ক'রে লক্ষ্ণৌ শহরে যখন কিছুতেই প্র্যাকটিস তৈরি করতে পারছিল না, সে-সময় সৌভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণানন্দের নজরে পড়ে যাওয়ায় তার 'রাজনৈতিক' জীবনের উন্মেষ। সেই থেকে দয়াল সম্পূর্ণানন্দের সেক্রেটারি জেলে ও জেলের বাইরে তাঁর-পার্শ্বচর। এবং যেহেতু সম্পূর্ণানন্দ ছিলেন পণ্ডিত, চিন্তাশীল ও প্রগতিবাদী, স্বয়ং নেহেরু তাঁকে একদা মার্ক্সবাদের তুলনায় কংগ্রেসি সমাজবাদ কেন ভারতের পক্ষে অধিকতর গ্রহণীয় তা প্রমাণ করবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, দয়ালকেও তিনি নিজের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ দয়াল ক্রমে ক্রমে একাধারে সম্পূর্ণানন্দের রাজনৈতিক চর, ব্যক্তিগত সেক্রেটারি, রিসর্চ অ্যাসিস্টেন্ট, বক্তৃতার খসড়া প্রস্তুতকারক, এককথায় অপরিহার্য

অনুচর হয়ে উঠল। সম্পূর্ণানন্দ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবার সঙ্গে সঙ্গে, অতএব, দয়াল নিযুক্ত হল তাঁর 'স্পেশাল প্রাইভেট সেক্রেটারী' ; এবার তার হাত পাকল মীরাট-এলাহাবাদ-বেনারস-বেরিলী-আগ্রা লখ্‌নউর দলীয়-উপদলীয়-রাজনীতিতে। হাত পাকার সঙ্গে সঙ্গে দয়াল বুঝতে পারল, রাজনীতিতে সম্পূর্ণানন্দের স্থান সাময়িক ; দুটি প্রধান ও তিনটি অপেক্ষাকৃত গৌণ দলের সংঘাত ও কাড়াকাড়িব পরিবেশে মধ্যবর্তী সম্পূর্ণানন্দ প্রধানত ভারসাম্য রক্ষক। বুঝতে পেরে দয়াল সম্পূর্ণানন্দের কাছে আপন ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করবার জন্যে যে অনুগ্রহ চাইল, জটিল-পথে দু বছর তিনমাস ঘোবাঘুরির পর, তার পরিণতি হল ; দীপংকর দয়াল স্পেশাল রিক্রুটমেন্টে আই-এ-এস হল। উত্তরপ্রদেশেব রাজনৈতিক খেলায় সম্পূর্ণানন্দ যেদিন হারলেন, এবং তাঁকে রাজ্যপাল হয়ে অন্য রাষ্ট্রের আতিথ্য গ্রহণ করতে হল, তখন দীপংকর দয়াল চন্দ্রভান গুপ্তের বিশ্বস্ত, মীরাটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অন্য ভাষায় চরণ সিংহের 'রাজ্যে' সি. বি. গুপ্ত কর্তৃক নিযুক্ত 'সুবেদার'। সি. বি. গুপ্ত-কমলাপতি ত্রিপাঠী-চরণ সিংহের উপদলীয় সংঘাতে প্রথম যেবার সি. বি. গুপ্ত পরাজিত হলেন, মুখ্যমন্ত্রিত্ব পেলেন ত্রিপাঠী, দীপংকর দয়ালকে রাজ্যপ্রশান থেকে সরিয়ে কেন্দ্রে পাঠাবার প্রচেষ্টা শুরু হল। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার কথা নয়, সুতরাং তিন মাসের মধ্যে দীপংকর দয়াল কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে জয়েন্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত হল।

বনমালীশংকর ঝা দীপংকর দয়ালের কর্মজীবনের মানচিত্র সম্বন্ধে অনবহিত নন। যে লোকটা এক-এক জন 'বড়' মানুষকে কেন্দ্রবিন্দু ক'রে তার চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নিজের যা কিছু তৈরি করেছে সে যে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের অভাবে পঙ্গু, বনমালীর তা বুঝতে দেরী লাগে নি। এ জাতীয় সিভিল সার্ভেন্টকে বনমালী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখেন ; গোটা আই-এ-এস দলটাকেই তিনি মোটামুটি অপদার্থ মনে করেন, বিশেষ করে যারা স্পেশাল রিক্রুটমেন্টের আংশিক আলোকিত পথ ধরে আই-এ-এস হয়েছে। অথচ পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের 'রাজনীতি'তে—প্রত্যেক মিনিস্ট্রির একটি নিজস্ব 'রাজনীতি' থাকে, যার সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতির অসংখ্য যোগাযোগ—দীপংকর দয়াল 'সেক্রেটারির লোক' বলে পরিচিত। এমন সেক্রেটারি বিশেষ নেই যাঁকে মিনিস্ট্রির পলিটিকস করতে না হয়, কেউ করেন উৎসাহে সক্রিয় ভূমিকায়, কেউ করেন বাধ্য হয়ে, আত্মরক্ষার তাগিদে। বনমালীশংকর ঝা নিজেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। কোনও সেক্রেটারির পক্ষে, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি, ডিরেক্টর, ডেপুটি সেক্রেটারি কর্তৃক রচিত ব্যূহে রাজনীতি-কুটনীতি চণ্ডালনীতির ব্যবহার না ক'রে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পূর্ত ও

বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের 'রাজনীতি'তে দীপংকর দয়ালের স্বাভাবিক স্থান ছিল হয় মন্ত্রী, নয় প্রতিমন্ত্রীর বৃত্তে। কিন্তু জনার্দন দীক্ষিত মধ্যপ্রদেশের লোক, দয়ালকে তিনি নেকনজরে দেখেন নি, সম্পূর্ণানন্দের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না, বরং অসদ্ভাবই ছিল। জগৎভাই প্যাটেল গুজরাটের মানুষ, তাছাড়া দীক্ষিত তাঁকে আগাগোড়া দাবিয়ে রেখেছেন, দয়ালকে তাঁর প্রয়োজন হয় নি। বস্তুতপক্ষে দীক্ষিত মন্ত্রী হবার পর মধ্যপ্রদেশ থেকে মহেশ শর্মা ও পি. বিশ্বনাথনকে জয়েন্ট সেক্রেটারি করে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু প্যাটেল আনতে পেরেছেন মাত্র একজন ডেপুটি সেক্রেটারিকে। মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী দ্বারা বর্জিত হয়ে, দীপংকর দয়াল, অনিবার্য কারণে বনমালীর বৃত্তে স্থান পেয়েছে।

চেয়ারে বসে দীপংকব দয়াল যতোখানি সম্ভব শরীরটাকে টেবিলের ওপর প্রসারিত করে নিল : বনমালীর সান্নিধ্য পাবার এটা তার অচেতন প্রয়াস।

'স্যার, আপনাকে কংগ্রাচুলেট করা ঠিক হবে না, এ ব্যাপারে, আমরা জানি, আপনার কোনও ভূমিকা নেই, তাছাড়া আপনি কখনও চান নি ওঁর মন্ত্রিত্ব ঘুচে যাক, আসলে এসব হল বড় রাজনীতির খেলা. তাহলেও এখানকার অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছিল, এটা আমাদেব পক্ষে, এবং আপনাব পক্ষেও, মস্ত রিলিফ, তাই ভাবছিলাম সকালে আপনাকে ফোন করব, শেষ পর্যন্ত মনে হল তার চেয়ে যদি কিছু ভেতরের খবর সংগ্রহ কবতে পারি আপনার কাজে লাগে তাই ভোরবেলা চলে গেলাম বাবুজীব কাছে ; বাবুজী, আপনি তো জানেন আমাকে অনেক কৃপা করেন, মীরাটের লোক, আমি যখন মীরাটের কালেক্টর ছিলাম, তখন জমিদারি সংস্করণ শুরু হয়, বাবুজীদের অনেক জমি ছিল, তা প্রায় দুহাজার একর হবে, এ জমিগুলি আইন অমান্য না করে পরিবারের মধ্যেই কি ভাবে রাখা যায় তা নিয়ে আমি ওঁকে একটু সেবা করেছিলাম, উনি তা আজ পর্যন্ত ভোলেন নি, অদ্ভুত সদাশয় ব্যক্তি, মিল্ক অফ হিউম্যান কাইন্ডনেসে ভরা ওঁব মন, তাই, স্যার, ভাবলাম একটু খোঁজ নিয়ে আসি, নিজেরও একটু কাজ ছিল, মানে, আপনাকে তো বলতে কিছু বাকি রাখিনি, জামাই ইনজিনীয়রিং পাশ করেছে, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে, তাই ভাবলাম'—

দীপংকর দয়াল, বনমালী জানেন, এভাবে একটানা কথা বলে, না থামালে থামতে চায় না, মিটিং বসলে ওকে নিয়ে এ এক সমস্যা, হয় একেবারে চুপ ক'রে থাকবে, নইলে চুপ হবেই না। এব কারণটাও বনমালী অনুমান করতে পারেন। স্নায়বিক উত্তেজনা। আত্মবিশ্বাসের অভাব। আজ বনমালীর মন অশান্ত, দয়ালের সব কথা তাঁর কানে পৌঁছচ্ছিল না, মন অন্য চিন্তা অনুসরণ করছিল। তাই তিনি দীপকংরকে থামিয়ে দিলেন না ; তাছাড়া দীপংকরের বক্তব্য থেকে সত্যিকারেব

অর্থপূর্ণ কিছু ইঙ্গিত মেলে কি না দেখবার জন্যে তাকে লাগাম ছাড়া বকতে দেওয়া দরকার মনে করলেন। বনমালী, তাই, এক কানে দয়ালের শব্দস্রোত অনুসরণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজ-কর্ম করে যেতে লাগলেন, যেমন 'ডাক প্যাড' খুলে জরুরি চিঠিপত্র কয়েকখানা পড়লেন, চিঠির পাশে মার্জিনে মন্তব্য লিখলেন, দুটি 'মোস্ট ইম্‌মিডিয়েট' চিহ্নিত ফাইল শেষ করলেন, এবং হঠাৎ একসময়ে বলে উঠলেন :

'উপাধ্যায়? হরিশ্চন্দ্র উপাধ্যায়?'

'তাই তো বললেন, বাবুজী। মানে, এটা ওঁর আন্দাজ, পাকা-পাকি তো উনি জানেন না, কেউ জানে না, এমন কি বোধহয় প্রধানমন্ত্রীও না, তবে বাবুজী বললেন, মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ককে সহজ করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি, এবং দিগম্বর মিশ্রের মনোনীত কাউকে ক্যাবিনেটে না নিয়ে উনি পারবেন না, মানে কিছুদিন হয়তো পারবেন, শেষ পর্যন্ত পারবেন না, অর্থাৎ, বাবুজী বললেন, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না দেশের রাজনীতি একেবারে বদলে গেছে.....'

'উনি কি মনে করেন বড় রকমের মন্ত্রিত্ব অদলবদল হবে?'

'আমি প্রশ্ন করেছিলাম, স্যার, উনি বললেন, "লক্ষ্মীনারায়ণ জানেন।" আর বললেন, "হলেই আমাদের কারুর না কারুর চাকরি যাবার সম্ভাবনা। লক্ষ্মীনারায়ণজী করুন, তা যেন না হয়।" আমার কিন্তু মনে হল, স্যার, সব কথা উনি খুলে বললেন না। মনে হল ব্যাপারটা গুরুতর, এমনি গুরুতর ব্যাপার, স্যার, লক্ষ্ণৌতে আমি কয়েকবার দেখেছি, ডাঃ সম্পূর্ণানন্দজীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল আপনি তো জানেন, কোন কিছুই আমার অজানা থাকতো না, সম্পূর্ণানন্দজী জানতেন সবচেয়ে গোপন ব্যাপার আমার কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ। একবার, স্যার, তাঁর মনে একটা অকারণ সন্দেহ ঢুকেছিল, মানে'—

বাবুজী কি করে জানবেন প্রধানমন্ত্রী কি ভাবছেন না ভাবছেন? তিনি তো প্রধানমন্ত্রীর খাসদরবারের লোক নন।'

'তা ঠিক, স্যার, বাবুজীর সে-কাল আর নেই, তবু তিনি প্রাচীন লোক।'

'আর কারুর নাম বললেন?'

'বললেন, প্রার্থীর তো শেষ নেই! এখন জিলা কংগ্রেসের নেতারাও কেন্দ্রে মন্ত্রিত্বের আশা পোষণ করে। বললেন, মন্ত্রিসভার ভারসাম্য রাখতে হবে তো! প্রধানমন্ত্রী নিজের খুশিতে মন্ত্রী নিয়োগ-বিনিয়োগ করতে পারেন না, অনেক সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ফ্যাক্টর তাঁকে মেনে চলতে হয়। বললেন, জনার্দন দীক্ষিতের মন্ত্রিত্ব অনেকেই চাইবে, পেলে তো আমিও খুশি, জানেন, তো,

স্যার, বাবুজী অমনি নিজেকে নিয়েও রসিকতা করেন, বললেন, চাইছেও অনেকে, যেমন ধরো পশ্চিম বাঙ্গাল, পঞ্জাব, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং রাজস্থান ; বললেন, বিদ্যুৎ মানে তো আলো, আলো নিয়ে অন্ধকার দেশে কাড়াকাড়ি তো হবেই, বাবুজী এমন সুন্দর কথা বলেন, স্যর ; আমার ডাঃ সম্পূর্ণানন্দজীর কথা মনে পড়ে যায়, তিনিও'—

'অলবাইট, দয়াল, তুমি দু-একটা কাজ করতে পারবে?'

'নিশ্চয়. স্যার, আপনার দরকারে যদি,'—

'অল রাইট, রতিবিলাস নিগমকে চেন?'

'হ্যাঁ, স্যার, আমি ওঁকে লখনউতেই চিনতাম, যখন উনি বিয়াল্লিশ সালের বিপ্লবে'—

'হোয়াট! কোন সালের কি—বে!'

'কেন, স্যর, আমি বলছিলাম, ১৯৪২ সালের বিপ্লবে, যার ধাক্কা ইংরেজের সাম্রাজ্য সামলাতে পারল না, তাই।

'আই সি! ওটা প্রথমে ছিল আন্দোলন, পরে হল বিদ্রোহ, এখন বুঝি হয়েছে বিপ্লব! তুমি মিঃ নিগমের সঙ্গে একবার দেখা কর। দেখ, উনি কতোটা জানেন, এবং কি ভাবে ঘটনাটাকে দেখছেন জেনে এসো।'

'স্যর, রতিবিলাস নিগমের মন্ত্রী হবার সম্ভাবনা নেই।'

'সবাই মন্ত্রী হ'তে চায় না, দয়াল। সম্ভাবনা নেই বলেই তো ওর সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে বলছি।'

'আপনি ওঁকে চেনেন নাকি, স্যর?'

বনমালীশংকর ঝা কাজে মন দিলেন।

দীপংকর দয়াল বুঝল এবার তাকে যেতে হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে, চেয়ারখানাকে সযত্নে গুছিয়ে রাখল। আস্তে আস্তে পা ফেলে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দরজা সযত্নে বন্ধ করল। চলল নিজের দপ্তরের দিকে। পথে চাপরাশি ও বাবুরা সেলাম করল। দীপংকর দয়াল কারুর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের কামরায় ঢুকল।

মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অংশে আজ সকালে কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। সবার মুখে এক আলোচনা : মন্ত্রীপতন। জনার্দন দীক্ষিতের রাজনৈতিক জীবনের ক্রাইসিস নিয়ে বেশ কিছুদিন জোর জল্পনা-কল্পনা চলছিল। রাজধানীর বৃহত্তম শিল্প, যার নাম গুজব, যে শিল্পের উৎপাদন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং যার প্রভাব সংবাদপত্রে নিত্য প্রতিভাত, সে শিল্প বেশ কিছুদিন ধরে জনার্দন দীক্ষিতকে নিয়ে নানা রংয়ের নানা

আকারের জল্পনার জাল তৈরি করছিল। শোনা গিয়েছিল, জনার্দন দীক্ষিত প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেছেন, তাঁকে হয় মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব নয়তো কেন্দ্রে মহত্তর কোনও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের জন্যে বেছে নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী। শোনা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যে মন্ত্রিসভায় আর তাঁর থাকা সম্ভব নয়, তিনি রাজ্যপালের পদ দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাও তাঁকে দিতে নারাজ। শোনা গিয়েছিল, জনার্দন দীক্ষিত কতগুলি পুরাতন ও নূতন দুর্নীতিমূলক অভিযোগে জড়িত হয়ে পড়েছেন, বিরোধী দলের কয়েকজন নেতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে নির্ভরযোগ্য দলিলপত্র পেশ করেছেন, এবং প্রধানমন্ত্রী দীক্ষিতের পদত্যাগ দাবি করেছেন। শোনা গিয়েছিল, জনার্দন দীক্ষিত প্রশাসনের অনেকগুলি গুরুতর বিচ্যুতিও বিফলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, যদি এসব সংশোধনের আশু ব্যবস্থা না হয় মন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় নিতে তিনি বাধ্য হবেন। শোনা গেল, প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছেন কয়েকজন প্রবীণ ও প্রাচীন মন্ত্রীকে সরকার থেকে সরিয়ে কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্ত করার কাজে নিযুক্ত করা হবে, এবং এদের মধ্যে আছেন জনার্দন দীক্ষিত। পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে যে 'সংবাদ' সবচেয়ে বেশি চাঞ্চল্য সবচেয়ে দীর্ঘকালেব জন্যে সৃষ্টি করেছিল তা হল : জনার্দন দীক্ষিত প্রধানমন্ত্রীকে 'আলটিমেটাম' দিয়েছেন যে হয় সেক্রেটারি বনমালীশংকর ঝা-কে অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করতে হবে, নয়তো তাঁকে, অন্যথা তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন, এবং পদত্যাগের পর আই-সি-এস নামক 'স্টীল ফ্রেম' কি ভাবে দেশ-নির্মাণে বিবাট অন্তরায় হযে দাঁড়িযেছে তা দেশবাসীর কাছে প্রমাণের দাযিত্ব পালন করা হবে তাঁর প্রধান কর্তব্য। মন্ত্রণালযে অজানা ছিল না মন্ত্রী ও সেক্রেটাবির ক্রমবর্ধমান অমিল, মতবিরোধ, সংঘাত এবং সংঘর্ষ। গত তিনবছর ধরে মন্ত্রী-সেক্রেটাবিব 'ঠাণ্ডা লড়াই' মন্ত্রণালয়ের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এসেছে, তাব কর্মধারাও এই ঘটনাকে এড়াতে পারে নি। অতএব যখন গুজব শিল্পের মাবফত জানা গেল 'ঠাণ্ডা লড়াই' চবমে উঠেছে, জনার্দন দীক্ষিত প্রধানমন্ত্রীকে 'আলটিমেটাম' দিয়েছেন, তখন শেষপর্যন্ত বড় কিছু একটা আসন্ন ঘটনার উত্তেজিত অপেক্ষায় মন্ত্রণালয়ের কক্ষে কক্ষে জল্পনা-কল্পনার কুটির শিল্প পুরোদমে চালু হয়ে গেল। এ অবস্থায় আজ সকালে এই খণ্ড নাটকে যবনিকা নেমেছে। জনার্দন দীক্ষিতের মন্ত্রিত্ব গেছে। বনমালীশংকর ঝা এখনও বহাল তবিয়তে স্ব-আসনে অধিষ্ঠিত আছেন।

মহেশচন্দ্র শর্মা, জয়েন্ট সেক্রেটারি, দপ্তরে এসে নিজের ঘবে ঢুকেই টেলিফোন

তুলে পি. এ. রামমোহনকে ডাকল। রামমোহন ঘরে আসতে শর্মা প্রশ্ন করল :

'এম-আই-পি এসেছেন?'

'এখনও আসেন নি, স্যর।'

'কখন আসবেন খোঁজ নিয়েছ?'

'কেউ বলতে পারছে না, স্যর।'

'এম-এস-আই-পি তো ট্যুরে।'

'বরোদায়। আজই ফিরে আসছেন শুনছি।'

'আসতেই হবে। সেক্রেটারি এসে গেছেন?'

'উনি আজ সাড়ে আটটা থেকে আপিসে।'

'সাড়ে আট-টা থেকে?'

'হ্যাঁ স্যর।'

'দয়াল? দয়াল কখন এসেছেন?'

'ন'টায়। এসেই সেক্রেটারির ঘরে আধঘণ্টা ছিলেন।'

'সাড়ে দশটায় মিটিংটা আছে, না ক্যানসেল?'

'আছে। আগরওয়ালকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'এম-আই-পি কবে অ্যান্ড-ওভার করছেন কিছু শুনেছ?'

'না, স্যর।'

'ক'টা কাজ চটপট সেরে ফেল। স্মল অ্যান্ড মিডিয়ম ইরিগেশন কমিশনের ফাইলটা আমায় এনে দাও।'

'কোন ফাইলটা স্যর?'

'আ-হা, সব তোমায় বুঝিয়ে বলতে হয়। চেয়ারম্যান নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইলটা।

'এখুনি আনছি, স্যর।'

'মাস খানেক আগে ওয়ার্লড ব্যাংকে আমি যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম সেটার কি হল খোঁজ করেছ?'

'সেক্রেটারি ওটা একস্‌টারনেল অ্যাফেয়ার্সে পাঠিয়েছিলেন।'

'এম-আই-পির থ্রুতে না সরাসরি?'

'সরাসরি।'

'উইথ অর উইদাউট রেকমেন্ডেশন?'

'আগরওয়াল ঠিক পরিষ্কার করে বলতে চাইছে না।'

'হুম। দরখাস্তের একটা কপি আমাকে দেবে। মিঃ বিশ্বনাথন এসেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আচ্ছা, এখন এই পর্যন্ত। খুব জরুরি ফাইল ছাড়া আমি আজ আর কিছু দেখব না। ও হ্যাঁ, গিরিশ মাথুরকে ফোন কোরো। এদিকে এলে আমার ঘরে একবার যেন ঢুঁ মেরে যায়।'

মহেশ শর্মা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পি. বিশ্বনাথন নস্যি নিচ্ছিল। মহেশ শর্মাকে দেখে হাত তুলে স্বাগত কবল, হাতের ইশারায় বসতে বলল। নস্যি নেবার পর দুবার না হাঁচা পর্যন্ত বিশ্বনাথ অস্থিব বোধ করে। পর পর দুবার হাঁচি হয়ে গেলে রুমাল দিয়ে নাক ঝেড়ে বলল :

'শেষ অবধি ঘটোৎকচ পড়ল, কিন্তু এক অক্ষৌহিণী দূরের কথা, একটি প্রাণীরও ক্ষতি হল না, কি বল?'

'অত শিওর হোয়ো না। দেখ কি হয়।'

'কিছু শুনেছ নাকি?'

'নতুন কিছু না। তুমি?'

'না। এম-আই-পি শুনছি বারোটার সময় আসবেন।'

'তুমি গিয়েছিলে?'

'পাগল!'

'ঝা সাহেব তো আটটা থেকে দপ্তরে ব'সে আছেন। পাছে অন্য কেউ এসে গদি দখল করে।'

'সাড়ে আটটা। শর্মা, তুমি একটা ভুল করছ। বি. এস. ঝা আই-এ-এস নয়, আই-সি-এস।'

'স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।'

'কখনও শুনেছ কোনও আই-সি-এস-এর গদি অন্য আই-সি-এস দখল ক'রে বসেছে? আই-এ-এসদের মধ্যে তো হরদম হচ্চে। হেল্‌থের ওলাটিকে চেন? রাজস্থান থেকে পোস্টিং অর্ডার পেয়ে দিল্লি এসে মিনিস্ট্রিতে হাজির হয়ে দেখল যার ঘরে তার বসবার কথা সে শুধু সেখানে বসেই নয়, চেয়ার ছাড়তে একটুও রাজি নয়। ওড়িশার পট্টনায়ক। ওলাটিকে বললে, 'দুঃখিত, কিন্তু আমি এখান থেকে নড়ছি না।' বেচারা ওলাটি দেখা করল সেক্রেটারির সঙ্গে। সেক্রেটারি বলল, 'ভেরি সরি, একরকম হবে একদম ভাবিনি, আপনি বরং মাসখানেকের ছুটি নিন।'ওলাটি বলল, 'এখান থেকে তারের পর তার গেছে জয়পুরে আমাকে রিলিজ করবার জন্যে, আর এসে দেখছি আমার জন্যে চেয়ার পর্যন্ত নেই! ছুটি আমি নেব না, আমার ছুটির দরকার নেই।' এদিকে পট্টনায়কও ছুটি নিতে নারাজ। একটা রীতিমত ক্রাইসিস। ভাবতে পার আই-সি-এসদের মধ্যে এরকম কিছু!'

সিগারেট ধরিয়ে শর্মা বলল, 'তুমি তো আই-সি-এস বলতে অজ্ঞান!'

'জ্ঞান-অজ্ঞানের কথা নয়। লর্ড ডাফরিন চিঠিতে আই-সি-এস সম্বন্ধে কি লিখেছিলেন জানো? There is no service like it in the world for ingenuity, courage, right judgement, disinterested devotion to duty, endurance, open-heartedness', ভালো ক'রে শোনো, 'and at the same time loyalty to one another and their chiefs.' অন্য সব গুণগুলো সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু loyalty to one another এখনও অটুট। শুনেছ কোনও আই-সি-এসকে গালমন্দ করতে অন্য একজন ব্রাদার সিভিলিয়নকে? ইট ইজ দি মোস্ট পারফেক্ট অ্যান্ড স্ট্রংগেস্ট ট্রেড ইউনিয়ন ইন দি ওয়ার্লড।'

'অল রাইট। আই-সি-এস প্রশস্তি শুনতে তোমার ঘরে ঢুকিনি এখন। তার চেয়ে অনেক জরুরি ব্যাপার আছে।'

'শোনো শর্মা। মাননীয় মন্ত্রী জনার্দন দীক্ষিত পদচ্যুত হয়েছেন। অতি সত্বর তিনি হবেন হিজ এক্সেলেন্সি জনার্দন দীক্ষিত। মাঝখান থেকে যতো মুশকিল তোমার আর আমার। তুমি জনার্দন দীক্ষিতের হাতে বাছাই লোক। শুনেছি তোমাদের একটা আত্মীয়তাও আছে। আমি ভিনদেশী। মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারে আছি বলেই তোমরা আমাকে হিন্দুস্থানী বলে গ্রহণ করবে না। আমাকে এই বুড়ো বয়সে মধ্যরজনীতে মোমবাতি জ্বেলে হিন্দী শিখতে হচ্চে, তোমাদের হুকুম মেনে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মাবার অপরাধে স্বদেশ তামিলনাদে আমি অস্পৃশ্য, তোমাদের হিন্দুস্থানে আমি বিদেশী। আমার দোষ হল জনার্দন দীক্ষিত মধ্যপ্রদেশের নেতা এবং আমি মধ্যপ্রদেশের অফিসর, একমাত্র এ দোষে বনমালীশংকর ঝা আই-সি-এস আমাকে দীক্ষিতের অনুচর সন্দেহ ক'রে দূরে সরিয়ে রাখলেন।'

'তুমি অনুতাপ করছ, না ভয় পেয়েছ?'

'একটাও না। তুমি যে ইঙ্গিত করছ তা বুঝতে আমার সময় লাগে নি। তুমি মনে করিয়ে দিচ্ছ যে দীক্ষিতই আমাকে এখানে এনেছিলেন। কিন্তু আমি কি তখন জানতাম যে এখানে মন্ত্রী আর সেক্রেটারিতে গেরিলা ওয়র চলছে? তাহলে কে আসতো এখানে? অন্তত আমি নই। ভূপালে ফুড সেক্রেটারি হওয়া এখানে জয়েন্ট সেক্রেটারি হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি সম্মানের। অতএব, আমার ভয় করছে না। অর্থাৎ, ভূপালে ফিরে যেতে আমার একটুও আপত্তি হবে না।'

'জায়গা থাকলে তো ফিরে যাবে।'

'সেই হল আসল মুশকিল। এখানে মন্ত্রীরা যেমন চায় সেক্রেটারি তাদের নিজের লোক হোক, রাজ্যে মন্ত্রীরাও তাই চায়। তফাত হল, কেন্দ্রে মন্ত্রীদের চাওয়া প্রায়ই

পূর্ণ থাকে, কিন্তু রাজ্যে তা থাকে না। তার কারণ কি জানো? কেন্দ্রে সেক্রেটারি ানেই আই-সি-এস, অন্তত এখনও তাই নিয়ম। আর রাজ্যের? আমরা আই-এ-সরা মন্ত্রীদের তাঁবেদার, তাঁরা যা চান আমরা তাই করি। কেন্দ্রে মন্ত্রীরা সক্রেটারিদের সমীহ করেন ; দেখলে না, জনার্দন দীক্ষিতেরই চাকরি গেল, মালীশংকর ঝা'র কিছুই হল না। রাজ্যে মন্ত্রীরা সমীহ করেন কেবল আই-সি-সদের। আমাদের মনে করেন জল। যে পাত্রে রাখো, তাতেই আমরা থাকতে ভ্যস্ত।'

'তুমি তাহলে মধ্যপ্রদেশে ফিরে যাবার জন্যে তেরি হচ্ছ।'

'ঐ যে তুমি এক্ষুনি বললে, স্থান থাকলে তো যাবো! মন্ত্রীরা যে যার সেক্রেটারি ছে নিয়েছেন, আমাকে বিশেষ ক'রে চাইবার কারণ নেই কারুর। ফিরে গেলে য়তো ডিভিশনাল কমিশনার হ'তে হবে, এ বয়সে আর মফস্বলে বাস করবার রুচি ই। অতএব, কারণ পৃথক হলেও, তোমার আমার অবস্থা একই!'

'আমাকে তো দিগম্বরচরণ মিশ্র ফেবত নেবেনই না।'

'না নেওয়াই সম্ভব।'

'নতুন মন্ত্রী কে হবেন মনে হচ্চে?'

'ভালো লোককে জিজ্ঞেস করছ। স্ত্রীলোকেব হৃদয়ের খবর জানা সহজ, কিন্তু কম ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর মনের খবর জানা সহজ নয়।'

'কাল সকালের কাগজে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে?'

'রাজনৈতিক ঘুড়ি ওড়ান চলবে দুচারদিন।'

'তোমার কিছু মুশকিল হবে না। মদ্রদেশীয়দের মধ্যে লয়ালটির অভাব নেই। মি কেন্দ্রে থাকতে চাইলে ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারবে।'

'মধ্যপ্রদেশ আমাকে ফেরত চাইবে না। সুতরাং থাকতে হবেই এখানে আমাকে বো দু' বছর। তবে আমি আর এই মন্ত্রণালয়ে থাকতে চাইনে, এমন কোথাও তে চাই যেখানে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী আর সেক্রেটারিতে লড়াই নেই।'

খুঁজে দেখ। সহজে সন্ধান পাবে না।'

তুমি কি করবে?'

'সন্ন্যাস নেব।

'তোমার দ্বারা অনেক মহান কাজ সাধিত হয়েছে, আরও হবে। কেবল ওটা া।'

'বাইরে চলে যেতে পারলে হত।'

'ওয়ার্লড ব্যাংকে চাকরিটাব কি হল?'

'কিছুই না।'

'মন্ত্রী বিদায় নেবার আগে দেখ ওটা করিয়ে নিতে পার কি না।'

'ভরসা কম।'

'হাতজোড় ক'রে দাঁড়াও গিয়ে। বলো, অনেক সেবা করেছি, স্যর, যাবার আগে এটুকু ক'রে দিয়ে যান।'

'তুমি জনার্দন দীক্ষিতকে চেন না।'

বঙ্কিম ঘোষ নতুন এসেছে পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে ও. এস. ডি. হিসেবে অফিসর অন স্পেশাল ডিউটি। শিবপুর কলেজ থেকে ইলেকট্রিক এনজিনীয়রিং পাস করার পর বছর কয়েক অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনে কাজ পেয়ে আসামের ভূগর্ভে তেলের সন্ধান করেছিল, এবং সে-সুবাদে সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে বছরখানেক শিক্ষানবিশ ছিল। ফিরে এসে কমিশনে আরও তিন বছর চাকরি করার পর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিল আমেরিকায়। সেখানে নিউ ইয়র্ক য়ুনিভারসিটিতে পাওয়ার এনজিনীয়রিংএ পি-এইচ ডি ক'রে বছর দুই শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছিল আলবানির স্টেট য়ুনিভারসিটিতে। ইতিমধ্যে একটি মার্কিন তরুণীর সঙ্গে প্রেম হবার সময় বঙ্কিম ঘোষ বুঝতে পারল হয় তাকে ভারতীয় নাগরিকত্ব বর্জন ক'রে চিরদিনের জন্যে মার্কিন দেশে অবস্থান করতে হবে, যদি সে আমেরিকান স্ত্রীর স্বামী হ'তে চায়, আর নয়তো দেশে ফিরে আর একবার ভবিষ্য তৈরির প্রয়াস করতে হবে। মার্কিন বান্ধবী ঘোষজায়া হ'তে রাজি, কিন্তু ভারতবর্ষে বসবাসে নারাজ। বঙ্কিম ঘোষ বান্ধবীকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেত ইচ্ছুক, কিন্তু মার্কিন দেশটাকে স্বদেশ ব'লে গ্রহণে অনিচ্ছুক। এ সংকটাবস্থায় ভারতীয় দূতাবাসের পাক্ষিক পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পেয়ে বঙ্কিম ঘোষ দরখাস্ত করেছিল। গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে কেন্দ্রের বৃহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে এনজিনীয়র নিয়োগ করা হচ্ছে, তার একটি পদের জন্যে বঙ্কিম আবেদন করল। দিল্লি এসে ইনটারভিউ দেবার কথা ওঠে না, অতএব আবেদন করার পর চাকরির আশা সে বিশেষ পোষণ করে নি ; হঠাৎ একদিন 'কেব্‌ল্‌' পেল ওয়াশিংটনে গিয়ে পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি বি. এস. ঝার সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেখা হল, পুরো একঘণ্টা আলাপ-আলোচনা হল, বিদায় নেবার সময় ঝা বললেন, 'আমি প্রমিস করতে পারছি না, কিন্তু আশা করছি আমরা তোমাকে নি

পারব, তুমি ক'দিনের নোটিশে কাজ ছাড়তে পারবে?' বঙ্কিম ঘোষ বলেছিল, 'তিন মাস।' মাস চারেক পর একদিন সত্যি সত্যি বঙ্কিম চাকরি পেল। ও. এস. ডি. (রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন)। তিন মাস পরে দিল্লি এসে নতুন কাজে যোগ দিল পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যাবার কাজ নয়। যে ক'টি প্রজেক্ট বিভিন্ন অঞ্চলে চালু হয়েছে এবং হচ্ছে তাদের ওপর নজর রাখা এবং তাদের মধ্যে কোঅরডিনেশন হল তার দায়িত্ব। অর্থাৎ বিদ্যুতের বদলে বঙ্কিম ঘোষের কাজ হল ফাইল নিয়ে।

ও. এস. ডি. পদে চার মাস তার অতিক্রান্ত হয় নি। অর্থাৎ সেক্রেটারিয়েটে এখনও সে নতুন, তার আদব-কায়দা, পরিভাষা, চালচলন রপ্ত হয় নি এখনও। বঙ্কিম ঘোষ বলে, রপ্ত হবে না কোনও দিনও।

আজ দপ্তরে এসে কাজকর্ম শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম ঘোষের ডাক পড়ল নিরাময় রায়ের ঘরে। রুরাল ইলেকট্রিফিকেশনের (আর. ই. সেকশন) দায়িত্ব অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির, যদিও প্রধান প্রধান বিষয়গুলিতে সেক্রেটারি ও মন্ত্রীদের নির্দেশ নিতে হয়। বঙ্কিম ঘোষ কাজ করে নিরাময় রায়ের সঙ্গে ; অন্য ভাষায় নিবাময় রায় হল বঙ্কিম ঘোষের বস্।

নিরাময় রায় বলল, 'বসুন। কাজের কথা আছে।'

বঙ্কিম ঘোষ বসল। সিগারেট ধরাল। রায় পাইপ খায়। পাইপে তামাক ভ'রে লাইটারের আগুন ধরাল।

'মধ্যপ্রদেশে আমাদের ক'টা স্কিম আছে?'

'চালু হয়নি একটাও। পরিকল্পনা পর্যায়ে আছে দুটো। প্রস্তাব পর্যায়ে আরও তিনটে।'

'প্লানিং স্টেজে যে দুটো আছে তার কাজ কতটা এগিয়েছে?'

'খুব একটা এগোয়নি। সার্ভে চলছে।'

'সার্ভে বন্ধ ক'রে দিন। মানে স্থগিত রাখুন।'

বঙ্কিম ঘোষ অবাক হল।

'স্থগিত রাখব? এই তো মাসখানেক হল সার্ভে কেন এখনও শেষ হয় নি জানতে চাইলেন সেক্রেটারি।'

'সে তো একমাস আগে', পাইপ কামড়ে ঠোঁট হাসল নিরাময় রায়, 'একমাসে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে।'

'অনেক পরিবর্তন? কই আমি তো কিছু জানি নে?'

'আজ কাগজ পড়েছেন?'

'কেন পড়ব না?'

'তাহলে জানেন তো কি ঘটেছে।'

'জনার্দন দীক্ষিত, আমাদের মন্ত্রী, পদত্যাগ করেছেন ; প্রধানমন্ত্রী দুঃখের সঙ্গে তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ ক'রে তাঁকে নেপালে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেছেন।'

'এটাই কি যথেষ্ট কারণ নয় মধ্যপ্রদেশে আর. ই. স্কিম স্থগিত রাখবার?'

'যেহেতু দীক্ষিত মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধি?'

'আপনি সবেমাত্র বিদেশ থেকে ফিরেছেন, দেশের রাজনীতি এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি।'

'রাজনীতি তো আমার কর্ম নয়, মিঃ রায়, আমার কর্ম আর. ই.—মানে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ।'

'পাওয়ার-পলিটিক্স্ আপনি দেখছি ওকেবারে জানেন না।'

বঙ্কিম ঘোষ হেসে উঠল। বলল, 'নাইস্ পান্।'

'যদি মনে করে থাকেন, উন্নয়নের মধ্যে রাজনীতি নেই, দারুণ ভুল করবেন। আসলে আমাদের মতো পেছিয়ে পড়া দেশে রাজনীতির বারো আনা উন্নয়ন নিয়ে। ডেভেলপমেন্ট মানেই পেট্রোনেজ, আর পেট্রোনেজ মানেই পলিটিক্স্।'

'এটা বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে না।'

'আমাদের বর্তমান মন্ত্রী—ওয়েল, এখনও তিনি মন্ত্রীই আছেন—মধ্যপ্রদেশেব রাজনৈতিক নেতা। মধ্যপ্রদেশ তাঁর নির্বাচন এলাকা, তাঁব রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। সুতরাং কেন্দ্রের রসদ দিয়ে মধ্যপ্রদেশের যতোটা উন্নয়ন সম্ভব তা তিনি অবশ্য করতে চাইবেন। মধ্যপ্রদেশেরও আগে তাঁর নিজের কনস্টিটিউনসির কথা তিনি ভাববেন। এই হল গণতান্ত্রিক রাজনীতির নিয়ম। যে দুটি স্কিম নিয়ে সার্ভে হচ্ছে তার মধ্যে বৃহত্তর স্কিমটি, দেখবেন, গোয়ালিয়র অঞ্চল নিয়ে। ওখান থেকেই জনার্দন দীক্ষিত লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন।'

'উনি মন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় নেওয়া মানে গোয়ালিযরের গ্রামগুলির বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত হওয়া!'

'খুবই সম্ভব। ভারতবর্ষে ছ'লক্ষ গ্রাম আছে। তার মধ্যে মাত্র পঁচিশ হাজাব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। রসদ আমাদের সীমিত, চাহিদা অসীম। সুতরাং বঞ্চিত থাকতে হবে অধিকাংশ গ্রামকে আরও বহুদিন। কেবল সে-সব গ্রামাঞ্চল প্রথম বিদ্যুৎ পাবে যাদের পাবার 'রাজনৈতিক' দাবি আছে। এ শুধু কেন্দ্রের রাজনীতি নয়। পঞ্জাবের দিকে তাকিয়ে দেখুন। প্রথম বিজলী পৌঁছেছে লুধিয়ানা আর অমৃতসরের গ্রামাঞ্চলে। এবার খোঁজ নিন, কেন। দেখতে পাবেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন কেন্দ্র লুধিয়ানায়, আর রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিবাস অমৃতসরে।'

'এতে আপত্তি করার কারণ থাকত না যদি না কৃষির উন্নতির দিক থেকে অমৃতসরের চেয়ে ফিরোজপুর, ভাটিণ্ডা, আম্বালার দাবি অনেক বেশি জোরদার হত।'

'হোক না! গণতন্ত্রের প্ল্যানিং-এ এই তো মজা! আম্বালার দাবি কৃষি উন্নতির, অমৃতসরের দাবি রাজনীতির। আগে বিদ্যুৎ পাবে অমৃতসর, পরে সুযোগসুবিধা হলে, আম্বালা।'

'যেহেতু দীক্ষিত আর মন্ত্রী থাকছেন না, তাই গোয়ালিয়র তার রাজনৈতিক দাবি হারিয়েছে, এবং পরে কোন রাজ্যের কোন অঞ্চলের রাজনৈতিক দাবি বাড়বে আমরা জানি না, অতএব মধ্যপ্রদেশের স্কিম নিয়ে কাজ করার বর্তমানে অর্থ নেই।'

'ঠিক।'

'ফাইলে নোট লিখে আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অর্ডার দিয়ে দেবেন।'

'তা করবেন না। ফাইলে অর্ডার দেওয়া সম্ভব হবে না।'

'তাহলে?'

'আপনি সার্ভে পার্টিকে কাজ বন্ধ করতে নির্দেশ পাঠিয়ে দিন।'

'কি কারণ দেখাব?'

'কোনও একটা টেকনিকাল কারণ দেখাতে হবে। ওটা আপনার কাজ। অর্থাৎ আপনিই ঠিক বুঝবেন কি কারণ দেখিয়ে সার্ভে সাসপেন্ড করা সম্ভব। ধরুন, মেশিনারির অভাব। অথবা ব্রেকডাউন ; অথবা সার্ভে পার্টির প্রথম রিপোর্ট নিযে মতভেদের সম্ভাবনা। যুৎসই একটা কারণ দেখিয়ে সার্ভে বন্ধ করে দিন। নির্দেশ পাঠাবাব তারিখটা পিছিয়ে দেবেন। আজ ৫ই অক্টোবর। দুই বা তিন তারিখ দেখিয়ে নির্দেশ পাঠাবেন। ফাইলেও তাই করবেন। নোটিংয়ের তারিখটা সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি রাখবেন।'

'মিঃ রায়!'

'বুঝতে পারছি এ কাজ করতে আপনার মন উঠছে না। ভাবছেন অসৎ মিথ্যাচার করছেন। ভাবছেন কেন করব? ব্যাপারটাকে এ ভাবে দেখবেন না। জনার্দন দীক্ষিত মন্ত্রী না থাকলে এ দুটো স্কিম চালু হবার বিন্দুমাত্র মাত্র সম্ভাবনা নেই। প্রকৃতপক্ষে স্কিম দুটো গতকাল মধ্যরাত্রে মারা গেছে। সার্ভে যদি এগিয়ে যায়, অর্থ নষ্ট হবে, কয়েকজন টেকনিশিয়ানের সময় নষ্ট। দেশের সরকারের ক্ষতি। অথচ আমরা সহজ ভাবে সরাসরি সার্ভে বন্ধ করতে পারছি না। পার্লামেন্ট খোলা। জনার্দন দীক্ষিত নিতান্ত দুর্বল নেতা নন। মধ্যপ্রদেশের সদস্যদের মধ্যে একটা পাওয়ারফুল গ্রুপ তাঁর সমর্থক। যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় লোকসভায় প্রশ্ন উঠবে, আমাদের

জবাবদিহি করতে হবে। মোটেই ভাল শোনাবে না যদি আমরা বলতে বাধ্য হই মন্ত্রীর পদচ্যুতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্কিম দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। দীক্ষিত নেপাল চলে যাবাব পর আমাদের এত সাবধান হবার প্রয়োজন হবে না। বুঝলেন এবার? পার্লামেন্টে তাঁর দলটিও বেঁচে থাকবে না। ব্যাপারটা বুঝলেন এবার?

যেটুকু চালাকি করতে হবে আপনাকে তা আসলে দেশের স্বার্থের জন্যে, গণতন্ত্রের মাশুল ধরে নিন এটাকে।'

'আপনি বা আপনারা করছেন না কেন? আমাকে দিয়ে কেন করাচ্ছেন এ কাজটা?'

'এ প্রশ্ন করতেন না যদি আপনি সেক্রেটারিয়েটের আদব-কায়দায় রপ্ত হতেন।'

'মানে, আপনি বলছেন, এই হল অর্ডার, যাও পালন কর।'

'অনেকটা তাই।'

'মিস্টার রায়, আপনি আমাকে জানেন না। চোখ বুজে অর্ডার মানার লোক আমি নই। তা ছাড়া, এ চাকরি ছাড়াও আমার চলবে।'

নিরাময় পাইপে আগুন ধরালেন।

'বুঝিয়ে বলছি। আপনি হলেন টেকনিকাল এক্সপার্ট। আমরা তা নই। আপনার মতামতের যা দাম এ ব্যাপাবে হবে আমাদের তা নাও হতে পারে।'

বঙ্কিম ঘোষ কিছুক্ষণ ভেবে দেখল।

'যা বললেন তাতে যুক্তি আছে। আচ্ছা, নির্দেশ আমি পাঠিয়ে নোটিংটা আপনাকে দেখিয়ে নেব। রাজনীতি জানি নে, এ ধরনের নোট লেখার অভ্যাস নেই। যদি চাকরি করি, শিখে নেব। শিখতে গিয়ে যদি বমি পায়, চাকরি ছেড়ে দেব।'

ডেপুটি সেক্রেটারি টি. রামাইয়া তেত্রিশ বছর আগে কনিষ্ঠ কেরানি হয়ে সেক্রেটারিয়েটে ঢুকেছিল ম্যাট্রিক পাস বিদ্যা নিয়ে। আজ সে অফিসিয়েটিং ডেপুটি সেক্রেটারি। ১৯৪৭ সালে পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হবার সময় থেকে রামাইয়া এর সঙ্গে সংযুক্ত। তখনও অ্যাসিস্টেন্ট হয় নি। ছায়ছোট্ট মানুষটি, মাথায় চুল নেই বললেই হয়, শক্ত মাংশপেশী, গোল চোখ, চ্যাপটা নাক, ভ্রূ এবং কানের চুল শাদা। ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিদিন দপ্তরে এসেছে '।লাবন্ধ পরে, নভেম্বর পর্যন্ত সাদা খাদির, ডিসেম্বর থেকে কালো ধারিওয়ালের। এ মন্ত্রণালয়ের এনসাইক্লোপিডিয়া টি. রামাইয়া। স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ। এমন খুব কম 'কেস' আছে যার ইতিহাস তার জানা

নেই জয়েন্ট সেক্রেটারিদের তাই সে অপরিহার্য অবলম্বন। দীর্ঘ কর্মজীবনে রামাইয়া দেখেছে অনেক শিখেছে অনেক। যেমন, সেক্রেটারিয়েটের ইংরেজি সে জোব কব্জা করে নিয়েছে, আইন-কানুন বিধি-নিয়ম তার মুখস্থ। শিখেছে, কোন কাজ চটপট করতে হয়, কোন কাজ বছর খানেক ফেলে রাখলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। শিখেছে, মিষ্টি কথা, ভদ্রতা, একটু উষ্ণতা, এসবে খরচ নেই, বরং লাভ আছে! মন্ত্রণালয়ে রামাইয়া, অতএব, প্রায সবাবই পছন্দসই মানুষ। ইউ-ডি-সি, এল-ডি-সিবা তার কাছে দরকার মত এসে দাঁড়াতে পারে, চাপরাশি-পিয়নরা শিকায়েৎ শোনাবার সাহস রাখে।

সেক্রেটারিয়েটে দুরকম ডেপুটি ও আন্ডার সেক্রেটারি থাকে। একদল, এদের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি অথবা উপবে, কেরানি থেকে উঠে আসে প্রমোশন, সুপারসেশন ইত্যাদি পথে, এরা সবাই সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসের লোক। অন্য দল, বয়স এদের অপেক্ষাকৃত কম, আসে আই-এ-এস পরীক্ষার মাধ্যমে। কমবয়সী নতুন আন্ডার সেক্রেটারিরা সবাই আই এ-এস। দশ থেকে আঠের-কুড়ি বছব লেগে যায় সেকশন অফিসরের আন্ডার সেক্রেটারি হতে। সেক্রেটারিয়েটের জীবনযাত্রার অলিখিত, কিন্তু সুবিদিত, নিয়ম অনুসারে আই-এ-এস অফিসরদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে, বছর ষোল ঘষে ঘষে লোকগুলি যখন প্রমোশন পায় তখন এদের দেহ ক্লান্ত, মন পেনসন-গ্র্যাচুইটি-লাইফ ইনসিওরেন্সের হিসাব করছে, প্রধান দুশ্চিন্তা ছেলের চাকরি অথবা মেয়ের বিবাহ। আই-এ-এস ডেপুটি সেক্রেটারিদেব সঙ্গে সি-এস-এস ডেপুটি সেক্রেটারিদের সদ্ভাব কম, বন্ধুত্ব বিরল। আই-এ-এসরা ভাবে এ লোকগুলি না থাকলে আমাদের প্রমোশন, প্রাধান্য আরও ত্বরান্বিত হত। সি-এস-এস-এর লোকেরা আই-এ-এসদের বাইরে সমীহ করে, নিজেদের মধ্যে বলে, যতসব ভুঁইফোড় তাঁবেদারের দল, নিয়মবিধি কিছু জানে না, কাজ করিয়ে নেয় সেকশনের কেরানিদের দিয়ে, সিদ্ধান্ত নেবার সময় হাত ওঠে না, অথচ মাইনে, মর্যাদা, প্রমোশনের বেলায় লাইনের প্রথমে এসে দাঁড়ায়। আই-এ-এস আন্ডার সেক্রেটারিদের কাজ করতে হয় সি-এস-এস ডেপুটি সেক্রেটারিদের সঙ্গে, মানতে হয় সিনিওরিটির দাবি। আই-এ-এস আন্ডার সেক্রেটারিরা সি-এস-এস ডেপুটি সেক্রেটারিদের 'স্যর' বলে না। সি-এস-এস ডেপুটি সেক্রেটারিদের আন্ডারে কাজ করবার অসম্মান তারা পুষিয়ে নেয় জয়েন্ট সেক্রেটারিদের সঙ্গে ইনফরম্যাল সম্পর্কে। অর্থাৎ এক সার্ভিসের লোক হিসেবে তাদের সঙ্গে জয়েন্ট সেক্রেটারিদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়, সি-এস-এস এবং আই-এ-এস জয়েন্ট সেক্রেটারিদের মধ্যে তা সহজে চোখে পড়ে না। সি-এস-এস জয়েন্ট সেক্রেটারি

খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে, যেমন আই-এ-এস থেকে সেক্রেটারি এখনও বিরল।

টি. রামাইয়ার ঘরে সাত জন লোক জমেছে, তিনজন আন্ডার সেক্রেটারি, দুজন সেকশন অফিসর, দুজন অ্যাসিস্টেন্ট। ইউ-এস-দের (আন্ডার-সেক্রেটারি) মধ্যে দুজন রামাইয়ার মতো সি-এস-এস-এর লোক, বয়স পঞ্চান্ন পেরিয়ে গেছে, চাকরির মেয়াদ এসেছে ফুরিয়ে। তৃতীয় ইউ-এস, জি. রাঘবন, আই-এ-এস, এই মন্ত্রণালয়ে নবাগত, রামাইয়ার 'নিচে' তাকে কাজ করতে হচ্ছে। সাত-সাতজন সহকর্মীকে উদ্দেশ করে রামাইয়া বলে যাচ্ছে :

'তোমরা যদি মনে করো সেক্রেটারিয়েট-জীবনে নাটক নেই, ভুল করবে। প্রত্যেকদিন, প্রতি ঘণ্টায় এখানে নাটক চলছে। পাংশু কুৎসিত ফাইলের পাতায় পাতায় শুকনো নোটিংগুলির আড়ালে কত বিচিত্র কাহিনী লুকিয়ে থাকে তোমরা ভেবেও দেখ না। ভুলে যাও। এই যে আঙ্গারিয়া, সতীশচন্দ্র আঙ্গারিয়া, ত্রিশ বছর সেক্রেটারিয়েটে তুমি কাটিয়ে দিলে, নাটক কি কম দেখেছ? বলো না! হ্যাঁ, নাটক অনেক দেখেছ, কিন্তু মনে নেই কিচ্ছু তোমার, সব ভুলে গেছ। আমি ভুলি নি। সব নাটকের অগুনতি দৃশ্যাবলী আমার মনে আছে। আর আছে বলেই সেক্রেটারিয়েট লাইফ আমার কাছে কখনও একঘেয়ে লাগে না, সেক্রেটারিয়েট লাইফ ইনটারেস্টিং, একসাইটিং ইভন এনথিউজিং।'

টেলিফোন বাজল : 'টি. রামাইয়া! হ্যালো! টি. রামাইয়া স্পিকিং! নমস্কারম্! নমস্কারম্! (তামিল ভাষায়) মন্ত্রী গেছেন, সেনাপতি এখনও ঠিক আছেন।....আরে না, না, আমি এ আগেই জানতাম....কি বললেন? ও, মানে, কেউ যদি নিজের বর্তমান বেতন থেকে কম বেতনে অন্য চাকরি নেয়, এবং ডেপুটেশন চায়, তাহলে তার নিজের সার্ভিসে ইনক্রিমেন্ট ও প্রমোশন বজায় থাকবে কি না! এই তো আপনার প্রশ্ন! এমন বুদ্ধিহীন কাজও কেউ করে নাকি? অ্যাঁ?....লোকটার মাথার দোষ আছে। (ইংরাজিতে) আমার পঁয়ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে এ রকম 'কেস' পাই নি। না। এই মিনিস্ট্রিতে কোনও প্রিসিডেন্ট নেই। নট দ্যাট্ আই নো।....তা বলতে পারেন : হোয়াট টি. রামাইয়া ডাজ নট নো অ্যাবাউট রুলস্ ইজ নট নলেজ....হা....হা....হা.....'

কেটে যাওয়া বক্তৃতার সুতো ধরে : 'মন্ত্রী আর সেক্রেটারির লড়াই কিছু নতুন ব্যাপার নয়। যে-কোনও গণতান্ত্রিক দেশে, যে-কোনও সময়ে, এ ধরনের লড়াই চলে। মন্ত্রী হলেন রাজনৈতিক নেতা, তাঁকে জনসাধারণের ভোটের ওপর নির্ভর করতে হয় রাজনৈতিক জীবন চালিয়ে যেতে হলে। সেক্রেটারি হ'লেন ব্যুরোক্রেসির অথবা সিভিল সার্ভিসের প্রধান প্রতিনিধি। তাঁর পলিটিক্স্ নেই, অন্তত থাকার কথা

নয়। তিনি সব কিছু দেখবেন ঠাণ্ডা মাথায়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, সুস্থির বিচারবুদ্ধিতে : অন্তত তাঁর কাছ থেকে এটাই আশা করা যেতে পারে। এ অবস্থায় মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মতের মিল সর্বদা ঘটবে, তা কি সম্ভব? অমিল যদি ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে হয়, কারুর চোখে পড়ে না। যদি বড় ব্যাপার নিয়ে হয়, নাটক জমে ওঠে। ধরো, আমাদের মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাটক। পূর্ত ও বিদ্যুৎ ! ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার! দেশ গঠনের দুই প্রধান অস্ত্র। যাঁর হাতে এই দুই অস্ত্র বর্তমান, সে মন্ত্রী যে প্রভূত ক্ষমতাশালী তাতে সন্দেহ নেই। কথা হল, মন্ত্রী এ ক্ষমতার ব্যবহার করছেন কি ভাবে? মন্ত্রী বা সরকারের হাতে তো এমন ম্যাজিক নেই যে সারা দেশে একসঙ্গে ইরিগেশন অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি এনে দেওয়া যায়। দুটোই আসবে, ধীরে আস্তে, পদে পদে। এবং মন্ত্রী চাইবেন তাঁর রাজ্য আগে পাক, তাঁর জেলা পাক সবার আগে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীর ওপর নানা রকম রাজনৈতিক চাপ পড়বে, তিনি তাঁদের দাবি আগে মেটাতে চাইবেন যাঁদের সঙ্গে তাঁর লেন-দেন সম্পর্ক গভীর। সেক্রেটারিকে, অন্য পক্ষে, ব্যাপারটা দেখতে হবে পিওর ডেভেলপমেন্টের দৃষ্টি থেকে। বুঝলে না? মতবিরোধ, সংঘর্ষ, সংঘাতের উৎস হল এই....

'নাউ, সব সেক্রেটারি তো সমান নন। সবাই আই-সি-এস, তা ঠিক কিন্তু হাতের পাঁচ আঙুল কি সমান? সেক্রেটারি যদি ঢিলেঢালা হন মন্ত্রী তাঁকে কব্জা করে নেন, আর মন্ত্রী যদি ঢিলেঢালা হন, সেক্রেটারির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আমি এমন মন্ত্রীর কথা জানি, নাম করতে পারব না, তিনি সেক্রেটারির হাতে প্রায় সব কিছু ছেড়ে দিতেন, বলতেন, কয়েকটা বিষয়ে আমার রাজনৈতিক স্বার্থ আছে, সেগুলো আপনাকে মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী-সেক্রেটারির সম্পর্ক ভালো থাকা সম্ভব। আবার এমন মন্ত্রীও দেখেছি যিনি প্রথম থেকেই সব কিছু ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে চেয়েছেন : সেক্রেটারির সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগেছে প্রথম থেকেই, ক্রমে তা সংঘর্ষ ও সংঘাতে পরিণত হয়েছে।'

একজন বলল, 'যেমন আমাদের এখানে।'

রামাইয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তা বলতে পার। আমি এ ঘটনাকে অন্য দিক থেকে দেখছি। এ নাটকে মন্ত্রী ও সেক্রেটারি দুই বিপরীত চরিত্র। মন্ত্রী পুরোপুরি পলিটিশিয়ান, সেক্রেটারি পুরোপুরি আই-সি-এস। মন্ত্রী যদি একটু কম রাজনীতি করতেন, কিংবা সেক্রেটারি একটু কম আই-সি-এস হতেন, তাহলে বিরোধ এত বাড়ত না, তার প্রকাশও হ'ত অন্যরকম।

রাঘবন প্রশ্ন করল, 'পুরোপুরি আই-সি-এস বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

রামাইয়া বলল, 'খুব উপযুক্ত, প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। একজন নবীন আই-এ-এস অফিসারের কাছ থেকে আসার জন্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ রাঘবন, আর দশ মাস তের দিন পরে আমার কর্মজীবনের শেষ। অবসর নিয়ে আমি চলে যাব মাদ্রাজে আমার গ্রামে, বাকি জীবন সেখানে কাটাবার ইচ্ছে। অর্থাৎ রিটায়ার করার পরও চাকরির উমেদারি নিয়ে কারুর দ্বারস্থ আমি হব না। অতএব সহজ সরল ভাষায় আপনাকে একটা কথা বলি। কথাটা হল : আই-সি-এস একটা মহান ইনস্টিটিউশন, আর আই-এ-এস হল একটা সার্ভিস! কাউকে বলা যায়, এখনও বলা যায়, 'ইনি একজন পুরো আই-সি-এস।' এ কথাটার একটা গোটা অর্থ আছে। অথচ কাউকে বলা যায় না : 'ইনি একজন পুরো আই-এ-এস।'

রাঘবন বলল, 'টিপিক্যাল আই-সি-এস আপনি কাকে বলবেন?'

রামাইয়া বুঝতে পারল রাঘবন চটেছে। আই. সি. এস.-দের সঙ্গে আই-এ-এস' এর অসম প্রতিযোগিতা। আই-এ-এস'রা জানে আই-সি-এসের সঙ্গে তুলনায় তারা স্তিমিতপ্রভ। জানে বলেই তুলনা পছন্দ করে না। এ প্রসঙ্গ বাড়তে দিলে রাঘবন নিশ্চয় জয়েন্ট সেক্রেটারিদের কাছে লাগাবে : রামাইয়া আই-এ-এসদের নিন্দুক। দশ মাস আরও চাকরি করতে হবে, বছর খানেক একস্‌টেনশন যদি এরা দেয় রামাইয়া অরাজি হবে না। যে জমি ও বাড়িটা মাদুরাই শহরে সে কিনবে ঠিক করেছে তার দাম চুকিয়ে দিয়ে, দুটি অবিবাহিত কন্যার বিবাহ দেবার পর, ব্যাংকের অঙ্ক দেখলে আতঙ্ক হবার সম্ভাবনা। দশ মাসের জায়গায় একবছর দশ মাস কাজটা থাকলে ভালোই।

রামাইয়া বলল : 'টিপিক্যাল আই-সি-এস কে আমি জানি নে। তবে টিপিক্যাল কলেক্টর কে বলতে পারি। ১৮৬৯ সালে একজন বেঙ্গল সিভিলিয়ন, অবশ্যই তিনি ইংরেজ, লিখেছিলেন :

> 'The crack collector, men of equal might
> Reports all day and corresponds all night.'

সকলে হেসে উঠল। রাঘবন, হাসি থামলে, বলল, 'আসলে কি জানেন? আই-সি-এসরা যতটুকু পাওয়া সম্ভব সব পেয়েছে, তার সঙ্গে উপরি পাওনা। দেশ স্বাধীন হবার পর যদি কোনও গোষ্ঠীর মর্ত্যে, এই ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের মাটিতে, স্বর্গলাভ হয়ে থাকে সে গোষ্ঠীর নাম আই-সি-এস। সংবিধানে এদের অধিকার স্বীকৃত। ইংরেজদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেতারা আই-সি-এসদের গ্রহণ করেছিলেন দুহাত পেতে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। অ্যাজ অ্যান এ অ্যাসেট, এ গ্রেট অ্যাসেট। নট অ্যাজ এ লায়াবিলিটি।

'আজ ভেবে দেখবার সময় হয়েছে আই-সি-এসরা দেশের পক্ষে বিশ বছরে কি

হয়ে দাঁড়িয়েছেন—অ্যান অ্যাসেট অর এ বিগ লায়াবিলিটি।'

রাঘবন জানে, উপস্থিত যারা আছে তাদের কারুর পক্ষে তার এই মন্তব্য সেক্রেটারির কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে না। এমন কি অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির কাছেও না।

মন্ত্রণালয়ের অন্য ঘরে এন-জি অর্থাৎ 'ন্যাশনাল গ্রিড' সেকশন। সেকশন অফিসর পি. আর. ঠাকুর জাতে রাজপুত, নিবাস রাজস্থানের উদয়পুর অঞ্চলে। তাঁর নিচে চারজন অ্যাসিস্টেন্ট, তিন জন ইউ-ডি-সি, চারজন এল-ডি-সি, দুজন টাইপিস্ট, একজন দপ্তরি। টাইপিস্ট দুটি মেয়ে। সরলা খান্না, প্রমীলা আহুজা। চৌদ্দটি মানুষের বসবার জন্যে চৌদ্দটি টেবিল, কুড়িটা চেয়ার, অনেকগুলি ফাইল র‍্যাকে : এসব নিয়ে ঘরটা বিরাট হলেও দারুণ স্থানাভাব, একটা লোকের চলে বেড়াবার উপায় নেই। র‍্যাকগুলোতে পুঞ্জীভূত ফাইল আর ফাইল, পুরানো কাগজ আর আরশোলার সম্মিলিত গন্ধ। পি. আর. ঠাকুর তিপ্পান্ন পেরিয়ে চুয়ান্নতে পা দিয়েছে, সরু লিকলিকে লম্বা মানুষটা, মাথায় একরাশ আধপাকা চুল, বড় চওড়া চোয়াল, তীক্ষ্ণ নাকের ওপর মোটা কাচের চশমা। পি. আর. ঠাকুর ভক্ত মানুষ। স্বামী ত্রিগুণানন্দের শিষ্য।

পি. আর. ঠাকুর বলছিল তার সহকর্মীদের ; 'মন্ত্রী যখন গেল, তখন সেক্রেটারিও যাবে, যেতে বাধ্য। এক সপ্তাহের মধ্যে, দেখবে, সেক্রেটারি বদলি হয়ে গেছে।'

অ্যাসিস্টেন্ট আনন্দ বলল, 'এটা হল সেক্রেটারিয়েটের ভদ্রতা।'

মাত্র দেড় বছরের পুরনো অ্যাসিস্টেন্ট শুকদেব টিপ্পনী করল : 'তেমন কিছু আছে নাকি?'

ঠাকুর সবাইকে থামিয়ে, বলল, 'ঠিক। এটা হল কার্টসি অফ সেক্রেটারিয়েট। নতুন মন্ত্রী এসে অনুভব না করেন যে তাঁর সেক্রেটারি ট্যু পাওয়ারফুল। নতুন মন্ত্রী আসার মানে হল আসবে নতুন জে-এস (জয়েন্ট সেক্রেটারি), নতুন ডি-এস (ডেপুটি সেক্রেটারি)। কে থাকবে, কে যাবে কেউ জানে না। যেহেতু কেউ দিল্লি থেকে অন্যত্র বদলি হতে নারাজ, তাই এখন থেকে বেশ কিছুদিন সবাই নিজের নিজের আসন রক্ষার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগবে। যার যেটুকু মুরুব্বি আছে কাজে লাগাবার এই তো প্রকৃত সময়।'

শুকদেব বলে উঠল : 'মুরুব্বি মানে তো মন্ত্রীরা আর এম. পি-রা।'

ঠাকুর বলল : 'প্রধান মুরুব্বি তো এরাই। এদের হাতে পলিটিক্যাল পাওয়ার।'

'তার মানে', শুকদেব বলল, 'সিভিল সার্ভেন্টরা রাজনৈতিক নেতাদের কাছে অনুগ্রহের জন্যে হাত পাততে বাধ্য। আর যদি তাই হল, তাহলে তাদের ইনটিগ্রিটি

ও ইমপারশিয়ালিটি বজায় থাকল কি ক'রে?'

ঠাকুর বলল, 'ওসব বড় বড় কথা আমি জানি নে। তোমারা সব বি-এ এম-এ পাশ ক'রে কেরানি হয়েছ, তোমাদের মুখে এসব কথা শুনতে হয়। আমরা এসব কথা উচ্চারণও করি নি। আজ তের বছর হয়ে গেল সেকশন অফিসর রয়েছি, পাঁচ বছর আর চাকরি আছে, সেকশন অফিসর হয়েই রিটায়ার করতে হবে। অফিসরদের যত দেখছি তত অবাক হচ্চি। ইংরেজ আমলে দেশের সাহেবরা অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি, আন্ডার সেক্রেটারি হ'তে পারলে বর্তে যেতে, ডেপুটি সেক্রেটারি তো রাজা হবার সামিল ছিল। তাঁরা নিজেরা কাজ করতেন। আর এখন? ফাইল পড়ি আমরা, নোট লিখি আমরা, অফিসররা কেবল সই করেন, কেউ ডিসিশন নিতে রাজি নন, কাউকে নিতে উৎসাহও দেওয়া হয় না। কোনও মতে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারলেই হল। তাতে ক'রে কাগজপত্রের কাজ পাহাড়-প্রমাণ বেড়ে গেছে, কমিটি. সাব-কমিটির জঙ্গল গজিয়েছে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে, কর্তাদের রোজ সাতটা আটটা মিটিং, কাজ করবার সময় কোথায়?'

আনন্দ বলল, 'মিটিং ক'রে কি যে হয় ভগবান জানেন।'

সরলা খান্না বলল, 'আলোচনা হয়।'

সকলে হেসে উঠল।

শুকদেব বলল, 'পর্শু যে মিটিং হল তার মিনিট লেখার ভার ছিল ডি-এস (থ্রি)-র (অর্থাৎ তিন নম্বর ডেপুটি সেক্রেটারির)। আমাকে কাল ডেকে বললেন মিনিটের কিছু করেছ? বললাম, আমি তো উপস্থিতই ছিলাম না। বললেন, কেন ছিলে না? বলতে হল, আপনি তো থাকতে বলেন নি। তখন বললেন, না বললেই থাকবে না, এ কবে থেকে শিখলে? বলতে হল, এর আগের মিটিংএ গিয়েছিলাম, জে-এস (পি) বললেন : অ্যাসিস্টেন্টদের উপস্থিত থাকবার দরকার নেই, মিটিংএর কথা বাইরে বড় বেশি ছড়িয়ে পড়ে। আপনার দিকে তাকাতে আপনি স'রে পড়বার ইঙ্গিত করলেন। সে মিটিংএর মিনিটও তো লেখা হয় নি। তখন ডি. এস. (থ্রি) কি বললেন জানেন? বললেন, মিটিংএ যাও কি না যাও, মিনিটের খসড়া তোমাকেই তৈরি করতে হবে। আমার সময় নেই। সবিনয়ে নিবেদন করলাম, স্যর, ইউ-এস (থ্রি) কে বলুন না, তিনি তো ছিলেন মিটিংএ। উত্তরে বললেন, হ্যাঁ ছিলেন, তবে আগাগোড়া ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁকে দিয়ে মিনিটস্ লেখা হবে না। আমি কিছু নোটস নিয়েছি, এগুলো নিয়ে যাও, একটা খসড়া ক'রে নিয়ে এসো।'

আনন্দ বলল, 'একটা ছোট্ট চিঠিও ওঁরা নিজেরা লেখেন না। সব সময় অর্ডার করেন ডি-এফ-এ (অর্থাৎ ড্রাফট ফর অ্যাপ্রুভ্যাল)!'

ঠাকুর বলল, 'আমাদের জীবন তো এমনি করে কেটে গেল! তোমাদের কেমন কাটবে তাই মাঝে মাঝে ভাবি। আমরা যা নীরবে সহ্য করেছি তোমরাও কি তাই করবে? সইতে পারবে একটানা পনের বছর অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে বসে থাকতে? ঐ যে মনোহরলাল, একুশ বছর আগে এল-ডি-সি হয়ে ঢুকেছিল। আজও এল-ডি-সি। পারবে তোমরা এমনি ক'রে জীবন কাটাতে? আমার ছেলেটা এবছর এম. এ. পাস করেছে। বলেছিলাম, অ্যাসিস্টেন্টের পরীক্ষাটায় ব'সে যা। কি বলল শুনবে? বলল, এক কুরসিতে কুড়ি বছর ব'সে থাকা আমার পক্ষে সহ্য হবে না পিতাজি। তার চেয়ে দোকান খুলে বসব। নয়তো ইনসিওরেন্সের দালালি করব।'

সরলা তাকিয়েছিল শুকদেবের মুখের পানে একদৃষ্টিতে। শুকদেব তাকাতে চার চোখ একত্র হল, সরলার মুখখানা রঙিন হয়ে উঠল। শুকদেব বলল, 'আমাকে বোধকরি শিগগিরই বিদায় নিতে হবে। একজন তো আলটিমেটাম দিয়েছে। কেরানিগিরি না ছাড়লে তাকে ছাড়তে হবে। তার মানে কেরানিগিরি ছাড়তে হবে। তাকে ছাড়া তো সম্ভব হবে না।'

সকলে হেসে উঠল আর একসঙ্গে তাকাল সরলার দিকে।

সরলা রঙিন সরমে মাথা নিচু করল।

সেকশনের সবাই জানে শুকদেব ও সরলার মধ্যে প্রেম। ওদের সাদী হবে, আজ না হোক একদিন।

এগারোটা সাতচল্লিশ মিনিট। জনার্দন দীক্ষিত কৃষিভবনে সমাগত হলেন। আকবর রোডে তাঁর বাসভবন থেকে কৃষিভবনের দূরত্ব দু'মাইল, ফোর্ড ইম্পালা-গাড়িতে মিনিট চারেকের রাস্তা। আজও কৃষি-ভবনের ফটকে গাড়ি ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিতের দৃষ্টি পড়ল উপস্থিত মানুষগুলি তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছে কি না, তাদের মুখে সমীহ, কৌতূহল, সম্মান ফুটে উঠছে কি না। তিন বছরের মন্ত্রিত্ব জীবনে জনার্দন দীক্ষিতের কাছে যে দৈনন্দিন ঘটনাটা সবচেয়ে বিস্ময়জনক ও আকর্ষণীয় মনে হয়েছে তা হল : ক্ষমতার সংস্পর্শে মানুষের প্রতিক্রিয়া। তিন বছর তিনি নিজের পরিবর্তন উপভোগ করেছেন. অন্যের প্রতিক্রিয়াও। ক্ষমতার সংস্পর্শে মানুষের শিথিল হয়ে পড়া তিনি পরিভোগের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে এসেছেন। দেখেছেন ভারতীয় সমাজে ক্ষমতার মত ঐশ্বর্য আর নেই। ধন দৌলত, সামাজিক উচ্চতা, শিক্ষা আর্থিক আভিজাত্য সব কিছু নরম, শিথিল, কেন্দ্র পরিভ্রষ্ট হয়ে যায় ক্ষমতার সংস্পর্শে। যে ক্ষমতাবান, অর্থাৎ যার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা, তার সামনে খুব

কম মানুষই জনার্দন দীক্ষিত লক্ষ্য করেছেন, গোটা, নিরেট মানুষ হয়ে অবস্থান করতে পারে, কি যেন রাসায়নিক ক্রিয়ায় মানুষের ব্যক্তিত্ব গলতে শুরু করে, মানুষটা কেমন সুন্দর ভাবে ছোট হয়ে যায়, দুর্বল ; আত্মবিশ্বাস কমে আসতে থাকে, ক্ষমতাকে তুষ্ট করবার আগ্রহ বাড়তে থাকে, তখন আর তাকে গোটা মানুষ মনে হয় না, মনে হয় একে নিয়ে আমি বেশ খেলতে পারি, আমার ক্ষমতার সম্মোহন পড়েছে এর ওপর, এ মানুষটা আমাকে ভয় করে, আমাকে খুশি করতে চায়, তাই মিথ্যা স্তোকে আমার মন ভেজাবার চেষ্টা করছে, আমার অনুগ্রহের জন্যে কি আগ্রহ, তার জন্যে অনেক দাম দিতে তৈরি। এ নিয়মের ব্যতিক্রম জনার্দন দীক্ষিত একেবারে দেখেন নি তা নয়, একটা বিরাট ব্যতিক্রম নিয়ে তিন বছর তাঁকে মন্ত্রিত্ব করতে হয়েছে : বনমালীশংকর ঝা, তাঁর নিজ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি উত্তীর্ণ-মধ্য-বয়স একটা আই-সি-এস ক্ষমতার কাছে শিথিল হয়ে যায় নি, গলে নি, মাখন যেমন গলে যায় উত্তাপের স্পর্শে। মন্ত্রণালয়ে আর কোনও অফিসরকে নিয়ে এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয় নি দীক্ষিতের, আর সবাই নিয়ম মেনেছে, মন্ত্রীকে খুশি রাখতে চেষ্টার প্রতিযোগিতায় উৎসাহে যোগ দিয়েছে, মন্ত্রীর সামনে বসলে তাদের ব্যক্তিত্ব কেমন আলাদা হয়ে গেছে, শিথিল ; বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে, মন্ত্রীর স্তাবকতা করেছে যে প্রশংসা তাঁর পাবার নয়, তা অনবরত দিয়েছে, যে গুণ তাঁর নেই তা কীর্তন করেছে, যা শুনতে তিনি ভালবাসেন, পছন্দ করেন, তাঁকে তাই শুনিয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এবং বাইরে তাঁর মন্ত্রীজীবনের অভিজ্ঞতায় বিশেষ কোন ব্যতিক্রম তিনি লক্ষ্য করেন নি। তাঁর রাজনৈতিক শত্রুদের কথা আলাদা, তারা তো জনার্দন দীক্ষিতের রাজনৈতিক মৃত্যু কামনা করবেই, সেজন্যে চেষ্টারও ত্রুটি করবে না যদিও প্রকাশ্য বিরোধের চেয়ে গোপন ষড়যন্ত্রে তারা নিযুক্ত হবে বেশি, ভারতবর্ষের রাজনীতির এ হল আর একটি নিয়ম, এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুদের হাতে তিনি নিহত হলেন, ওরা জিতল, আমি হারলাম, আমার রাজনৈতিক জীবনে যবনিকা নামল, এর পরের ভূমিকা চলবে নেপথ্যে ; রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থানে, প্রজ্জ্বলিত পাদপ্রদীপের সামনে নায়কের ভূমিকা শেষ হল। যাঁদের তিন বছরের ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সফল হল জনার্দন দীক্ষিত তাঁদের ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনেন, তাঁরা তাঁর সমগোত্র, তাঁরা মাথায় খদ্দরের শুভ্র টুপি পরেন, খাদি বস্ত্র ছাড়া ব্যবহার করেন না, তাঁরা গান্ধীর চেলা এবং দেশপ্রেমিক। তাদের মধ্যে যাঁরা মিত্র এবং যাঁরা তাঁর বৈরি সব এক জাতের, এক গোত্রের মানুষ। ক্ষমতার খেলোয়াড় জনার্দন দীক্ষিত নিজের পরাজয় মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অন্য পরাজয়টাকে মেনে নিতে কেমন যেন বেশি কষ্ট লাগছে বনমালীশংকর ঝা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নি, তাঁকে গোপন আঘাতে নিহত

করতে চায় নি : সরাসরি, মুখোমুখি, সামনা-সামনি দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরাস্ত করেছে। এ মানুষকে তিনি শিথিল করতে পারেন নি। যদি পারতেন, তাহলে হয়তো, যদিও এখানে তিনি অনিশ্চিত সম্ভাবনার অনুবর্তন করছেন মাত্র, তাঁর রাজনৈতিক জীবন আরও কিছুটা দীর্ঘায়ত হতে পারত। হয়তো হ'ত না, মধ্যপ্রদেশের কূপমণ্ডুক রাজনীতিতে অন্তর্ঘাতী উপদলাদলির মধ্যে নেতৃত্ব বজায় রাখা জনার্দন দীক্ষিতের পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিল এবং শেষ রক্ষা করা সম্ভব হল না, তথাপি বনমালীশংকর ঝা-র কাছ থেকে ধারাবাহিক বাধা না পেলে তিনি তাঁর সমর্থকদের জন্যে আরও অনেক কিছু ক'রে উঠতে পারতেন, যা পারার মাশুল তাঁকে দিতে হল নিজের উপদলে ভাঙন রুখতে না পারায়, এ ভাঙনের পূর্ণ সুযোগ নিল মুখ্যমন্ত্রী দিগম্বরচরণ মিশ্র। অতএব একদিক থেকে দেখতে গেলে বনমালীশংকর ঝা জনার্দন দীক্ষিতের রাজনৈতিক মৃত্যুর অন্যতম কারণ, অথচ এ অনমনীয় মানুষটাকে খানিকটা শ্রদ্ধা না ক'রে তিনি পারেন নি, তাঁর আক্রোশ যত বাড়ছিল লোকটার উপর, যত বেশি তাঁর আকাঙক্ষা হচ্ছিল লোকটাকে দুমড়ে মুচড়ে নরম ময়দা ক'রে দিতে, আর সে ময়দা দিয়ে তৈরি করতে এমন একটা বনমালীশংকর ঝা, যে মন্ত্রীর কথায় ওঠে, বসে, শোয়, নাচে, হাততালি দেয়, একটা পুতুল, নাচের পুতুলের বেশি কিছু নয়, যে কথায় কথায় তাঁর প্রধানত্ব, প্রভুত্ব মেনে নেবে, সামনে বসে হাত কচলাবে, মন্ত্রীর সামান্য রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়বে, বুদ্ধি বিচক্ষণতার তারিফ করবে উচ্চরবে, বলবে, বার বার, স্যর, আপনি একটি পলিটিকাল জিনিয়াস ; স্যর, আপনার এ আইডিয়াটা দারুণ ক্রিয়েটিভ ; স্যর, আপনি যখন বলছেন তখন এটা করতেই হবে, যেমন বলে এসেছে অন্যান্য সিভিল সার্ভেন্টরা, যাদের সঙ্গে তিনি সর্বদা মধুর ব্যবহার করেছেন, উদার মনিবের মত, মহাপ্রাণ প্রভুর মত, কেন না তারা ভৃত্যের ভূমিকায় তৃপ্ত ছিল, কেবল এই একটা মানুষ ছাড়া, যাকে তিনি বাগে আনতে পারেন নি, না পেরেছেন নোয়াতে, না ভাঙতে।

গাড়ি থেকে নেমে জনার্দন দীক্ষিত চারপাশের লোকদের মুখের পানে তাকালেন। মনে হল, অনেক চোখে নতুন কৌতূহল। যারা তাঁকে চেনে তাদেব কাছ থেকে আজও নমস্কার পেলেন। কিন্তু, মনে হল নমস্কারের সঙ্গে মিশে গেছে করুণা, অথবা নিছক পরিহাস। আমি মরে গেছি তাইতে এদের খুশি হবার কি কারণ থাকতে পারে? শুধু একটা কারণ বাদে : অন্যের পতনে আনন্দ, অর্থাৎ পরদুঃখপ্রীতি। চোখ হঠাৎ জ্বালা ক'রে উঠল জনার্দন দীক্ষিতের, বুকের ভিতরটা টনটন করল, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তিনি লিফ্‌টে চাপলেন। লিফ্‌টম্যান সেলাম ঠুকল, চটপট তাঁকে নিয়ে উঁচুতে উঠল, সোজা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, অথচ দীক্ষিতের মনে হল লোকটা

তাঁকে পরিহাস করছে! যেন বলছে, আজও তোমাকে মানছি, কিন্তু কাল আর মানব না, কাল তুমি এ লিফ্‌টে চাপতে এলে বলব, ওদিকে তিন নম্বর লিফ্‌ট নিন বাবুজী, এটা কেবল ভি. আই. পি.-দের জন্যে। পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে পৌঁছলে লোকটা চটপট দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল, দীক্ষিত নিষ্ক্রান্ত হবার সময় আবার সেলাম করল, এগিয়ে চললেন জনার্দন দীক্ষিত, একবার ইচ্ছে হল পেছন ফিরে দেখে নেন লোকটা হাসছে কি না, সাহস হল না।

বারোটা দশ মিনিটে জনার্দন দীক্ষিত টেলিফোন তুলে নিজস্ব পি. এ-কে বললেন, 'সেক্রেটারিকে আসতে বল।'

তিন মিনিট পরে বনমালীশংকর ঝা মন্ত্রীর কামরায় ঢুকলেন।

দীক্ষিত একটা ফাইল পড়ছিলেন। দরজায় টোকা পড়তে তাকিয়ে দেখতে পেলেন ঝা প্রবেশ করছেন। ফাইল পড়তে পড়তে শুনতে পেলেন, 'আফটারনুন স্যর।' মাথা নাড়লেন। ঝা এসে মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন। দীক্ষিত ফাইলে দুচোখ রেখেই বললেন, 'দরকারি জরুরি কাজগুলো সেরে ফেলা যাক।'

ঝা বললেন, 'বেশ তো।'

'মিঃ প্যাটেল কি আজও বরোদায়?'

'যতদূর জানি। শুনছি তিনি আজই ফিরছেন।'

'ফেরাই স্বাভাবিক।'

বনমালী গলা সাফ করে বললেন, 'স্যর, আমি বলতে চাই যে আমি খুব দুঃখিত।'

'কেন? আমার মন্ত্রিত্ব যাওয়ায়?'

'আমাদের মতভেদ হয়েছ অনেক। কিন্তু এরকম কিছু ঘটুক তা আমি চাই নি।'

'অর্থাৎ আমি অন্য দপ্তরে স্থানান্তরিত হলেই আপনি পরিতৃপ্ত হতেন।'

'অথবা আমি।'

'সত্যি বলতে কি আপনাকে বদলি করতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি আমার।'

'জানি।'

'কিন্তু এমনই নিদারুণ প্রভাব আপনাদের এই স্টিল ফ্রেমের, আপনার সব আই-সি-এস সহকর্মীদের যে আমার মত মন্ত্রীর সাধ্য নেই, সাধ্য হয় নি, আপনাকে সরাবার।'

বনমালী নীরবে শুনলেন।

'আপনার আমার মধ্যে ডেডলক না ঘটলে এ মন্ত্রণালয়ের কাজ আরও ভাল হত।'

'কাজ কিছু খারাপ হয় নি। তৃতীয় প্ল্যানের কাজ আমরা যতোটা করতে পেরেছি

তোটা অনেক মন্ত্রণালয়ে সম্ভব হয় নি।'

'তা হবে। তবু দেশে দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়েছে।'

'দুবছব পর পর অনাবৃষ্টি হলে খাদ্যাভাব ঘটবেই। কিন্তু একে দুর্ভিক্ষ বললে ভুল হবে।'

'এ বছরও বৃষ্টি নেই। দেখবেন আগামী বছর কি ঘটে।'

'এবছর বৃষ্টি না হলে আসছে বছর দু'তিনটি রাজ্যে খাদ্য-সংকট দেখা দেবে তা ঠিক।'

'সৌভাগ্যক্রমে আমি তখন মন্ত্রী থাকব না।' দীক্ষিত একটু হাসবার চেষ্টা বলেন।

বনমালীর মন্তব্য করার কিছু ছিল না।

দীক্ষিত বললেন, 'মধ্যপ্রদেশে আর. ই. স্কিম দুটো কি চালু থাকবে?'

'সার্ভে তো হচ্ছে। সার্ভে পার্টি কি রিপোর্ট দেয় দেখতে হবে।'

'একটা প্রশ্নের সঠিক জবাব চাই। সার্ভে কি ঠিকমত শেষ হবে? না, আপনারা ব্যাপারটারও এখন মৃত্যু ঘটাবেন?'

বনমালী এক মিনিট চুপ ক'রে রইলেন, পরে বললেন, 'নতুন মন্ত্রী যদি সার্ভে বন্ধ ক'রে না দেন তাহলে ঠিক ঠিকই শেষ হবে।'

'তার মনে আপনি নতুন মন্ত্রীকে ওটা বন্ধ করবার পরামর্শ দেবেন?'

'আলোচনা যদি হয়, আমার মত তাঁকে বলতেই হবে। যেমন বলেছি অনেকবার আপনাকে।'

'তার মানে, মধ্যপ্রদেশের স্কিমগুলো বেঁচে থাকবে না।'

'আমি এখনই তা বলতে রাজি নই।'

'ব্যাপারটা কি জানেন?' জনার্দন দীক্ষিত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বললেন, 'মন্ত্রীদেব সমস্যাগুলি আপনারা বোঝেন না। আমরা রাজনীতি করি, পাঁচ বছর অন্তর জনসাধারণের কাছে ভোটের জন্যে হাত পাততে হয়। ভোট আমরা নিজেরা কুড়োই না, অন্যেরা আমাদের হয়ে কুড়োয়। আপনি ভাববেন, কেন? অত বড় পার্টি রয়েছে, চিন্তা কি? কিন্তু কংগ্রেস পার্টি এত বড়, এত দীর্ঘজীবী কেন? একমাত্র কারণ যারা আমাদের আসল সমর্থক, যারা আমাদের ভোট জুটিয়ে দেয়, তাদের আমরা কমবেশি সন্তুষ্ট রাখতে পারছি। তারা আমাদেব কাছ থেকে পাচ্ছে তাই আমরা তাদের কাছ থেকে পাচ্ছি, পাবার আশা রাখছি। সোজা কথায়, এ হচ্ছে লেন-দেনের সম্পর্ক। তাদের হাতে কিছু যদি না আমি পৌঁছে দিতে পারি, তারাও আমার জন্যে গ্রামে গ্রামে ভোট যোগাবে না।'

বনমালী বললেন,'এটা বুঝতে পারা এমন কিছু শক্ত নয়।'

'তাহলে এবার মধ্যপ্রদেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। শাসকগণ হলেন ছত্রিশগড়ের রাজত্বও তাঁদের হাতে। এককালের মধ্য ভারতকে এঁরা একেবারেই স্নেহের চোখে দেখেন না। ফলে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে উন্নয়ন যা কিছু হচ্ছে, বারো আনা পাচ্ছে ছত্রিশগড় এবং ভূপাল, চার আনা মধ্যভারত। আমি মধ্যভারতের লোক, পাঁচ বছর পর পর আমাকে ইন্দোরের ভোটারদের কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়। আমি কেন্দ্রের পূর্ত ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী। আমি যদি মধ্যভারতের জন্যে, ইন্দোরের জন্য কিছু না করতে পারি, তারা আমাকে ভোট দেবে কেন?'

'না দেওয়াই সম্ভব।'

'অথচ তিন বছরে আমি একটা বড় স্কিম মধ্যভারতের জন্যে মঞ্জুর করাতে পারলাম না।' জনার্দন দীক্ষিতের গলা ভারী হয়ে এল।

বনমালী নীরব রইলেন।

'পারলাম না তার প্রধান কারণ আপনি। আপনি আমাকে একটুও সাহায্য করলেন না।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যর। এ বিষয়ে আমার মতামত আপনি ভালো করে জানেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ফাইভ ইয়র প্ল্যানে যে সব স্কিম অনুমোদিত, সেগুলো কার্যকরী করার পরিবর্তে বিকল্প স্কিম কাজে পরিণত করতে যাওয়া মানে প্ল্যানকে পেছন থেকে আঘাত করে পঙ্গু ও বিফল করে দেওয়া। মধ্যপ্রদেশের সরকারের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনার পর ও রাজ্যের জন্যে যে স্কিমগুলি অনুমোদিত আমাদের কর্তব্য সেগুলোকেই আগে বাস্তবে রূপায়িত করা। মধ্যপ্রদেশের বা অন্য কোনও রাজ্যের উপদল রাজনীতির বেদিতে প্ল্যানের বলি আমি সমর্থন করতে অক্ষম।'

'জানি। এ নীতিই আপনি আগাগোড়া মেনে এসেছেন। এবং ভবিষ্যতে মানবেন। অতএব মধ্যভারত কেন্দ্রের কাছ থেকে বিশেষ কিছুই পাবে না। আপনার নীতি মধ্যভারতের প্রতি ভূপালের সৎমা ব্যবহারকে সবল ক'রে রেখেছে।'

'আমি বলব, এটা মধ্যপ্রদেশের আভ্যন্তরীণ কলহ। এর মীমাংসা হবে মধ্যপ্রদেশে, কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে নয়।'

'মীমাংসা তো হল,' দীক্ষিত ম্লান হেসে বললেন, 'দিগম্বর মিশ্র জিতল, জনার্দন দীক্ষিত হারল।'

একটু পরে : 'আপনার ওপর আমার রাগ হয়েছে অনেক, হবার কারণও আছে যথেষ্ট। কিন্তু আজ আর সে সবের কোন অর্থ নেই। একটা অনুরোধ আপনাকে

করব। যদি সম্ভব হয় গোয়ালিয়র অঞ্চলের গ্রামগুলির কথা মনে রাখবেন। ওরই একটি গ্রামে অনেকদিন হল আমার জন্ম হয়েছিল। ছোটবেলায় যখন প্রথম গোয়ালিয়র শহরে এসে বিজলি বাতি দেখলাম তখনই আমার মন প্রশ্ন করল, আমাদের গ্রামে এরকম আলো কেন নেই? এত অন্ধকার কেন আমার গ্রাম? সে অনেক আগের কথা। তারপর দেশে কত পরিবর্তন ঘটল, কিন্তু আমার গ্রামের অন্ধকার কাটল না। মধ্যপ্রদেশের রাজত্ব যতদিন ছত্রিশগড়িদের হাতে থাকবে, মধ্যভারতের উন্নয়ন চলবে টিমে তালে, চোখেই পড়বে না। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়, আমার গ্রামের অন্ধকারটুকু দূর করবেন।'

জনার্দন দীক্ষিত এমন ভাবে কথাগুলি বললেন, শুনে বনমালীশংকর ঝা'র কান গরম হল, মুখ রক্তিম। উত্তরে মুখে ভাষা এল না।

'সারা দেশটা', জনার্দন দীক্ষিত বলে চললেন, 'অন্ধকার থেকে আলোয় আসবার জন্যে আপনাদের কাছে এমনি মিনতি জানাচ্ছে। আপনারা প্রশাসনের রথী, মহারথী। মন্ত্রীরা আপনাদের তুলনায় অশিক্ষিত, অমার্জিত ; তারা নীতি তৈরি করে, তার বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব আপনাদের। নীতি ও বাস্তবে দেশে আজ এই যে বিরাট ব্যবধান, এর প্রধান দায়িত্ব আপনাদের। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, স্বাধীনতার পরে আমাদের যতগুলি বড় বড় ভুল হয়েছে তার মধ্যে একটা হল : প্রশাসনের দায়িত্ব আপনাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। যে স্টিল ফ্রেম দিয়ে ইংরেজ তার সাম্রাজ্য শাসন করত, যার প্রশংসায় ইংরেজ ছিল শতমুখ, সে স্টিল ফ্রেম দিয়েই আমরা চাইলাম স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজ তৈরি করতে। এত বড় একটা ভুল কি ক'রে যে সম্ভব হল ভাবতেও আমার অবাক লাগে। আপনারা আপনাদের উচ্চশিক্ষা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সভ্য স্বভাব এবং ইংরেজ-প্রিয়তা দিয়ে ক্রমে ক্রমে বিবাট এক আমলাতন্ত্র গ'ড়ে তুললেন, দেশটা হয়ে রইল প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক।'

বনমালী কিছু বলতে গেলেন। জনার্দন দীক্ষিত তাঁকে নিরস্ত ক'রে বলে চললেন, 'আমি জানি আপনি কি বলবেন। কিন্তু শুনতে চাই নে। আজ আমি যা বলছি তাই শুনে নিন। আমি বলছি, আপনারা আই-সি-এস'রা ভারতবর্ষকে এগোতে দিলেন না। তার কারণ ভারতবাসী যে পথে এগিয়ে যেতে পারত সে পথ আপনাদের জানা নেই। আপনারা জানেন কেবল ইংরাজের সাম্রাজ্যশাসনের পথ, ইংরাজের দেখান পথ ছাড়া অন্য পথ আপনাদের জানা নেই। দেশ স্বাধীন হল, আপনারা, যাঁরা এতদিন স্বাধীনতা আন্দোলনকে পিষে মারবার চেষ্টা করেছিলেন, হঠাৎ দেশপ্রেমী হয়ে উঠলেন, আমরাও আপনাদের হাতে দেশ-গড়ার দায়িত্ব সঁপে দিয়ে ভাবলাম স্টিল ফ্রেম এবার সিলভার ফ্রেমে পরিণত হল। কিন্তু তা হল না, আপনারা প্রশাসনকে

জনসাধারণের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখলেন, আপনাদের চিন্তাধারায় জনগণের কোনও সক্রিয় অংশ নেই, তাই প্রশাসনের মাধ্যমে আপনারা সমাজ গড়তে চাইলেন, যে কাজ কখনও কোথাও সম্পন্ন হয় নি। ক্রমে ক্রমে যা হবার তাই হল : মুষ্টিমেয় একটা অংশ ধনী হল, তাদের ধনসম্পদ দিন দিন বাড়তে চলল, আপামব জনসাধারণের দারিদ্র্যও যেমন চলল বেড়ে। এদিকে প্রশাসন হয়ে উঠল আমলাতন্ত্র, ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে কেউ এর কাছে পাত্তা আর পেল না। দোষ, আপনি বলবেন, যদি কারুর হয়ে থাকে তা আপনাদের নয়, আমাদের, এবং আমি তা মানব, প্রধান দোষ আমাদের। পরিহাসের মাত্রাটা দেখুন : প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্যে দেশেব লোক দোষ দিচ্ছে আমাদেরই, আপনাদের নয়। অথচ প্রশাসনের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তার মুখ্য দায়িত্ব আপনাদের।'

বনমালী উঠবার ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার এখন যাওয়া উচিত। কাজ আছে।'

জনার্দন দীক্ষিত তিক্ত হেসে বললেন, 'একটা জিনিস দেখে যান। দেখে খুশি হবেন।'

টেবিলের ড্রয়ার থেকে তিনি তিন শিট টাইপ-করা কাগজ বার করলেন। কাগজগুলি ঝা'ব দিকে এগিয়ে দিলেন।

ঝা প্রথম কাগজখানায় চোখ রাখলেন। মুখ তাঁর আবার লাল হল।

দীক্ষিত বললেন : 'সামান্য একটু গবেষণা করিয়েছি আপনাদের সৌভাগ্য নিয়ে। স্বাধীনতার পর পঞ্চাশজন আই-সি-এসেব ভাগ্যে বিধাতার কি কি আশীর্বাদ বর্তেছে একবার তাকিয়ে দেখুন। একটা গরিব দেশের পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব ভারতবষ আপনাদেব তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছে। এই পঞ্চাশ জনেব মধ্যে দশজন অ্যামবাসাডার হয়েছেন, তের জন অন্য প্রযোজনে বিদেশে ভারতেব স্বর্থরক্ষা কবেছেন, আঠাব জন একাধিক সরকার-নির্মিত কাবখানা-শিল্প সংস্থার পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন। আটজন গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন। আপনাদেব যা ক্ষমতা অন্য কোনও দেশের সিভিল সার্ভেন্টদের তা নেই। এই যে পঞ্চাশজন আই-সি-এস' এব কথা বলছি, এঁদেব মধ্যে আঠার জন বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন বাইশ জন রিটায়ার করবাব সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বিরাট প্রাইভেট সেক্টব কোম্পানিব ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন, তিনজন মন্ত্রিত্বে ভূষিত হয়েছেন, ছ'জন পার্লামেন্টের সভ্য। তাহলে দেখুন যেদিকে হাত বাড়িয়েছেন, সে দিকেই আপনারা পেয়েছেন আঙুরের স্পর্শ ও সন্ধান। ভারতবর্ষ আপনাদের অনেক দিয়েছে। আপনারা বদলে কি দিয়েছেন একবার ভেবে দেখবেন। গর্বিত অহংকারে নয়, বাস্তব দৃষ্টিতে।'

বনমালী উঠে দাঁড়ালেন : 'আপনি যা বললেন তার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যি নেই

আচ্ছা, আমি আসি।'

জনার্দন দীক্ষিত হাসলেন। 'আসুন। ও, হ্যাঁ, একটা শেষ কথা। মন্ত্রীকে বিদায় দেবার জন্যে বোধকরি মন্ত্রণালয়ের লোকের' সভার আয়োজন করবে। না করলেই ভাল হ'ত, কিন্তু না-করার মত সাহস এদের হবে না। আপনি যদি এসব সভায় বক্তৃতা না করেন আমি খুশি হব।'

'সেটা কি ভালো দেখাবে?'

'না কিন্তু ভালো দেখাবার প্রয়োজন আমার কাছে আর নেই।'

'আমাদের কাছে আছে। আপনার পরেও গভর্নমেন্ট টিকে থাকবে। তার ফর্ম এবং ডেকোরাম নষ্ট হ'তে দেওয়া ঠিক হবে না।'

'তাহলে আপনার মুখ থেকেও প্রশস্তি আমাকে শুনতে হবে?' জনার্দন দীক্ষিত যেন চাপা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

বনমালীশংকর ঝা দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন মন্ত্রীর কামরা থেকে।

দ্বি তী য় অ ব চ্ছে দ

ব্যবধান

ছুটি পাঁচটায়, কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের কাজ চলে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পরেও। উঁচু মানের রাজপুরুষরা সাধারণত সাড়ে ছ'টা-সাতটার আগে দপ্তর ত্যাগ করেন না। দিনের বেশিভাগ কেটে যায় মিটিং-এ, বিভিন্ন আগন্তুকের সঙ্গে কথা-বার্তায়, নিজেদের মধ্যে গল্পে। পাঁচটার পর যে যার জরুরি কাজ নিয়ে বসেন। পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী জনার্দন দীক্ষিতের আদৎ ছিল পাঁচটার পর সেক্রেটারি অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ও জয়েন্ট সেক্রেটারিদের ডেকে পাঠানো। মন্ত্রীর ঘরে আলাপ-আলোচনা সেরে এঁরা নিজেদের কাজ-কর্ম সমাপ্ত ক'রে সাধারণত সাতটার আগে দপ্তর ছাড়তে পারেন না। তার উপর অবিশ্যি রয়েছে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিজস্ব আদৎ। বনমালীশংকর ঝা সম্ভব হলে ছ'টার সময় দপ্তর ছাড়েন, প্রয়োজন হ'লে ন'টা পর্যন্তও থেকে যান। নিরাময় রায় ছ'টার পরে বড় বেশি থাকতে চান না, যদি-না মন্ত্রীর সঙ্গে বাৎচিতের বাধা থাকে। জে. এস.-দের মধ্যে বিশ্বনাথন সাড়ে সাতটার আগে সচরাচর দপ্তর ত্যাগ করে না, মহেন্দ্র শর্মা আটটা পর্যন্ত দপ্তরবাস করে। দীপংকর দয়াল ও বিজনবিহারী ভগৎ সেক্রেটারি যতক্ষণ দপ্তরে থাকেন ততক্ষণ চ'লে যাবার কথা ভাবতে পারে না; বিশেষ প্রয়োজন হ'লে আগে দপ্তর গোটাবার অনুমতি নিয়ে নেয়। ডেপুটি সেক্রেটারিদের মধ্যে বেশির ভাগ জে. এস-রা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দপ্তরে বাতি জ্বালিয়ে কাজ ক'রে, কেউ কেউ আগেই সরে পড়ে।

উচ্চপদস্থদের সেবার জন্যে নিচু পদের মানুষগুলিকেও দপ্তরে আটকে থাকতে হয়। কেরানিদের সাতটা পর্যন্ত থাকা পুরাতন অভ্যেস, তারা তার আগে নড়তে চায় না। কমবয়সী কেরানিরা পাঁচটা বাজতেই উসখুস্ ক'রে, সাড়ে পাঁচটার পরে আর

থাকতে চায় না। প্রায় প্রতি সেকশনে পালা ক'রে একজন বা দুজন অ্যাসিস্টেন্ট বড়সাহেবরা বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত বসে থাকে। কখন কি জরুরী কাজের ডাক পড়ে বলা যায় না।

মহিলা কর্মচারীদের পাঁচটার পর আর আটকে রাখা যায় না। এন-জি সেকশনের সরলা খান্না পৌনে পাঁচটার সময় অ্যাসিস্টেন্ট শুকদেবের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে ইশারা করল, যার মানে, এবার তৈরি হও, চটপট স'রে পড়ো ; উত্তরে শুকদেব মুখভঙ্গি করল, যার অর্থ : দেখি, শালা ঠাকুর কি বলে। রোজই ওরা দুজনে একসঙ্গে ছুটির পরে বেরিয়ে পড়ে, কোথাও গিয়ে চা-জলখাবার খায়, ঘুরে বেড়ায়, বসে বসে গল্প করে, তারপর একসময়ে শুকদেব সরলাকে হয় বাসে তুলে দেয়, নয়তো বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে নিজের বাসার পথ ধরে। আজ লাঞ্চ টাইমে দুজনে ঠিক করেছে একটু তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে প'ড়ে কুতুব-মিনারে যাবে, পূর্ণচাঁদে কুতুম-মিনার দেখতে ভাল লাগবে। পৌনে পাঁচটায়, তাই, সরলা টাইপিং-এর কাজ শেষ ক'রে কাগজপত্র, কার্বন, ফাইল ইত্যাদি ড্রয়ারে পুরে, সাবান হাতে ক'রে বাথরুমের দিকে চলে গেল, যাবার সময় আর একবার সংকেত করল শুকদেবকে। হাত-মুখ ধুয়ে সরলা যখন সেকশনে ফিরল তখনও শুকদেব ফাইল পড়ছে ; মুখে একটা বিকৃত ভঙ্গি ক'বে সরলা গদরেজ মেশিনটা বন্ধ করল, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পাঁচটা বাজতে ছ' মিনিট বাকি। উদাস চোখে কড়ি-কাঠের দিকে তাকিয়ে রইল সরলা। ওদিকে শুকদেব ফাইল পড়া শেষ ক'রে সযত্নে ফাইল বন্ধ ক'রে, হিসেব করল ক'টা এফ-আর (নতুন কাজ) আজ এসেছে, কটা ফাইলের কাজ এখনও বাকি। দেখল জরুরি এমন কিছু বাকি নেই যার আজই প্রয়োজন হতে পারে। আস্তে আস্তে উঠে বাথরুমে গেল, হাত মুখ ধুয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল কয়েক মিনিট। জে. এস-টুর (বিজনবিহারী ভগত) পি. এ. কিশোর তার দোস্ত, তার ঘরে গিয়ে দেখল সে নেই, জে. এস.-এর কাছে ব'সে নোট নিচ্ছে। শুকদেব যখন সেকশনে ফিরল তখন পাঁচটা বেজে দশ মিনিট, ঘরে ঢুকতেই সরলার চোখে চোখ পড়ল, দু-চোখে একসঙ্গে ঝিলিক খেলল, দু-দেহের রক্ত একসঙ্গে নেচে উঠল। শুকদেব এক পা এক পা এগিয়ে ঠাকুরের কাছাকাছি উপনীত হতে ঠাকুর বলল, 'এই যে শুকদেব, তোমাকে খুঁজছিলাম, আমার একটু কাজ আছে, তুমি বরং আজ জে. এস. থাকা পর্যন্ত থেকে যাও।'

ওদিকে সরলার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, এদিকে শুকদেব পাথর।

ঠাকুর বলল, 'সংসার তো করো না, আমার অবস্থা কি বুঝবে?'

একজন প্রশ্ন করল : 'কি আবার ঝক্কি এল, ঠাকুর সাহেব?'

'আরে রাম, ঝক্কি বলে ঝক্কি! সকালবেলা বেরুবার মুখে ধর্মপত্নী বলল সে গর্ভবতী!'

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল। একসঙ্গে অনেক কণ্ঠ বলে উঠল : 'এই বয়সে! শাবাশ! শাবাশ!'

সরলা ও প্রমীলাও হাসিতে যোগ দিল।

'বয়স? কার বয়স? আমি তো চুয়ান্ন বছরের ছোকরা! তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি তাকত রাখি. জান?'

'আর বহুজি?' একজন প্রশ্ন করল।

'তার আর কত বয়স হবে? ত্রিশ-বত্রিশ হবে হয়তো! যে স্বামী পত্নীকে ত্রিশের অধিক জ্ঞান করে তার মধ্যে প্রেম নামক রসের অভাব।'

'এ নিয়ে ক'টি হল, ঠাকুর সাহেব?'

'বেশি নয়, বেশি নয়। ঐ যে 'দুই কি তিন, ব্যস' ওটা হল শুকদেব-সরলার জন্যে।'

সকলে আবার হাসল।

ঠাকুর বলল, 'আরে শুকদেব, মুখখানা যে একেবারে আমসি হয়ে গেল। অদূরে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবে আর একখানা বদনও বর্ষার আকাশের বর্ণ ধারণ করেছে। আরে না, না। বলতে আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। বলছিলাম আমার একটু কাজ আছে গোলমার্কেট পাড়ায় সন্ধের পর, আজ আমিই থাকব, তুমি এবং তোমরা যে-যার গৃহাভিমুখে বেরিয়ে পড়তে পার। অবশ্যি. সবাই যে সত্বর গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে না, তাও জানি।'

শুকদেব লাফিয়ে উঠল. সরলা মূর্ছা যাবার ভান করল, সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

'তাহলে ঐ সন্তান সম্ভাবনার সংবাদটা—'

একজনের কথা কেড়ে নিয়ে ঠাকুর বলল, 'প্রিম্যাচিউর। তবে চেষ্টা চলছে।'

শুকদেব বলল, 'ঠাকুরসাব, আপনি লাখে একটি।'

'লাখে কেন বলছিস রে বেটা, বল কোটিতে একটি। পাঠিয়ে দিস সাদীর পর তোর বহুকে আমার ধর্মপত্নীর কাছে। কিসে কি হয় না হয় সব বাৎলে দেবে। কোনও পুস্তক পাঠে তার একাংশ জ্ঞানও অর্জন করতে পারবে না।'

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। প্রথম হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাস লাগল দেহে। সূর্য অস্ত গেছে, ছ'টার মধ্যেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। রাস্তায় দপ্তর-ফেরত মানুষের লম্বা লম্বা লাইন লেগেছে বাসের জন্যে। বাস-মোটরগাড়ি, স্কুটার-রিকশা, ফটফটির সমবেত শব্দে রাস্তা মুখরিত।

শুকদেব বলল, 'বাসে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে এসো একটা ট্যাক্সি নি।'

সরলা বলল, 'অনেক টাকা লাগবে। বাস পেয়ে গেলে পৌঁছতে দেরি লাগবে না।'

'পেতে দেরি লাগবে।'

'একটা স্কুটাব পেলে মন্দ হ'ত না।'

শুকদেব বলল, 'কবে যে আমার স্কুটারটা পাবো!'

সরলা বলল, 'পেয়ে কাজ নেই। যা সব অ্যাক্সিডেন্ট হয় আজকাল!'

'তুমি দেখছি আমাকে একেবারে লক্ষ্মীছেলে ক'রে রেখে দেবে!'

'রাখবই তো!'

স্কুটার পাওয়া গেল না। অগত্যা দুজনে লাইনে দাঁড়াল। একটার পর একটা বাস এসে যাত্রী তুলছে। চতুর্থ বাসে স্থান হল ওদের। তাও শুকদেব বসতে পেল না। লাইনে দাঁড়িয়ে দুজন অনেক বক-বক করেছে, বাসে বাধ্য হয়ে চুপ-চাপ থাকতে হল।

কুতুবে যখন বাস পৌঁছল তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে কুতুব-মিনারে এবং প্রাচীন ভগ্নাবশেষগুলিতে। চাঁদেব দিকে মাথা তুলে স্থির অহংকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনার, স্পষ্ট তাকে দেখা যাচ্ছে না, তরল অন্ধকার আর চাঁদের আলোর মিনারকে নরম মনে হচ্ছে, কমনীয়। কিছু লোক তখনও রয়েছে মিনার-প্রাঙ্গণে। সবুজ নরম লনের ওপর কয়েকটি ছোট ছোট মানুষ-সমাবেশ। কয়েকজন রেস্তোরাঁয় ব'সে চা-কফি-কোকাকোলা খাচ্ছে। কেউ কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। খান দশেক গাড়ি পার্কিংএর জায়গায় দাঁড়িয়ে। চৌকিদার সেখানে পাহারা।

ওরা হাত ধরাধরি ক'রে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। কুতুবের নিচে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। শুকদেব বলল, 'চা খাবে?'

'আমার দরকার নেই। বড্ড দাম নেয়। তুমি খাবে?'

'তার চেয়ে গরম জিনিস পেলে আমারও দরকার নেই।'

'অনেক লোক।'

'চলো ঐদিকটায় গিয়ে বসি।'

ওরা গিয়ে বসল লৌহস্তম্ভের কাছাকাছি একটি নির্জন কোণে গা ঘেঁষে। শুকদেব সরলাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেল। এদিকটায় তখন কেউ নেই, তবু সরলা সতর্ক হল। বলল, 'ছেড়ে দাও, কেউ এসে যাবে।'

'আসুক।'

'সেদিন ইন্ডিয়া গেটে কি হল কাগজে পড়েছ?'

'পুলিশের বদমাইসি।'

'ভীষণ অন্যায় কি বলো ; কেউ নিরালা ব'সে একটু প্রেম করবে, তাও পুলিশের অসহ্য।'

'অসহ্য নয়। খুব সহ্য। পুলিশ চায় লোকেরা প্রেম করুক। তা না হ'লে ব্ল্যাকমেল করবে কি করে?'

'ঠাকুর সাহেব লোকটা দারুণ অসভ্য!'

'আমার তো মনে হয় ভীষণ রসিক! ঠাকুর আছে বলেই এ চাকরি তবু সহ্য হয়।'

'তার মানে তুমি এ চাকরিই করবে?'

'না না। করব না। কালই পদত্যাগপত্র দাখিল করব।'

'মেডিকেল ফার্মে কাজটার কি হল?'

'আগামী সপ্তাহে জানতে পারব।'

'আমার কাকার বড় বিজনেস্ আছে। রেডিয়ো, ইলেকট্রনিকস্ এসব। তুমি কাজ করবে তার সঙ্গে?'

'দেখি, নিজের চেষ্টায় কিছু জোটাতে পারি কি না।'

'তুমি বড্ড অহংকারী।'

'তা নইলে তুমি পাত্তা দিতে?'

শুনে সরলা খুশি হল। শুকদেবের হাতখানি তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখল। শুকদেব হাত বাড়িয়ে সরলার বুক স্পর্শ করল! সরলা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। কামিজের মধ্যে হাত ঢুকল শুকদেবের, সরলার নরম গরম বুক মুঠোয় এল। সরলার শরীর রোমাঞ্চিত হল, বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগল। শুকদেবের ক্ষুধার্ত আঙুল সরলার স্তনবৃন্ত দুটিকে সতেজ, সজীব, শক্ত ক'রে তুলল। নিতম্ব কেঁপে উঠল সরলার।

'এবার সরে বসো। কারা আসছে।'

'পুলিশ!'

'আচ্ছা যদি সত্যি পুলিশ এসে পড়ে?'

'বলবে, থানায় চলো।'

'তখন কি হবে?'

'থানায় যাবো।'

'তারপর?'

'থানাদারকে প্রশ্ন করব স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে এমন দুটি নরনারীর, যাদের শীঘ্রই সাদী হবে, অধিকার কি নেই নিরালায় ব'সে এক-আধটু বিশুদ্ধ প্রেম করবার?'

'তুমি যা করছিলে তা মোটেই বিশুদ্ধ প্রেম নয়।'

'তবে কি অশুদ্ধ?'

'নিষিদ্ধ।'

'দারোগা বলবে কি করছিলে দেখাও তো! তখন দারোগার সামনে একটা ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দেব।'

'খবরদার!'

'আহা তোমাকে নিয়ে নয়। যে পুলিশটা ধরে নিয়ে যাবে তাকে নিয়ে।'

হেসে গড়িয়ে পড়ল সরলা।

'খালাস পেয়ে যাবে?'

'পাওয়া তো উচিত।'

'না পেলে?'

'দারোগাকে বলব, আমাদের এক ঘরে হাজত-বাস করতে দিন, যতদিন রাখবেন ততদিন থাকব।'

আর তক্ষুনি দারোগা বিগলিত হয়ে বলবে, 'তাই হোক।'

একদল লোক কাছাকাছি এসে পড়ায় ওরা নীরব হল। দলটার কেউ কেউ কৌতূহলের সঙ্গে ওদের লক্ষ্য করতে করতে অনিচ্ছায় এগিয়ে গেল।

শুকদেব বলল, 'জানো, এখানে রাত্রিবাস করার ব্যবস্থা আছে।'

'শুনেছি। রেস্তোরাঁর সংলগ্ন ইন্‌সপেকশন বাংলোয় ঘর পাওয়া যায়।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'তুমি জানলে কি করে?'

'ভগৎ সাহেবের পি. এ. কিশোর আমার বন্ধু। সে বলেছে। ভাড়া এমন কিছু বেশি নয়। পনের টাকা।'

'সে জানল কি করে?'

'ভগৎ সাহেব মাঝে মধ্যে এখানে রাত্রিবাস করেন।'

'কার সঙ্গে?'

'পত্নীর সঙ্গে নিশ্চয় নয়।'

'তবে?'

'তা জানি নে। লোকটা দারুণ মালবাজ।'

'খুব জানি। আমাকে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিল। "আপনি টাইপিস্ট? তাহলে আমার একটা কাজ চটপট করে দিন।" চার পাতার লম্বা নোট। "দেখবেন যেন ভুল না হয়।" আমি তো ভয়ে ভয়ে টাইপ করে বার বার মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। তখন কি প্রশংসা! "ভেরি গুড ওয়ার্ক! ভেরি ক্লিন!" তারপর কত প্রশ্ন। কোথায় থাকেন আপনি?" "ক'দিন কাজ করছেন এখানে?" "বাড়িতে কে কে আছে?" "আর ইউ হ্যাপী হিয়র?" "ঠাকুরকে বলে দেব, আপনার ওপর চাপ না দেয়।" আমি ভয়ে কাঠ।'

'তখন আমি কোথায় ছিলাম?'

'তুমি তখনও আমাদের সেকশনে উদয় হও নি।'

'তারপর আর দুবার ডেকেছিল। একদিন বলল, "আপিসের পর আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব আজ। আমি ওদিকে যাচ্ছি, কাজ আছে।" আমি ভয়ে ভয়ে ঠাকুর সাহেবকে বললাম। ঠাকুর সাহেব বলল, "এক্ষুনি বাড়ি চলে যান।" চলে গেলাম। তারপর আর ডাকেনি।'

'ঠাকুর সাহেব লোকটা ভাল।'

'খুব ভাল।'

ওদের আশেপাশে আবার নিরালা। এরা আবার ঘনিষ্ঠ হল। শুকদেবের হাত সরলার দুটি বুকে আগুন ধরাবার উপক্রম করল। অধর প্রলম্বিত মিলনে মিলল অধরে।

শুকদেব বলল, 'আমার সঙ্গে এক রাত থাকবে তুমি এখানে? এই কুতুব-মিনারে?'

সরলা বলল, 'বিয়ের পর। কিন্তু খরচ অনেক হয়ে যাবে।'

'বিয়ের পর কেন? এখন নয় কেন?'

'তা হয় না। বিয়ের আগে ওসব হবে না।'

'কেন ? ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি আছে। ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

'বিয়ের তো দেরি আছে।'

'তা হলেও। ও আমি পারব না।'

'তোমার ইচ্ছে করে না?'

ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা নয়। বিয়ের আগে ওসব হবে না।'

'তার মানে তুমি আমায় বিশ্বাস করো না।'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। তুমি পুরুষ। তোমরা এসব কথা বোঝ না। আমি বিয়ের আগে পারব না। আমাকে তুমি প্রলুব্ধ কোর না। দুর্বল কোর না।'

দুজনে কুতুব থেকে যখন বেরুল তখন রাত আটটা বেজে গেছে। ক্ষিধে পেয়েছে দুজনেরই। শুকদেব মেহরলী রোডের মোড় থেকে ভাজিয়া কিনল। তাই খেতে খেতে দুজনে বাসে বসল। সরলা থাকে রাজিন্দর নগরে, কুতুব থেকে কম ক'রে দশ মাইল। শুকদেব থাকে গোলামার্কেটে লেক স্কোয়ারে। দুজনে পাশাপাশি বসে কনটপ্লেস পর্যন্ত যাবে, তারপর পাবে রাজিন্দর নগরের বাস। নিকট-হৃদয় প্রণয়ীদের কথা ফুরোয় না, একে অপরের কাছে, নিজে নিজেরই কাছে বিচিত্র রহস্য, সে রহস্য দুর্ভেদ্য মনে হয়, তাকে যত ভেদ করো তত সে সঘন, নিবিড়।

'তুমি আই-এ-এস পরীক্ষা দিয়েছিলে?'

'পাশ হই নি।'

'ভাগ্যিস হও নি। আই-এ-এস হলে আর আমার দিকে তাকাতে না।'

'হলে অবশ্য ভালই হত। ওরকম চাকরি আর নেই।'

'তোমার ভাল হত, আমার নয়।'

'অ্যাসিস্টেন্টের কাজটাও মন্দ নয়। কিন্তু কুড়ি বছর একই কাজ করতে হবে ভাবলে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।'

'কেরানির কাজ আবার ভাল হয় নাকি? বুদ্ধির, কর্মশক্তির, উদ্যোগের দাম নেই একটুও।'

'তাই তো ঠিক করেছি ছেড়ে দেব।'

'তার চেয়ে ব্যবসা করা ভাল। আমার কাকা ব্যবসা করে দারুণ ধনী হয়েছে। আর আমার বাবা ক্ষুদে কেরানি!'

'ব্যবসা করতে গেলে টাকা চাই যে!'

'আমাদের টাকা নেই কেন বল তো? আমার কাকার অনেক টাকা ; আর আমার বাবার একেবারে টাকা নেই। ভীষণ অন্যায়।'

'ভাগ্যিস নেই। তুমি ধনী লোকের কন্যা হলে কি আর আমাকে পাত্তা দিতে?'

সরলা সরে বসল শুকদেবের গা ঘেঁষে। শুকদেবের বাহু স্তনস্পর্শ করল।

'নিশ্চয় দিতাম। আমরা তোমাদের মত নই। আমার বাবা যদি ধনী হত, তার কাছ থেকে পাওয়া সব টাকাকড়ি তোমাকে দিতাম ব্যবসা করবার জন্যে।'

'তোমার বাবা তোমাকে ত্যজ্যকন্যা করতেন।'

প্রসঙ্গটা সুস্বাদ লাগল না সরলার কাছে। সে বলল, 'একটা প্রশ্নের সত্যি জবাব দেবে?'

'তার মানে তোমার প্রশ্নের আমি মিথ্যে জবাব দিয়ে থাকি?'

'তা নয়। আমি সত্যি জানতে চাই তুমি চাকরি ছাড়ছ কি আমার কথায়?'

'অনেকটা তাই।'

'আমি না চাইলে ছাড়তে না?'

'ছাড়তাম হয়ত। আমি অনেক পয়সা কামাতে চাই। তবে বোধহয় এখনই ছাড়তাম না।'

'তোমার উচ্চাশা আমার খুব ভাল লাগে। যাদের উচ্চাশা নেই তারা পুরুষ নয়। যেমন আমার বাবা।'

'তোমার কিন্তু খুব উচ্চাশা আছে। বোধহয় আমার চেয়েও বেশি। ভয় হয় তোমাকে খুশি করতে পারব কি না।'

'পারবে।' সরলার হাত পড়ল শুকদেবের তলকটি প্রদেশে। সে আবার বলল, 'তুমি পারবে।'

রাজিন্দর নগরে সরলাকে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে শুকদেব বিদায় নিল। সরলা তাকে বাড়ি এসে চা খেতে অনুরোধ করেছিল, রাত একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় সে রাজি হয়নি। সরলা দরজায় আঘাত করতে তার বাবা এসে দ্বার খুলল। সাতান্ন বছরের কৃপামাধব খান্নার চেহারায় পঁয়ষট্টি বছরের বার্ধক্য। ছোটখাট বোকাবোকা মানুষটা, দেশভাগের পরে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সেই যে বোকা হয়ে গিয়েছিল তা আর কাটে নি। মূলতানে কৃপামাধবদের নিজস্ব বসতবাড়ি জমিজমা ছিল, দেশভাগের পর মুসলমানদের আক্রমণে নিজের চোখের সামনে সে তার পিতাঠাকুরকে মরতে দেখে হঠাৎ একেবারে বোকা হয়ে গিয়েছিল। মরতে হয়ত তাকেও হত, এবং তার স্ত্রী ও কন্যাকে, হয় নি তার একমাত্র কারণ ছোটভাই ছোটেলালের দুঃসাহস। দু'নলা বন্দুক নিয়ে একা সে দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধ করেছিল, হটতে বাধ্য করেছিল। মূলতান থেকে এক সময়ে দু ভাই সপরিবার দিল্লি এসে পৌঁছল, ছোটেলাল বছর দশেকের মধ্যে কনট্রাকটরি করে ধনী হয়ে গেল. এখন তার মস্ত রেডিয়ো-নির্মাণের ব্যবসা, কিন্তু কৃপামাধব রয়ে গেল বোকা বোকা, চাকরি পেল কেরানির. পুনর্বাসন দপ্তরে, দু'কামরার বাড়ি পেল রাজিন্দর নগরে ; আর এক বছর পর দেড়শ টাকা পেনসনে

সে অবসর নেবে। এই দু'কামরা বাড়িতে আরও হাজার হাজার শরণার্থী প্রতিবেশীদের মধ্যে, কেরানি বাপের দরিদ্র সংসারে সরলা বড় হয়েছে, আজ তার বয়স পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশ-ছুঁই, যদিও ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে সে মাত্র কুড়িতে পড়েছে। বাবা তার বড় একটা কথাই বলে না, চলে ফেরে আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে, তাকায় আতংকিত চোখে, সময় সময় নির্বোধের মত হাসে। সংসারে সব কর্তৃত্ব মা-র, মা-র নাম যমুনাবাঈ, বিরাট দশাসই দেহ, কণ্ঠস্বর কর্কশ ও চওড়া, যে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কেবল একটানা পরিশ্রম করে, যার জন্যেই, বলতে গেলে, সরলার বাবা এই বাড়িটা পেয়েছে সামান্য দামে, এবং চাকুরিটাও। দারিদ্র্য ও নিরানন্দে বড় হতে হতে সরলা কেবল স্বপ্ন দেখেছে, একদিন, কোনও ম্যাজিকে, অর্থাৎ ভগবানের দয়ায় সে ধনী হবে, তার কাকার মেয়েদের সঙ্গে তখন আর প্রভেদ থাকবে না। ধনী হবার বাসনা ও স্বপ্ন বালিকাকাল থেকে সরলাকে পয়সা সম্বন্ধে দারুণ সতর্ক করেছে, পয়সা জমিয়ে টাকাতে পরিণত করা তার ছোট বয়সের খেলা। রাজিন্দর নগর স্কুলে কয়েক বছর প'ড়ে করোলবাগের একটা প্রাইভেট 'কলেজে'র মাধ্যমে সরলা 'পঞ্জাব ম্যাট্রিক' পাস করেই চাকরির খোঁজ করছিল, হঠাৎ মন বদলে ঐ 'কলেজ' থেকেই দু বছরে 'পঞ্জাব বি. এ.' পাস করে টাইপিং শিখে নিল। কাজ পেল ভারত সরকারের এক দপ্তরে টাইপিস্ট ক্লার্কের। নিজের প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় ছাড়া অন্য কিছুতে সে তার রোজগারি টাকা খরচ করে নি, যদিও মা অনেক সময় অচল সংসারকে সচল করতে বৃথা হাত পেতেছে, এ নিয়ে মা ও মেয়েতে ঝগড়া কম হয় নি। তারপর এক সময় সরলা সুযোগ পেয়ে পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে ইউ-ডি-সি হল, মাইনে বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার ধাক্কায় তার জীবনে প্রথম সে কক্ষ্যচ্যুত হল, অর্থাৎ যে স্থির বুদ্ধি নিয়ে এতদিন পথ চলেছে তার বাইরে পদসঞ্চার করে সরলা কঠিন শিক্ষা পেল।

খুবসুরৎ না হলেও সরলা সুশ্রী, অনেকের চোখে সুন্দরী! উচ্চতায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, বেঁটে নয়, ঢেঙ্গাও নয়। ছিমছাম দেহ। ছাতিতে চৌত্রিশ, কোমরে চব্বিশ, নিতম্বে ছত্রিশ। ওজনে একশ ষোল পাউন্ড। দেহের বর্ণ পাকা গম, চোখ দুটি বড় বড়, সামান্য কটা, মাথায় বেশ চুল, মুখানা সুডৌল, নাক সরু, দাঁতগুলি একটু উঁচু, থুতনির মধ্যভাগে বড় একটা তিল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় মুখখানা অতি সরল, মেয়েটি বড় সুশীল। ইংরেজিতে যাকে বলে ইনোসেন্ট। অন্যের চোখে নিজের এই প্রতিকায় সম্বন্ধে সরলা বাল্যকাল থেকে সজাগ ও সচেতন। এ প্রতিকায় অথবা ইমেজ তাকে অনেকের স্নেহ ও বিশ্বাস অর্জনে সাহায্য করত, যেমন করেছিল বন্ধু অর্চনার পরিবারের। এমন বেশ কয়েকটি পরিবার ছিল, এখনও আছে, যেখানে

সরলা একেবারে নিজেদের মেয়ের মত, জন্মদিনে তারা ওকে উপহার দেয়, দশেরায় শাড়ি অথবা সালোয়ার-কামিজ কিনে দেয়। অর্চনার পরিবারেও সরলা ছিল মেয়ের মত, কোনও একটা উপলক্ষ হলেই তার বিশেষ নিমন্ত্রণ। এমনি উপলক্ষ হল যখন অর্চনার মামা পঞ্জাব সরকার থেকে বদলি হয়ে এল ভারত সরকারে, উঠল অর্চনাদের বাড়িতে। মাঝারি বয়সের মজবুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারার পুরুষটিকে দেখেই সরলা কেমন একটা উত্তেজনা বোধ করেছিল শরীরে, যা সে আগে কখনও করে নি, চোখে কেমন একটা জ্বালা, ঘাড়ে হঠাৎ গরম-লাগা, নিজেকে একসঙ্গে লুকোবার ও প্রকাশ করবার জীবন্ত আগ্রহ। লোকটিও প্রথম দৃষ্টিতেই সরলাকে সস্নেহে নিজের ভাগ্নির মতই আপনার করে নিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় ধর্মাধিকরণে কোনও এক মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারি ; এল-ডি-সি সরলার কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বর। দিন পনের অর্চনাদের সঙ্গে তিনি বাস করেছিলেন। প্রায় রোজ সবলাকে, তাঁর ও অন্য সবার অনুরোধে, বিকেল বেলা দপ্তর-ফেরত ওদের বাড়ি গিয়ে রাত্রির খানা খেয়ে নিজের বাড়ি ফিরতে হল, মামাবাবু পৌঁছে দিতেন প্রত্যেকদিন। সরলার ভাই ছিল না, বাপ অমন থেকেও অনুপস্থিত, কাকার একটি মাত্র ছেলে, যে বোধকরি গরিব বলেই, সরলার দিকে তাকিয়েও দেখত না ; অর্চনার দুজন দাদাই বিদেশে, অর্থাৎ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মন নিরেট হয়ে ওঠবার প্রসরণে সরলা এই প্রথম একজন পুরুষের উত্তপ্ত প্রসাদে পুলকিত হল যে অনেক বড়, যে একসঙ্গে অনেক উঁচু এবং বেশ কিছুটা কাছে, তার পিতা হতে পারতেন অথচ হন নি, যার কাছে সরলা যুগপৎ শিশু ও নারীবসত্তার প্রতিলোম অনভূতি পেল, এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। একদিন পাড়ার চ্যাংড়া ছেলেরা কখনও-বা এক আধটু পেছনে লেগেছে, সরলার মা-র ভয়ে তার চেয়ে বেশি সাহস করে নি, বাসে চড়বার বা বাস থেকে নামবার সময় কোনও তস্করলোভী হাত সরলার স্তনস্পর্শ করেছে, রাগ হবার সঙ্গে পেয়েছে হাসি, দপ্তরে পুরুষগুলি, যাদের মন ফাইলের পাংশু পাতাগুলির মত অপ্রদাহী, বেহায়া লালসায় সরলার যৌবন চাটতে চেয়েছে চোখের পিঙ্গল ক্ষুধায়, এ-সব পুরুষ-দৃষ্টি সরলাকে সংকুচিত করেছে, প্রসারিত করে নি, দরিদ্র করেছে, ঐশ্বর্যবোধ এনে দেয় নি। এখন, এই একুশ বছরের মধ্যদিনে, সরলা এমন একজন পুরুষের প্রজ্জ্বলিত স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠলো, যার চোখের দৃষ্টিতে দূরাগত আকর্ষণ, যিনি পিতৃপ্রতিম পুরুষকার, যাঁব সান্নিধ্যে সরলার মন শিশু হয়ে ওঠে, দেহ যুবতী।

মামাবাবু অর্চনাদের বাড়ি ছেড়ে বিঠলভাই প্যাটেল ভবনে নিজের ছোট্ট ফ্ল্যাটে উঠে গেলেন, কিন্তু সরলাকে ছাড়লেন না। সরলা জানত কিছুদিন তিনি একা বাস করবেন দিল্লিতে, ছেলেমেয়েদের স্কুল ধরে রেখেছে তাঁর পত্নীকে চণ্ডীগড়ে। তিনি

যখন অর্চনাদের আতিথ্য কাটিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেলেন, সরলা বিষণ্ণ হল, বঞ্চিত লাগল নিজেকে, মেনে নিল গরিব বাপের কেরানি মেয়ের বড়মানুষের ক্ষণিক স্নেহই মূল্যবান উপরি পাওনা, তার স্বল্পায়ু নিয়ে খেদ করার মানে নেই। মেনে নিল বলেই তার পুলকের সীমা রইল না যখন একদিন সকাল এগারটা বাইশ মিনিটে মামাবাবু তাকে ফোন করে জানতে চাইলেন, সেক্রেটারিয়েটে একটা অপেক্ষাকৃত ভাল চাকরিতে তার উৎসাহ আছে কি না। মানে প্রায় একশ' টাকা বেশি, উন্নতির সম্ভাবনা থাকবে তা সে যত ক্ষীণ হোক, কাজটাও হয়তো উন্নতমানের হবে। সরলা বিগলিত আগ্রহে জানাল উৎসাহ আছে, এই ছোট্ট নগণ্য দপ্তরের ক্ষুদ্রতম কেরানি-জীবন তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে ; জবাবে মামাবাবু বললেন, ওঠবারই কথা, সরলার মত মেয়ের পক্ষে বর্তমান চাকরি নিতান্ত অযোগ্য ; শুনে সরলা উদ্দীপিত হল, তার যোগ্যতার উচ্চতর মান নির্ণয় শুনল এই প্রথম। মামাবাবু বললেন, ছুটির পরে আমার অফিসে চলে এস, দরখাস্ত এখানেই লিখে দিও, আমার পি. এ. সব করে দেবে। দেখি কাজটা তোমাকে পাইয়ে দিতে পারি কি না। পাঁচটা বাজতে সরলা উঠে পড়ল, বাথরুমে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে প্রসাধন করল, সাড়ে পাঁচটায় মামাবাবুর দপ্তরে হাজির হয়ে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না : কি প্রশস্ত দপ্তর-কামরা, কি চমকদার সব ফার্নিচার, রেডিওতে মৃদু সেতার বাজছে, দেয়ালে কি সুন্দর সুন্দর ছবি, মেঝেতে মোলায়েম রংদার কার্পেট। নরম গদির চকচকে চেয়ারে বসে মসৃণ টেবিলে সরলা নিজের মুখের আবছা প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। মামাবাবু তাকে পরম স্নেহে স্বাগত করলেন, বেয়ারা এসে দামি ঝকঝকে পাত্রে চা দিয়ে গেল, সঙ্গে বিস্কুট ও ক্যাশুবাদাম। মামাবাবু বললেন, শুনে সরলার মন খুশিতে ভরে গেল, মুখখানা আনন্দে ফুটে উঠল, তিনি তাকে ভোলেন নি, তাঁর মত সুন্দর, সরল, বুদ্ধিমতী, আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী মেয়ে তিনি কম দেখেছেন, জীবনে তার আরও অনেক কিছু পাওয়া উচিত ছিল এবং একদিন সে পাবেই, মামাবাবু প্রায়ই তার কথা ভেবেছেন, বলতে গেলে রোজই, অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও গতকাল তিনি জানতে পেরেছেন পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে তাঁর বন্ধু বিজনবিহারী ভগতের অধীনে একটি ইউ-ডি-সি'র পদ খালি, এখুনি ভরতি করা হবে, ভগতকে বলে রেখেছেন ঐ পদটি তাঁর চাই। ইউ-ডি-সি'র চাকরিতে সরলাকে মানাবে না, ন্যূনপক্ষে তার অ্যাসিস্টেন্ট হওয়া উচিত, কিন্তু অ্যাসিস্টেন্টের চাকরি এভাবে পাইয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে ভবিষ্যতে অন্য কিছু হয়তো সম্ভব হয়ে যেতে পারে, তিনি নজর রাখবেন। এল-ডি-সি সরলা বর্তমানে বেতন পাচ্ছে মাসান্তে দুশো টাকার কম, ইউ-ডি-সি সরলা পাবে তিনশো টাকার বেশি, তফাতটা এমন কিছু উপেক্ষণীয় নয় ; তাছাড়া, সে

বোধহয় জানে না (সরলা ভালই জানত) সাবরডিনেট আপিসে কেরানি হয়ে ঢোকার মানে একই চেয়ারে জীবন কাটিয়ে দেওয়া, অন্যপক্ষে সেক্রেটারিয়েটে উন্নতির সম্ভাবনা বর্তমান। মামাবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পি. এ. ঘরে এল, সসম্মানে সরলাকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে, তার দরখাস্ত তৈরি হল, ফিরে মামাবাবুর ঘরে এসে সরলা দেখল তিনি আসনে নেই, মন্ত্রীর কাছে গেছেন ; সরলা বসল, অনেক কিছু ভাবনা মনকে অস্থির ক'রে তুলছিল, তারই মধ্যে সরলা টের পেল জীবনে প্রথম সে রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। মামাবাবু এলেন প্রায় সন্ধেসন্ধি, বললেন, চল তোমাকে পৌঁছে দেব বাড়িতে, তার আগে আমাকে একটু সময়ের জন্যে বাসায় যেতে হবে, তুমিও এসো, এককাপ চা তৈরি করে আমায় খাওয়াও, তোমার হাতের চা খেয়েছিলাম অর্চনাদের বাড়ি, বেশ সুন্দর চা করো তুমি। সেই সরলার প্রথম প্রবেশ মামাবাবুর ফ্ল্যাটে, একটি পুরুষের বাসস্থান যে এত মনোহর ও বিস্ময়জনক হ'তে পারে সেই তার প্রথম অভিজ্ঞতা, একজন পুরুষের সান্নিধ্য যে কত নিশ্চিন্ত নির্ভর আত্মসুখের উৎস হতে পারে সেই তার প্রথম উপলব্ধি। মামাবাবু গল্পে সরলাকে হাসিয়েছিলেন, টেপ-রেকর্ডে গান্ধী, নেহেরু সর্দাব প্যাটেল, আইনস্টাইন, হিটলার, মুসোলিনি, জন কেনেডি, রাজ কাপুর, নার্গিস ও ওয়াহিদা রহমানের কণ্ঠস্বর শুনিয়ে তাকে বিস্মিত করেছিলেন, রেডিয়োগ্রামে গান শুনিয়ে খুশি, স্লাইড প্রোজেক্টরে নানা দেশের ছবি দেখিয়ে মুগ্ধ, ব্যক্তিগত স্নেহে ও সমাদরে একেবারে বিগলিত। গে-লর্ডে খাইয়ে মামাবাবু যখন সরলাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন রাত তখন দশটা বেজে বিয়াল্লিশ, সরলার মন খুশিতে ফাল্গুনের রঙিন আকাশ। বাবা বোকা মুখে ঘুমিয়ে। মা তখনও সেলাই নিয়ে ব্যস্ত। পাড়ার দর্জিদের অর্ডার মত সেলাই করে যমুনাবাঈ যা রোজগার করে তা না হলে সংসারের চাকা চলে না।

মামাবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটা কোনদিকে যাচ্ছে সরলার বুঝতে সময় লাগল না নিজেকে সরিয়ে নেবার শক্তি বা প্রবল ইচ্ছা সে খুঁজে পেল না। বরং দুঃসহ মাদকতা তার রক্তে নাচ তুলল, সে নাচের তাল ও ধ্বনি প্রবাহিত হল শিরায় শিরায়। মন খুলে কথা বলার মত ছিল না সরলার কেউ ; বাবা তো জীবন্ত অনুপস্থিতি, মা-র সঙ্গে সম্পর্ক অনেকটা শীতল সহাবস্থান, যমুনাবাঈ বি. এ. পাস দপ্তরে-নোকরি-করা মেয়েকে সমীহ করে চলত, সে যা করছে যেভাবে চলছে তার ওপর গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করার সাহস তার ছিল না। অতএব জীবনের প্রথম সংকট-সন্ধিক্ষণে হিসাব নিকাশ করতে হল একা সরলাকেই, এবং যেদিন মামাবাবুর কাছে নিজেকে সে সমর্পণ করল, তার মনে সন্দেহের অবকাশ রইল না যে সে তাই চেয়েছিল, অত

বড় মানুষটাকে একান্ত নিজের ক'রে, তার আদিম উলঙ্গতায় জৈব তেজসিকতায়, কাঙাল কামনায়, সরলা তাকে চেয়েছিল। অতএব মানুষটার অভিলাষ জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সরলার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছিল ; একদিকে উন্মেষিত হল তার আত্মবিশ্বাস, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, নিজের মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতা, অন্যদিকে, দিন দিন বেড়ে উঠল এক বিরাট পুরুষকে ধূলিসাৎ করবার দুর্বার আকাঙক্ষা যার সঙ্গে এসে মিশল রক্তের নাচ, ধমনীর সঙ্গীত। বিরাট পুরুষ অনেক তপস্যার পর নতজানু হয়ে সরলার দাক্ষিণ্য চাইল, সরলা বিশাল ঔদার্যে তার কামনা পূর্ণ করল।

কিন্তু অন্ধ উল্লাসে, দৃষ্টিহীন আত্মসমর্পণে নয়। চোখ খুলে, সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় সরলা দান করল। একবারকে দ্বিতীয়বার হ'তে দিল না। প্রথমবারের পর সরলা বুঝল দ্বিতীয়বার হলে দু'শ, দু'হাজারবার না হবার কারণ বা উপায় থাকবে না, এবং তখন সরলা আর থাকবে না দাত্রী, হয়ে যাবে আরও একটি শরণার্থী-পরিবারের আর একটি সংহৃতা সমর্পিতা নারী। মামাবাবু অনেক চেষ্টা করেও দ্বিতীয়বার সরলাকে নিজের ফ্ল্যাটে আনতে পারলেন না। তাঁর অনেক কাকুতি, আমন্ত্রণ, উপঢৌকন, অনুনয়ের জবাবে সরলা সহজ স্থির কণ্ঠে একটি মাত্র জবাব দিল : দ্বিতীয়বার হ'লে আর তার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, তার আগে মামাবাবুকে একটা কাজ করতে হবে : স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ, সরলা খান্নার সঙ্গে বিবাহ। যেহেতু এ প্রস্তাব মামাবাবুর কানে ঢুকলেও মাথায় বা মনে স্থান পেল না, সেহেতু সরলা কিছুতেই দ্বিতীয়বার রাজি হল না, তাদের সম্পর্ক একসময় হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল। সরলা তাতে অসুখী হল না, বরং নিরুপদ্রব বোধ করল। তখন তার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ়, ব্যাংকে, মামাবাবুর উদারতায়, নিজের মাইনে থেকে জমান টাকার ওপরে, আর তেরশ' টাকা ছিয়াত্তর নয়া পয়সা একত্রিত।

শুকদেবের সঙ্গে সরলার পরিচয় দু'বছরের, বন্ধুত্ব একবছর দু'মাসের, প্রণয় এগার মাস আঠার দিনের। সেকশনে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে আমার ভাল লেগেছিল, সরলা শোবার ঘরে সালোয়ার-কামিজ ছাড়তে ছাড়তে নিজেকে বলছিল, মনে হয়েছিল ছোকরা দেখতে বেশ, ব্যক্তিত্ব আছে। এক ঘরে বসে রোজ আট নয় ঘণ্টা কাজ, আলাপ হল সহজেই, কিন্তু তুমিও আলাপ জমাতে এগিয়ে আসো নি, আমিও এক তিল গরজ দেখাই নি। বোধহয় এই পারস্পরিক আপাত ঔদাসীন্যই আমাদের মধ্যে আকর্ষণের জাল বুনে রেখেছিল। তোমার কত নোট ডি-এফ-এ আমি টাইপ করে দিয়েছি, সহকর্মীর সম্পর্ককে অন্যকিছুতে রূপায়িত করাব ঔৎসুক্য তুমি দেখাও নি, আমিও না, অথচ ঔৎসুক্য আমাদের দুজনের অন্তরেই দানা বেঁধেছিল, যা ধরা পড়ল, তারিখটা আমার আজও মনে আছে, যেদিন জে. এস. (টু)

তোমার ঘাড়ে শেষ মুহূর্তে একবোঝা কাজ চাপিয়ে দিল, তুমি ঠাকুরসা'বকে বললে একজন টাইপিস্ট চাই, ঠাকুরসাহেব ইতস্তত ক'রে শেষ পর্যন্ত আমাকে বলল, আমি বাইরে অনিচ্ছা দেখিয়ে বাজি হলাম, তুমি আর আমি একা রাত ন'টা পর্যন্ত কাজ করলাম, আমরা কিছুই মুখে উচ্চারণ করলাম না, অথচ জানলাম আমরা কি চাই, পরস্পরকে আরও ভাল ক'রে জানতে চাই, পরিচয় আমাদের আচমকা বন্ধুত্বে রূপায়িত হল, তিন মাসের মধ্যে আমরা ভালোবাসায় ডুবে গেলাম। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে আমার ভয় করছিল, পাছে আমার বাবাকে দেখে, মাকে দেখে আমাদের দারিদ্র্য দেখে তুমি পালিয়ে যাও, তুমি যাও নি, বরং আমি গরিব বাবা-মা'র মেয়ে হয়েও তোমার চোখে যা, তাতে তুমি খুশি হয়েছ (তুমি জান না, জানবেও না আর একজন পুরুষের চোখে আমি কি ছিলাম, সে পুরুষ তোমার মত মিষ্টি-মধুর না হলেও অনেক কিছুতে তোমার চেয়ে অনেক বড়।) তুমি একদিন সাদীর প্রস্তাব করলে, আমি রাজি হলাম, তারপর হঠাৎ তোমার বাবা মারা গেল। তোমার বাবাকে আমি দেখিনি কখনও, কেবল ফটোতে ছাড়া, ভাগ্যিস, কেরানি হলেও আমার বাবার মত বোকা বোকা থেকেও-নেই দেখায় নি তাঁকে, এক বছরের জন্যে তোমার বিয়ে স্থগিত, অতএব আমারও। জানি তুমি আমাকে চাইছ, আমাকে না পেয়ে তুমি জ্বলছ (সরলা শুয়ে শুয়ে নিজের স্তনে হাত বোলাল), চাইছি জ্বলছি আমিও, কিন্তু, না, না, না। অনেকদিন, তিনবছরেরও বেশি হয়ে গেছে যা ঘটেছিল, মাত্র একবার, কি দারুণ সে একবার, ভাবতে গোপনে ভাল লাগে, দ্বিতীয়বার নয়, দ্বিতীয়বার ঘটলে তোমাকে আর পেতাম না, সে একবারের ঘটনা তুমি জানবে না, আমি জানি তুমি বুঝতে পারবে না, তুমি জানবে সরলা কুমারী, একুশ বছরের কুমারিত্ব নিয়ে তোমার বাসরের রাণী, আর কিছু তুমি জানবে না, তুমি বড় লক্ষ্মী, বড় ভাল, আমাকে তুমি কতো ভালবাস. ..

সরলাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে শুকদেব গোলমার্কেটের বাস ধরল। বাসের জন্যে অপেক্ষার সময় এবং বাসে ব'সে তার মনে যে-সব চিন্তার তরঙ্গ ব'য়ে গেল, তার মধ্যে সরলার স্থান প্রমুখ হলেও প্রধান নয়। সরলার সঙ্গে প্রণয় জমাবার পর থেকে শুকদেবের প্রধান চিন্তা কি ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাবে, সুদূর ভবিষ্যতে নয়, আয়ত্তাধীন আগামী কালে। তার বাবাও ছিল ছাপোষা কেরানি, ম'রে যাবার পর শুকদেব জেনেছে তার সারাজীবনের অর্জিত ও সঞ্চিত উত্তরাধিকার ত্রিশ হাজার টাকার বেশি হবে না। এর মধ্যে রয়েছে জীবন-বীমা, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং

পোস্ট-আপিসে জমান যৎকিঞ্চিৎ অর্থ। পরিবারে মা ও একটি ছোট ভাই শুকদেবের দায়িত্ব, বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, তার স্বামী পাতিয়ালায় উন্নত ধরনের চাষবাস ক'রে বেশ অবস্থাপন্ন, এ বছরই হয়তো নিজের ট্র্যাক্টর কিনে ফেলবে। ছোট ভাইটি হংসরাজ কলেজে বি. এস-সি পড়ছে, পড়াশোনায় শুকদেবের চেয়েও ভালো, আই-এ-এস পরীক্ষায় শুকদেব উৎরাতে পারেনি কিন্তু সে পারবে। সেক্রেটারিয়েটে চাকরি আছে তাই সরকারি বাসা এখনও আছে, পাড়াটা সবদিক দিয়ে সুবিধেজনক, ভাড়া কম। চাকরি ছাড়লে বাসাও যাবে। অথচ সেক্রেটারিয়েটে ঢুকে শুকদেব বুঝেছে, বুড়ো বয়সে সেকশন অফিসর হয়ে রিটায়ার করতে পারার চেয়ে উচ্চতর সম্ভাবনা তার জীবনে অনুপস্থিত, অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী-সন্তানসহ হাজারের কাছাকাছি রোজগার,বড়জোর আড়াইশো টাকা পেন্সন। এতে তার চলবে না, চলবে না। অথচ চাকরি ছেড়ে অন্য কিছু করার রাস্তা আবিষ্কার সহজ নয়। সরলা আমাকে ভালোবাসে, খুব ভালোবাসে, শুকদেব বলল নিজেকে, কিন্তু আমার চাকরিকে একটুও শ্রদ্ধা করে না ; বার বার সে পরিষ্কার জানিয়েছে আমি যে অন্য পথে জীবনে দ্রুততর, বৃহত্তর সাফল্য খুঁজছি, আমার প্রতি আকর্ষণের তা হচ্ছে অন্যতম প্রধান কারণ। সরলাকে সাদী করলে, অতএব, অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে জীবনযাপন অসম্ভব হবে। এখানে ওখানে চাকরির চেষ্টা করেছে শুকদেব, এমন কিছু এখনও জোটে নি যা সবদিক থেকে গ্রহণযোগ্য। বিজনেসে নামতে তার আগ্রহের অভাব নেই, অভাব অর্থের ; এমন কোনও কিছুতে সে জড়িয়ে পড়তে নারাজ যাতে বাবার সঞ্চিত ত্রিশ হাজারে টান পড়বে, ও টাকাটা কিছু বাড়িয়ে ছোটমত একটা বাড়ি করতে পারলে লাভ হবে অনেক বেশি। পাঁচ বছর পেন্সন ভোগ করবার আগেই বাবা মারা গেল, মা-রও যা দেহের অবস্থা, বেশি দিন বাঁচবে না হয়তো, ভাই কয়েক বছরের মধ্যে (আশা করা যায়) আই-এ-এস হয়ে অন্যত্র চলে যাবে ; সরলাকে নিয়ে নিজের বাড়িতে সুন্দর সুঠাম সংসার স্থাপন করবার পক্ষে বিশেষ কোনও বিঘ্নের সম্ভাবনা কম। এখন প্রয়োজন হল চটপট অর্থকরী রাস্তার সন্ধান।

মোটামুটি সন্ধান একটা শুকদেব পেয়েছে, মনও অনেকটা স্থির ক'রে এনেছে, যদিও সরলাকে এখনও বলা হয় নি, বলবার ইচ্ছেও নেই। বাবার মৃত্যুতে সাদী পিছিয়ে গিয়ে আটমাস সময় এখনও শুকদেবের হাতে আছে, এ আটমাস সে তার নিজের পুরোপুরি কর্তা, এরই মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি তাকে তৈরি ক'রে নিতে হবে। সরলা খুব ভালো মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে, কিন্তু শুকদেব এমন পুরুষ নয় যার জীবনে স্ত্রী শাসন অথবা পরিচালনা সহজগ্রাহ্য। আমি আমার জীবনে সরলাকে আনব, সে পাবে তার সম্মানিত স্থান, কিন্তু সে যা বলবে আমি তাই করব এমনটি

হ'তে পারবে না। সরলাকে বলেছি একতা পরিষ্কার ভাষায়, শুনে সে প্রতিবাদ করে নি, বরং বলেছে, তুমি ঠিক রাস্তায় চললে দেখবে আমি পেছনে, বড়জোর, পাশে আমি, এগিয়ে যাই নি। ঠিক রাস্তা মানে? সরলা সরল জবাব দিয়েছে : ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি যার অর্থ নেই তার কিছু নেই। সে রাস্তায় অর্থ আছে, ঠিক রাস্তা বলব তাকেই। অর্থকরী একটা রাস্তার সন্ধানই শুকদেব পেয়েছে, আশা করছে, তাতে চলতে শুরু করা অচিরে সম্ভব হবে।

রাস্তাটা ব্যবসায়েরই, কিন্তু মূলধন লাগবে না, লাগবে পরিশ্রম, তৎপরতা, চারদিক সামলে চলার বুদ্ধি। শুকদেব খোঁজ পেয়েছে এমন একটি সংগঠিত গোষ্ঠির যারা সারা দেশ থেকে নানা রকম মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করে চটপট বিক্রির জন্যে; দ্রব্যগুলির মধ্যে রয়েছে সিমেন্ট, লোহা-লক্কড়, ইস্পাত, অ্যালয় স্টীল, কাপড়চোপড়, টিন্‌ড্‌ ফুড, বিদেশী মদ, ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্‌সেস, আরও কতো কি। মালগুলো, শুকদেবের জানতে বাকি নেই, আসে বে-আইনি পথে, কারখানা থেকে চুরি, সাময়িক সাপ্লাই এর 'উদ্বৃত্ত' ওয়াগন-ব্রেকারদের মাল আরও কতো কি। যারা এসব পণ্য দিল্লি শহরে সংগ্রহ করে তাদের গুদাম ক'রে জমিয়ে রাখবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, অতএব চটপট বিক্রয় অপরিহার্য। ক্রেতার অভাব নেই, দিল্লি কনট্রাকটারদের স্বর্ণভূমি, বেশির ভাগ মাল কেনে তারাই, তারপর রয়েছে দোকানদার ও ব্যবসায়ীর দল। পুলিশের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত রয়েছে, কিন্তু সব সময় সেটা সমান নির্ভরযোগ্য নয়, সুতরাং বিক্রির পথ বার করতে হলে চাই সতর্কতার সঙ্গে ত্বরিৎ কর্মক্ষমতা। দুটোই শুকদেবের আছে বলে ওর বিশ্বাস, অতএব ব্যর্থতার সঙ্গত কারণ নেই। কমিশনের হার এত উঁচু যে পাঁচ বছরে ভাল কাজ করতে পারলে ধনী হওয়া অনিবার্য। দলের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে, এবার কাজে নেমে পড়া বাকি। শুকদেব ঠিক করেছে এখনই সে সরকারি কাজে ইস্তফা দেবে না, প্রথম শুরু করবে সকালে এবং ছুটির পরে, ছুটির দিনগুলোতে, একটু অভিজ্ঞতা হলে ছুটি নিয়ে, বিনা বেতনে পাঁচ বছর পর্যন্ত ছুটি সে পেতে পারে নানাবিধ সঙ্গত কারণ দেখিয়ে। এর মধ্যে ব্যবসা জমে উঠলে চাকরি ছাড়তে কতক্ষণ! একমাত্র অসুবিধা এ কাজে নামলে সরলার সঙ্গে কাটাবার সময়ে টান পড়বে, মন তাতে সায় দিতে চায় না, অথচ এ ছাড়া উপায়ও নেই আর। অর্থ রোজগারের পথ নৈতিক অথবা অনৈতিক এ নিয়ে শুকদেব মাথা ঘামায় না, জীবনে সাফল্যের পথ, সে জেনে রেখেছে, সুনীতি দ্বারা শোভিত নয়। সরলাও যে এ নিয়ে মাথা ঘামাবে তা তার মনে হয় নি, বরং, বিশ্বাস জন্মেছে, খানিকটা সার্থকতা অর্জনের পর, সরলাকে সে পাবে তার সহকর্মিণীর ভূমিকায়। আপাতত শুকদেবের লক্ষ্য

বিবাহের আগেই সে সার্থকতায় পৌঁছনো।

'দারুণ খিদে পেয়েছিল, বাড়ি পৌঁছেই শুকদেব খেতে বসল, মা খাবার এনে দিলেন, চাপাটি, ডাল, আচার, একবাটি দই। খাওয়া শেষ ক'রে শুকদেব নিজের ঘরে এসে কাপড় জামা ছেড়ে হালকা হল। বাসাটায় দুখানা ঘর, একখানায় থাকে শুকদেব, অন্যটা দিনের বেলা বসবার ঘর, রাত্রে মা ও ছোটভাইএর শোবার। বারান্দায় জাফরি লাগিয়ে আর একটা ঘব করেছিল বাবা. তখন শুকদেব সেখানে থাকত। এখন সেটা ছোটভাইএর পড়ার ঘর। সে তখনও পড়ছিল, শুকদেব ঢুকল তার ঘরে, এমনি এমনি, বলার ছিল না বিশেষ কিছু। বিমল চোখ তুলে চাইল. শুকদেব একটু হাসল, এবং হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল : 'বিমল, ধরো কারুর কাছে দুটো রাস্তা আছে : বিশুদ্ধ জীবন যাপন ক'রে দরিদ্র থেকে যাওয়া, আর এক-আধটু অশুদ্ধতা উপেক্ষা ক'রে সাহস আর উদ্যোগের পথে ধনী হবার চেষ্টা করা। কোন্ পথ তার বেছে নেওয়া উচিত?' বিমল একটু অবাক হয়ে তাকাল দাদার মুখে, একটু ভাবল, এবং বলল, 'দ্বিতীয় পথ।' শুকদেব তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

দপ্তর ছাড়তে টি. রামাইয়ার সাতটা বেজে গেল। আজ একটু আগে বেরুবার তাড়া ছিল নইলে দপ্তরে সন্ধ্যা কেন, প্রথম রাত্রি কাটাতেও তার আপত্তি নেই। ডেপুটি সেক্রেটারি হবার পর দপ্তর আরও ভালো লাগছে। যদিও প্রমোশনটা সাময়িক, তিন মাস পাঁচ দিনের জন্যে, তথাপি অবসর নেবার আগে ডি. এস. না হ'তে পারলে রামাইয়ার একটু খেদ থেকে যেত। তেত্রিশ বছর আগে যখন সে সেক্রেটারিয়েটে ঢুকেছিল, তখন কেন, এই তো সেদিন, দেশ স্বাধীন হবার আগেও, ডেপুটি সেক্রেটারি ছিল জবরদস্ত রাজপুরুষ, আই-সি-এস, অনেকে খাস সাহেব। কেরানিদের সঙ্গে দূরত্ব ছিল বিরাট। এখন অবশ্যি তা নেই। এখন ঝুড়ি ঝুড়ি ডি-এস ; কাজ অনেক, ক্ষমতা সামান্য। প্রকৃতপক্ষে কুলীন কেরানি। রামাইয়া ডি-এস হবার পরেও বসছে তার পুরানো কামরাতেই, আসবাবের পরিবর্তন হয় নি, বাইরে থেকে বদলায় নি কিছুই, ভেতরেও যে বিশেষ কিছু বদলেছে তা নয়, কেবল রামাইয়ার মন-খুশি ভাবটুকু ছাড়া। সমবয়সী আন্ডার সেক্রেটারিরা মুখে যাই বলুক মনে তাকে নিশ্চয় ঈর্ষা করছে, তাদের এমন কি সেকশন অফিসারদের ব্যবহারেও, রামাইয়া কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করে নি। জে. এস.-রা নতুন, সাময়িক প্রমোশন পাওয়া ডি. এস-দের আন্ডার সেক্রেটারির মতোই দেখে থাকে। রামাইয়ার অবশ্য

তাতে দুঃখ নেই। সে জানে, জীবনে ভগবান তাকে দিয়েছেন অনেক। ম্যাট্রিক পাস ক'রে যখন দিল্লি এসে কেরানির কাজ পেয়েছিল তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল একদিন ডেপুটি সেক্রেটারি হবে? রামাইয়া জানে এ মন্ত্রণালয়ে তার কদর আছে। সে এ মন্ত্রণালয়ের জন্ম থেকে কাজ করছে, সে এর জীবন্ত ইতিহাস। আই-এ-এস অফিসাররা জে-এস হয়ে আসে, যায় ; মন্ত্রণালয়ে এত বেশি পলিটিক্‌স্ ঢুকেছে যে তাদের কাজ করবার না আছে সময়, না তেমন গরজ। পুরান 'কেস' তো তাদের জানাই নেই! এই যেমন আজ। দীপংকর দয়াল ডেকে পাঠাল রামাইয়াকে সওয়া পাঁচটায়। রাজস্থানের গঙ্গাসাগর প্রজেক্টের জন্যে মেশিনারি আমদানি নিয়ে বহির্বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মতবিরোধ জটিল ও কঠিন হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা কেবিনেটে যাবে আগামী সপ্তাহে। পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের 'কেস' তৈরি করতে কতকগুলি শক্ত নজির চাই, আর তার জন্যে চাই টি. রামাইয়াকে। সে-সব নজিরের পুরাতন ফাইল খুঁজে পেতে বার ক'রে নোট তৈরি করতে দিন তিনেক তো লাগবেই। খোঁজাখুঁজি ক'রে ফাইলগুলো উদ্ধার করতেই আজ সাতটা বেজে গেল।

টি. রামাইয়াব গাড়ি নেই। কেরানি থেকে ডেপুটি সেক্রেটারি হয়েছে, বটে, কিন্তু বিলাস-ব্যসনের প্রশ্রয় দেয় নি। বাসের জন্যে লাইন দিয়ে অথবা পায়ে হেঁটে দপ্তরে আসা-যাওয়া পুরাতন অভ্যাস, তার ব্যতিক্রমের প্রয়োজন অনুভব করে নি টি রামাইয়া। ছেলেদের-বেলা অবশ্য অন্য কথা। বড় ছেলে নাগরাজ মহীশূর থেকে এনজিনীয়রিং পাস ক'রে বিদেশে যাবার বায়না তুলেছিল, রামাইয়া তাকে ভাকরা ড্যামে চাকরি পাইয়ে দিয়েছে, থাকে সে নাঙ্গলে, ভালোই করছে, সুন্দর বাংলো বাড়ি পেয়েছে, গাড়ি কিনেছে, নতুন হিন্দুস্থান অ্যামবাসাডর। দ্বিতীয় ছেলে ডাক্তার, তারও চাকরি হয়ে গেছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে, সে-ও গাড়ি কিনেছে। তৃতীয় সন্তান রামাইয়ার একমাত্র কন্যা সরস্বতী, তার বিয়ে হয়েছে বাঙ্গালোরে একটি এনজিনীয়ব ছেলের সঙ্গে, যার বর্তমান চাকরিতেও রামাইয়ার একটু হাত ছিল। পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘদিন কাজ করার এগুলো সামান্য পুরস্কার। এর বেশি রামাইয়া চায় নি, দরকারও হয় নি। কালীবাড়ির কাছাকাছি হ্যাভলক স্কোয়ারে বাসা পেয়েছিল সেকশন অফিসর থাকাকালীন, সে বাসা ছেড়ে রামাইয়া অন্যত্র যেতে রাজি হয় নি. পাড়াটা ভালো, বাজার, স্কুল সব কাছে, দরকার হ'লে হেঁটেই আপিসে যাওয়া কিংবা বাড়ি ফেরা যায়।

খানিকটা মুশকিল হয়েছে ছোটছেলে শংকরণকে নিয়ে, তার হাবভাব চালচলন সব আলাদা। দুর্বলতার মুহূর্তে রামাইয়া তাকে সাউথ ইন্ডিয়ান স্কুলে না পাঠিয়ে ভর্তি করেছিল সেন্ট কলম্বাতে, এখন বি. এ. পড়ছে সেন্ট স্টিফেনসে, পড়ছে নামমাত্র

সারাদিন কোথায় কি ক'রে বেড়ায় ঈশ্বর জানেন, পাইপের মত সরু প্যান্ট পরে, মাথায় একরাশি চুল, প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট খায়, মদও এক-একদিন খায়, টের পাওয়া গেছে। অন্য ছেলেদের যে কড়া শাসনে রাখতে পেরেছিল, শংকরণকে তা পারেনি রামাইয়া, একে তো বেশি বয়সের শেষ সন্তান, আদর-প্রশ্রয় একটু বেশিই পেয়েছে, তারপর বদলি দিনকালের হাওয়া! একবছর চাকরি আছে আর, অবসর নেবার পরে কাউকে ধ'রে কিছু করা যাবে না, অথচ তার আগেই যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে যাবে সে সম্ভাবনাও নেই। টেকনিক্যাল লাইনে তো গেল না, এখন একমাত্র ভরসা আই-এ-এস, অথবা কোনও প্রাইভেট কোম্পানিতে ভালো একটা চাকরি : প্রথমটার আশা রামাইয়া রাখে না, আই-এ-এস পাস করতে হলে যা পরিশ্রম দরকার শংকরণ তা করবে না ; দ্বিতীয়টা সম্ভব, যদি রামাইয়া রিটায়ার করার পরেও অন্তত বছর দু-এক কোনও একটা বড় প্রজেক্টে কাজ পেয়ে যায়। এমন অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে প্রজেক্টগুলি যাদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকার মাল কেনে, তাদের একটা না একটা শংকরণকে নিয়ে নেবেই, ছোকরার অন্য গুণ না থাক, কথাবার্তায় চৌখস, চালচলনে দারুণ স্মার্ট. চেহারাটাও মন্দ নয়, প্রাইভেট সেক্টরে করবে ভালোই।

দপ্তর থেকে বেরিয়ে রেলভবনের সামনে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে রামাইয়া ছেলেটার কথা ভাবছিল, অর্থাৎ তার নিজের কথা। তেত্রিশ বছর নোকরি করেছে, আরও তিনবছর করবার শক্তি ও বয়স তার আছে। আটান্ন বছর কি একটা বয়স নাকি? রিটায়ার ক'রে অলস জীবন চালিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর রোজ সকালে সাড়ে ন'টায় দপ্তরে এসে সাতটার আগে ঘরে ফেরে নি রামাইয়া, অবসর নিয়ে দিনপাত করবে কি ক'রে? অবসরের পরেও একটা যুৎসই কাজের ব্যবস্থা হয়ে যেত এতদিনে, যদি-না এ পোড়ার মন্ত্রণালয়ে তিন তিন বছর মন্ত্রী ও সেক্রেটারির মধ্যে শীতল যুদ্ধ না চলত। শীতল যুদ্ধের ফলে জে. এস.-রা সব দলাদলিতে ডুবে রয়েছে, কে যে কখন কি চাল খেলছে বোঝবার উপায় নেই। এতে সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে ডি-এস আর ইউ-এস'দের, তারা কে যে কখন কার হয়ে কি পলিটিকস্ করছে তার হদিশ রাখা রামাইয়ার পক্ষেও দুষ্কর। কয়েক মাস আগে আর. ই. প্রজেক্টের জন্যে একজন চিফ্ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পদ মঞ্জুর হয়েছিল, রামাইয়া দীপংকর দয়ালকে ধরেছিল চাকরিটা পেতে, যদি পেত তাহলে ষাট বছর তক কাজ করার অসুবিধে হত না। দীপংকর দয়াল সেক্রেটারিকে বলেওছিল। একদিন একটা মিটিংএর পর বনমালীশংকর ঝা রামাইয়াকে অপেক্ষা করতে বললেন। সকলে নিষ্ক্রান্ত হলে ঝা বললেন, 'তুমি নাকি এখান থেকে স'রে পড়তে চাইছ?'

'তা নয় স্যর,' রামাইয়া উত্তর দিল, 'এ মন্ত্রণালয় আমার দেহের প্রাণ, ধমনীর রক্ত। তবে কিনা, বছর খানেক পরে রিটায়ার করার কথা, অথচ আরও বছর দুই তিন চাকরি না থাকলে বড় অসুবিধা।'

'কি অসুবিধা?'

'ছোটছেলেটা এখনও পড়ছে।'

'ক' ছেলে তোমার?'

'তিন।'

'মেয়ে?'

'একটি।'

'অন্য দুই ছেলে কি করছে?' জবাব শুনে, 'ওরা তো ভালোই করছে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জামাই কি করে?'

জবাব শুনে বনমালী হেসে উঠলেন, 'তোমার দু ছেলে ও জামাই তিনজনই দেখছি পূর্ত ও বিদ্যুৎ থেকে লাভবান হয়েছে। আশা করি তাদের চাকরি স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে, তোমার তদ্বিরে নয়।'

'আমার আর কি ক্ষমতা আছে, স্যর? সামান্য আন্ডার সেক্রেটারি! বত্রিশ বছর দেশের সেবা করছি।'

'ও তো আমরা সবাই করে থাকি। কেউ নিজের সেবা করি নে। কেবল দেশের সেবা করি। একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, তুমি, তোমার দুই ছেলে, তিনজন মিলে ছোটছেলেকে মানুষ করতে পারবে না কেন?' এ জন্যে তোমার অবসর নেবার পরও চাকরি কেন করতে হবে?'

'ছেলেদের ওপর আজকাল ভরসা করতে নেই, স্যর।'

'উচিতও না। কিন্তু ছেলেরা যখন তোমার সাহায্যে চাকরি পেয়েছে, তাদের কিছু দায়িত্ব তো থাকার কথা। যাই হোক, আমার মনে হয় না তোমাকে আমি এ কাজটার জন্যে সুপারিশ করতে পারি। আমরা যদি রিটায়ার করতে না চাই, নতুন লোকেরা চাকরি পাবে কি ক'রে? দেখছ না, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পর থেকে অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ছে। চাকরির সংখ্যা কমে যাচ্ছে মাসের পর মাস। অন্ প্রিনসিপ্‌ল্ আমি রিটায়ার্ড লোকেদের আরও দু'তিন বছর চাকরি পাইয়ে দেবার বিরুদ্ধে। তবে, হ্যাঁ, তুমি অত্যন্ত কাজের লোক, তোমার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আমি জানি ; অবসরের পরেও কয়েক মাস যাতে ওখানেই কাজ করতে পার তার ব্যবস্থা হ'তে পারে।

দয়ালকে তাই বলে দিয়েছি। তুমি এখন আসতে পার।'

বনমালীশংকর ঝার কথাগুলি স্মরণ হ'তে রামাইয়ার মন তিক্ত হয়ে উঠল। কোন আই-সি-এস অবসর নিয়ে বানপ্রস্থ করছে, বলতে পারো, সে নীরবে প্রশ্ন করল পাশের লোকটিকে, তারপর লাইনের সবাইকে। একজনেরও নাম করতে পারো? কেউ হয়েছে গভর্নর, কেউ অ্যামবাসাডার, কেউ-বা পার্লামেন্টের সভ্য। তা নইলে বড় বড় কোম্পানির ডিরেক্টর, নয়তো ইউনাইটেড নেশন্স-এ চাকরি! নীতিকথা কেবল ছাপোষা দুর্বলের জন্যে। এমন কোনও সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারির নাম করতে পারো যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, চাকরি প্রমোশন ব্যাপারে নিজের ক্ষমতার একটুও ব্যবহার করে নি! আরে. তোমাদের তো সরাসরি বলতেও হয় না, কাগজে কলমে তো তোমরা একদম সাফ্, সাদা। ওরাই যেচে এসে তোমাদের ছেলেদের বড় বড় চাকরি করে দেয়, নামমাত্র পরীক্ষা আর ইন্টারভিউর তামাসা সাজিয়ে। তোমাদের ছেলেরা কত সহজে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপ পেয়ে যায়! নীতির দাপট কেবল দুর্বলের বেলা, যে বেচারির ক্ষমতা নেই, তার ভগবান নেই। আমিও দেখব, বেঁচে থাকবই দেখতে, বনমালীশংকর ঝা অবসর নিয়ে গ্রামে গিয়ে চাষ করেন, না কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হন, না কোনও বড় কোম্পানির ডিরেক্টর, না স্বতন্ত্র পার্টির নেতা হয়ে পার্লামেন্টের মেম্বর।

বাস এসে গেল। রামাইয়া বসার জায়গা পেল না। দাঁড়িয়ে থাকতে হল যতক্ষণ না বাস পৌঁছল লোদি কলোনিতে। এখানে এস. গণপতির বাসায় আজ একটা অনুষ্ঠান, যে সংঘের সহ-সভাপতি টি. রামাইয়া। অনুষ্ঠানের উপলক্ষ যদিও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে মহিশূর-আগত অধ্যাপক ভোলাগিরি শাস্ত্রীর বক্তৃতা, দ্বিতীয় বেসরকারি উদ্দেশ্য, রামাইয়ার পদোন্নতিতে সংঘের অভিনন্দন। রামাইয়া নিজে শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত, যদিও এখনও শিষ্য নয়, তার একমাত্র কারণ তার স্ত্রীর গুরুদেব 'মাদার'কে বিশেষ পছন্দ করেন না এবং রামাইয়া নিজেও 'মাদারে'র পূর্ণ শাসনে বাকি জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক নয়। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে তাই সে আজ পর্যন্ত যায় নি, যদিও দিল্লিতে শ্রীঅরবিন্দ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে সচরাচর তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গণপতির ফ্ল্যাটের কাছাকাছি আসতে রামাইয়া বুঝল নিমন্ত্রিত প্রায় সবাই এসে গেছে, কয়েকখানা গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, ফ্ল্যাটে সমবেত মানুষের কণ্ঠস্বর রাস্তা থেকে শোনা যাচ্ছে। রামাইয়া উপস্থিত হতে একটা কলরব উঠল, অনেক মানুষের একত্র স্বাগতধ্বনি। কর্ণাটকী ভাষায় কয়েকজন যা বলে উঠল তার বাংলা অর্থ হল : যার জন্যে সব কিছু, সে এল সবার পিছু। রামাইয়া হাসিমুখে সবাইকে নমস্কার ক'রে দেরি হবার জন্যে মাপ চাইল ; বলল, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, জে. এস. ডেকে

পাঠাল পাঁচটার পর জটিল, জরুরি কেস, নজির বার করতে হল পুরনো ফাইলের বস্তা ঘেঁটে। কিছুক্ষণ জটলার পর সবাই অনুষ্ঠানের জন্যে ঠিক হয়ে বসল, মহীশূরের অধ্যাপক আগে থেকেই এসে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে রামাইয়ার পরিচয়ও ছিল আগে থেকেই, এবার দুজনে পাশাপাশি বসে সংক্ষিপ্ত ভাষণ শুনল, যার মর্মার্থ হল : আমাদের সহ-সভাপতি শ্রী টি. রামাইয়া ডেপুটি সেক্রেটারি হয়েছেন, তাঁর এই পদোন্নতি, যা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল, আমাদের অত্যন্ত আনন্দিত করেছে, কেননা তিনি এ সঙেঘর অন্যতম নেতা ও অক্লান্ত সেবক ; টি. রামাইয়াকে স্বাগত করবার দিনে অধ্যাপক ভোলাগিরি শাস্ত্রীর শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ক আলোচনাই উপযুক্ত অনুষ্ঠান, কারণ টি. রামাইয়া, আমরা সকলে জানি, শ্রীঅরবিন্দের অকৃত্রিম ভক্ত। অতএব সভার কাজ শুরু হোক। অধ্যাপক শাস্ত্রী তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন, লোকটি দেখতে যেমন খর্বকায়, গলাব স্বর তেমন মিহি ও মেয়েলি, মাথায় চুল নেই বললেই হয়, অথচ ভ্রূতে, কানে, এমনকি নাকের মধ্যেও চুলের প্রাচুর্য। তিনি বলে চললেন মিহি মেয়েলি গলায় শ্রীঅরবিন্দের সাধক-জীবনের কাহিনী, কেউ শুনল, অনেকে শুনল না, কানে কানে ঘুস-ঘুস কথাবার্তা শুরু হল, এবং চলল, বেশির ভাগই দপ্তরের কথা, ডি. এস কত কড়া অথবা কত অপদার্থ, কোন জে. এস-এর কি কুস্বভাব, কে কোন অসৎ উপায়ে প্রমোশন পেল, বিদেশে গেল, কিংবা ছেলের চাকরি করে দিল, অথবা মেয়ের বিবাহে কম-দামে মূল্যবান কি কি জিনিস সংগ্রহ করল, এমনি সব কথাবার্তা, দিল্লীর মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের নির্জীব খোরাক। অধ্যাপক সব কিছু অগ্রাহ্য ক'রে এগিয়ে চললেন, এবং মিহি মেয়েলি গলায় 'দৃঢ় বিশ্বাসের' সঙ্গে ঘোষণা করলেন ভারতবর্ষ যে শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে স্বাধীনতা পেয়েছে তার জন্যে দায়ী তাঁর সাধনা, তাঁর হিমালয়তুল্য অভিজ্ঞান। বক্তৃতা শেষ হ'তে করতালি পড়ল, সে করতালিতে চমকে জেগে উঠে রামাইয়া টের পেলে কখন যেন সে ব'সে ব'সেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

লোদি কলোনি থেকে বাসে ফিরতে হল না হ্যাভলক স্কোয়ারে, মার্কেট রোডের এস. চিদাম্বরম গাড়িতে পৌঁছে দিল। বাসায় যখন পৌঁছল রামাইয়া রাত তখন আটটা সাতান্ন, দ্বার খুলে দিল, যে সচরাচর খুলে দেয়, শংকরণের জননী, নাম তার লক্ষ্মী, যে নামে রামাইয়া কখনও তাকে ডাকে নি, স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাকায় আধুনিকতা তার জীবনে অঘটিত থেকে গেছে। ঘরে ঢুকে রামাইয়া সর্বাগ্রে গলাবন্ধ খুলল, মুখে উচ্চারিত হল : গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, গোবিন্দম্, তারপর খুলল প্যান্ট, পরল দক্ষিণী ধুতি, স্ত্রী কোট-প্যান্ট তুলে নিয়ে ভাঁজ ক'রে রেখে দিল পরের দিন ব্যবহারের জন্যে। রামাইয়া প্রশ্ন করল, চিঠিপত্র কিছু এসেছে? রান্নাঘর থেকে জবাব এল,

শোবার ঘরে টেবিলের ওপর দেখ।'

দেখল বেশ ক'টি চিঠি একসঙ্গে রাখা। বাঙ্গালোর থেকে চিঠি এসেছে উকিলের, রামাইয়ার নির্দেশ মত নতুন কেনা আঠার বিঘা চাষের জমি রেজেস্ট্রি হয়ে গেছে; নাঙ্গল থেকে পত্র লিখেছে বড় ছেলে, তাকে হয়তো এবছর য়ুরোপ যেতে হবে, যদি হয়, মা নাঙ্গলে গিয়ে মাস দুই থাকতে পারবে কি না, তিনটে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে তার বৌ একা পেরে উঠবে না। দুটো চিঠি এসেছে এক আন্তর্জাতিক প্রকাশনা থেকে, বছর আটেক আগে রামাইয়া মেয়ের ছেলেকে এদের প্রকাশিত একসেট বই কিনে দিয়েছিল, থেকে সেই নিয়মিত বছরে পঁচিশ ত্রিশখানা চিঠি ওরা পাঠায়, একখানাও আর রামাইয়া পড়ে দেখে না। এসেছে বিজলি ও জলের বিল, রামাইয়া সেটা খুঁটিয়ে দেখল, গত মাসের বিল আলমারি থেকে বার ক'রে মিলিয়ে নিল মিটার-পড়া ; বিলেব যোগগুলি পেন্সিল দিয়ে চেক করল, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, জলের বিল এমাসে তিরাশি পয়সা বেশি এসেছে, একটু সামলে তোমবা কিছুতেই চলবে না।

টেবিলে খাবার তৈবি, তখনও শংকবণের দেখা নেই। কলেজে গেছে সেই সকাল আটটায়, দেরি হবে বলে যায় নি, টেলিফোনও কবে নি। রামাইয়াব মেজাজ ভীষণ খারাপ হযে গেল। স্ত্রীকে দোষারোপ ক'রে অনেকক্ষণ গনগন করল, ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে নষ্ট করাব দায়িত্ব একমাত্র রামাইয়ার স্ত্রীর, এবং তাব একমাত্র কারণ সে শিক্ষা পায় নি, স্কুল-কলেজে পড়ে নি। বামাইয়ার স্ত্রী এসব অভিযোগের প্রতিবাদ করে না, মুখখানাকে দারুণ বেজার ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকে। একান্ন বছরে তার চুল অর্ধেক পেকে গেছে, দেহ থলথল, মুখে অনেকগুলি উল্টো-পাল্টা ভাঁজ, এমনিতেই তাকে বিষণ্ণ দেখায় যদিও বিষাদের কাবণ বিশেষ ঘটে নি, বামাইয়া স্বামীর কর্তব্য পালনে ত্রুটি করে নি, তার স্ত্রীর মুখের স্বাভাবিক বিষণ্ণতা নিযে মাথাও ঘামায় নি। বুড়োবয়সে ছেলেটা জ্বালাচ্ছে, শেষকালে কপালে এই ছিল, স্বামী বেচারার জন্যে লক্ষ্মী রামাইয়ার কষ্ট হয়, তাকে বকে যদি লোকটা একটু মন-হালকা হয় তো হোক না। এক সময় সে বলে ওঠে, ছেলে কখন ফিরবে তার ঠিক নেই, বিপদ-আপদ হ'লে টেলিফোন কবত, কোথাও গিয়ে আড্ডা জমিয়েছে, রামাইয়া খেয়ে নিলে ভালো হয়, রাত অনেক হ'ল, এর পবে খেলে শরীর খাবাপ হ'তে পারে। কথাগুলির যুক্তি রামাইয়া স্বীকার করতে বাধ্য হল, তাছাড়া খিদেও পেয়েছে, এবং কাল সকালে সুস্থ শরীবে দপ্তর যেতে হবে, অতএব সে খেতে বসল, ভাত, সম্বার, তরকারি, রসম ও পায়সম, খাওয়ার শেষে স্ত্রীকে বলল খেয়ে নিতে, অমন বখা ছেলের জন্যে না অপেক্ষা করা অনুচিত, প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্মীর মুখ আরও

বিষণ্ণ হল, মুখের ভাঁজে ভাঁজে বিষাদ জমে উঠল।

খাওয়া শেষ ক'রে রামাইয়া রেডিয়ো খলল, প্রথম ধরল দিল্লি, হিন্দুস্থানী খেয়াল শুনে, ধরল মাদ্রাজ, শুনল কর্ণাটকী সঙ্গীত মিনিট দশেক। এমন সময় দরজায় শব্দ হল, দ্রুত পায়ে এগিয়ে দরজা খুলল রামাইয়া, দেখতে পেল শংকরণ দাঁড়িয়ে। বাবাকে দেখে সে একটু ঘাবড়ে গেল প্রথম, হয়তো ভয় পেল বাবা বুঝি মারবে, তারপর মুখে হাত দিয়ে বেগে ঘরে ঢুকে একেবারে নিজের ঘরে চলে গেল। তবু রামাইয়া গন্ধ পেল। মেজাজ গেল ভয়ানক খারাপ হয়ে, কুড়ি বছর বয়স হয়নি এখনই ছেলেটা মদ ধরেছে, ঢুকল গিয়ে ছেলের ঘরে, সে তখন বিছানায় ব'সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। মাথায় আগুন ধ'রে গেল রামাইয়ার, এগিয়ে এসে ছেলের গালে বিরাট চড় বসিয়ে দিল, চীৎকার ক'রে বলল, 'তুমি এই বয়সে মদ ধরেছ, বাপের পয়সার মদ খেতে শিখেছ?' ছেলেটা হকচকিয়ে গেল চড় খেয়ে, কিন্তু চেয়ে রইল সেই ফ্যাল ফ্যাল চোখে। রামাইয়া আবার মারল তাকে, আবার এবং আবার, মার আর গালাগাল শুনে স্ত্রী ছুটে এল। বাধা দিতে সাহস করল না, কাঁদো-কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে রইল। রামাইয়া ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, শংকরণ ব'সে রইল তেমনি ভাবে, মা তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে।

বিছানায় শুয়ে পড়ল রামাইয়া। এ বয়সে এত বেশি উত্তেজনা ভালো নয়। মাথা ঝিম-ঝিম করছে, বুকে একটা ব্যথা বোধ হচ্ছে। চুপ ক'রে শুয়ে রইল রামাইয়া। আমি যা করবার করেছি, আমার আর কিছু করবার শক্তি নেই, আমার দম শেষ হয়ে আসছে। দুটো ছেলে একটা মেয়েকে মানুষ করতে কষ্ট হয় নি, আর এই শেষের ছেলেটা আমাকে পরাস্ত ক'রে দিচ্ছে। ওর মুখের হাবভাব, কথাবার্তা, চালচলন আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি নে। ও ভাবে আমি অশিক্ষিত, কেবল ম্যাট্রিক পাস, আমাকে ও তুচ্ছ করে, আমি কেরানিই থেকে তেত্রিশ বছর জুতার সোল ক্ষয় ক'রে কোনও মতে ডেপুটি সেক্রেটারি হয়েছি! আরে, আমার সাহায্য না পেলে তুই তো কেরানিও হতে পারবি নে। আজ যদি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই, তোর জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। তখন মদের পয়সা আসবে কোথা থেকে, আর বন্ধুরাই কি পাত্তা দেবে? বন্ধুদের কথা উঠতে তেতো হয়ে গেল রামাইয়ার মন। একদল ছেলেমেয়ে, বাপেরা কালোবাজারের পয়সায় হঠাৎ-ধনী, নিজেরা একেবারে বখা, আমার ছেলেটার ভবিষ্যৎ চিবিয়ে খাচ্ছে। এরা কারা রামাইয়ার অজানা নেই এদের বাপেরা হয় ব্যবসায়ী, নয় বিদেশী কেম্পানির বড় অফিসর, নয় জয়েন্ট সেক্রেটারি, সেক্রেটারি। মজার ব্যাপার হল এদের অনেকেই স্ফূর্তি করে, মদ খায়, আবার পড়াশোনাও করে, পরীক্ষায় ভালো ফল নিয়ে আই-এ-এস হয় অথবা বড় কোম্পানির কভেনেন্টেড্

অফিসর। কপাল পোড়ে আমাদের মত ছাপোষা ভদ্রঘরের ছেলেগুলির, তাদের পা একবার পিছলোলে আর উঠে দাঁড়াতে পারে না। অথচ দাঁড়াতে না পারলে তো তোব চলবে না রে শংকরণ! একবার রামাইয়া ভাবল ছেলেটার বিয়ে দিয়ে দি, সুন্দরী বৌ পেলে হয়তো কুপথে পা বাড়াবে না। বৌ নিয়ে বাড়িতেই থাকবে, আমাদেরও ভালো লাগবে। পরক্ষণে মনে হল, পড়াশোনা তো তাহলে একেবারে যাবে, বি. এ-টাও পাস করতে পারবে না, কেরানির চাকরিও জুটবে না কপালে। বি. এ. পাসের আগে বিয়ের কথা ভাবা যায় না। তা ছাড়া, এসব বদ অভ্যাসের সঙ্গে কোনও মেয়ে জড়িত আছে কি না তাই বা কে জানে? নতুন একটা নির্দোষ মেয়েকে ঘরে এনে রামাইয়া কি তার সর্বনাশ করবে? এসব ভাবতে ভাবতে রাত বাড়ল, চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। হঠাৎ মনে হল লক্ষ্মী বোধহয় না খেয়ে বসে আছে বিষণ্ণ মুখে রান্নাঘরেই। বিছানা থেকে উঠে রামাইয়া বসবার ঘর, রান্নাঘর দেখল, তারপর ঢুকল আবার শংকরণের ঘরে। দেখতে পেল ঘুমন্ত ছেলের মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে লক্ষ্মী, মুখখানা তাব বিষণ্ণ হলেও কেমন যেন কোমল। মেঝের ওপর বমি, দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ঘরে, লক্ষ্মীর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

রামাইয়া নিশ্বাস চেপে এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে গেল। স্ত্রীর পাশে বসে ছেলের বেহুঁশ ঘুমন্ত মাথা নিজের কোলে রাখল। লক্ষ্মীকে বলল, 'তুমি এগুলো সাফ ক'রে ফেল। দুর্গন্ধে বাড়িতে টেকা যাচ্ছে না।'

সেক্রেটারির ঘরে বিকেলের মিটিংটা শেষ হ'তে ছ'টা বাজল অন্য কোনও জরুরি কাজ না থাকলে বনমালীশংকর ঝা পাঁচটার সময় অ্যাডিশনাল এবং জয়েন্ট সেক্রেটারিদের সঙ্গে একত্র হয়ে সারাদিনের কাজকর্মের আলোচনা করেন, পরের দিনের প্রয়োজনীয় কাজগুলো তাতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আজ মিটিং বসল একটু দেরিতে, শেষ হ'তে হ'তে বাজল ছ'টা অথচ, নিরাময় রায় ভাবল, কাজ হল না তেমন কিছুই। মন্ত্রী বিদায় নিচ্ছেন, নতুন মন্ত্রী না আসা পর্যন্ত চলবে অনেকটা অনিশ্চিত অবস্থা, চলতি কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া নতুন কিছু হবার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া, নিরাময় রায় জানে, উপস্থিত তাদের সবার মনেই প্রধান প্রশ্ন : এখানে অথবা দিল্লিতে থাকা সম্ভব হবে তো? ঝা'র অবশ্য দুশ্চিন্তার কারণ নেই, এই মন্ত্রণালয় থেকে বড়জোর তাঁকে অন্য মন্ত্রণালয়ে যেতে হবে, যার জন্যে তিনি কিছুদিন থেকেই তৈরি। যে সেক্রেটারির সঙ্গে এক মন্ত্রীর খট-খট সম্পর্ক তাঁকে অন্য মন্ত্রীরা সহজে নিতে চান না, তা না হ'লে, নিরাময় রায়ের ধারণা, ঝা অনেক

আগেই বদলি হয়ে যেতেন। নিরাময় রায়ের নিজেরও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সে বিহার ক্যাডারের আই-সি-এস, বিহার সরকার তাকে ফিরিয়ে নিতে মোটেই উৎসাহী নয়, তার কারণ শুধু এই নয় যে সে বাঙালি, এ-ও, যে বিহার সরকার আই-সি-এস অফিসরদের সরিয়ে দিতে পারলেই খুশি। অতএব, নিরাময় রায়কে সম্ভবত এই মন্ত্রণালয়েই আরও কিছুদিন থাকতে হবে, মন্ত্রী হয়ে যেই আসুক না কেন, যতদিন তার সেক্রেটারি হবার সুযোগ ও সময় না আসে। মন্ত্রীরা সাধারণত অ্যাডিশনাল সেক্রেটারিকে নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি সব মন্ত্রণালয়ে নেই। যে দু-চারজন আই-সি-এস কেন্দ্রে এসে গেছে অথচ সেক্রেটারি হবার মত সিনিওরিটি নেই তাদের জন্যে মাত্র কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে এ পদের সৃষ্টি। এটা হল, অনেকটা, ওয়েটিং রুম, আই-সি-এসদের জন্যে নিরাময় রায়ের পক্ষে মোটেই অপছন্দের নয়।

ছ'টা তিন মিনিটে নিজের আপিসে ফিরে আসতেই টেলিফোন বাজল। নিরাময় রায় টেলিফোন ধরতে, শিখার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'তুমি এখনও আপিস করছ?'

'আর বোলো না। এই মাত্র মিটিং শেষ হল। এক্ষুনি বেরুচ্ছি।'

'আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনবার ফোন করেছি।'

'এর পরের বার মিঃ ঝাকে ফোন ক'রে বোলো আমার স্বামীকে পাঁচটা চল্লিশের মধ্যে ছেড়ে দেবেন, নইলে'—

'মিঃ ঝাকে বলতে যাবো কেন? উনি তোমার মনিব হ'তে পারেন, আমার নন।'

'আমার মনিব যে তাকে আমি চিনি, এবং বনমালীশংকর ঝা তাকে খুব পছন্দ করেন।'

'অসভ্য। তোমার মুখে কিছুই আটকায় না। চলে এস এবার।'

'বললাম তো, এক্ষুনি আসছি।'

'মনে আছে তো? আসবার সময় এম্পায়ার স্টোরস্ হয়ে এসো।'

'আসব।'

'এক গাদা খরচ ক'রে ফেলো না আবার। তোমাকে দোকানে পাঠিয়ে আমার শান্তি নেই।'

'যা দাম চাইবে তার চেয়ে এক পয়সাও বেশি দেব না।'

রাত্রিতে বাড়িতে ডিনার আছে। শিখা একসঙ্গে চারজনের বেশি লোক খাওয়াতে রাজি নয়। খাবার টেবিলে ছ'জনের ব্যবস্থা, তার বেশি হলে শিখা অখুশি হয়। বুফে ডিনার তার না-পছন্দ, ওতে খাওয়ার চার্ম নষ্ট, ডিনার মানে আহার এবং সংলাপ, বুফেতে তা হ'তে পারে না। মাসে তিন দিন শিখা ডিনার দেয়, তিন-চারদিন ওদের

ডিনারে নিমন্ত্রণ থাকে। আজকের নিমন্ত্রিত পরিবার দু'টি, সুজয় মুখার্জি আই-সি-এস ও তার স্ত্রী গীতা, এবং অনন্ত সিং গীল আই-এ-এস ও তার পত্নী তারা। সুজয় মুখার্জি নিরাময়ের সহপাঠী ও সতীর্থ, এখন চিত্তরঞ্জনে লোকোমোটিভ কারখানার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ; গীল ছিল রাজস্থানের চিফ সেক্রেটারি। সম্প্রতি দিল্লি এসেছে হোম মিনিস্ট্রিতে জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়ে। নিরাময় রায়ের সঙ্গে মিটিংএ প্রায়ই দেখা হয়, তাকে নেমন্তন্ন করবার কারণ শিখা জানতে চাইলে, নিরাময় রায় জবাব দিয়েছিল, 'গীল লোকটা ভালো, খুব বুদ্ধিমান ও চতুর, মোটেই গিলগিলে নয়। হোম মিনিস্ট্রিতে এক আধজধন বন্ধু থাকলে অনেক সুবিধে। আমার কেউ নেই বিশেষ জানা চেনা।'

ডিনারের আগে অ্যাপিটাইজারের অর্ডার ফোনে দিয়ে রেখেছে শিখা, এম্পায়ার স্টোরসে, নিরাময়কে যাবার সময় তুলে নিতে হবে।

এম্পায়র স্টোরসে সময় লাগল না। মথুরা রোডে নিরাময় রায়ের বাংলো, কনট প্লেস অর্ধেক প্রদক্ষিণ ক'রে বারখাম্বা রোড ধরে বেরিয়ে পড়বে এমন সময় মাথায় ক আইডিয়া এল, গাড়ি ঘুরিয়ে নিরাময় চলল জনপথে। কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এমপোরিয়মে গাড়ি দাঁড় করিয়ে 'কণিকা'য় ঢুকে এক ডজন লাল টুকটুক আধফোটা গোলাপ কিনল। তারপর জনপথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ফিরোজশা' রোড ধরে বাড়ি পৌঁছল।

গাড়ি থেকে নামবার আগেই শিখা উপস্থিত। ডিনারের প্রস্তুতিতে সে এই প্রথম হেমন্তেও গা' ধুয়েছে, তার দেহ থেকে বিলিতি সেন্টের সুগন্ধ নিরাময় রায়ের নিশ্বাসে মিশে গেল।

'গোলাপ! গোলাপ কেন?'

'শিখা', নিরাময় রায় গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'পৃথিবীতে এখনও দু'একটা ব্যাপার ঘটে, যার কোনও কারণ নেই', গোলাপের গুচ্ছটি শিখার হাতে দিয়ে, 'তোমাকে, অকারণ।'

তারপর হাত বাড়িয়ে শিখাকে কাছে টেনে চুমু খেল।

'ধন্যবাদ, মহাশয়,' শিখা ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, 'গোলাপ এবং চুম্বনের জন্য ধন্যবাদ।'

'তোমার সব তৈরি?'

'কখন! এবার সসেজগুলো ঠিক ক'রে নেব। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এসো। চা দিতে বলছি।'

'মুখার্জিরা আটটার পর আসবে। গীলদের আসতে সাড়ে আটটা।'

'বেশ তো! তুমি একটু বিশ্রামের সময় পাবে।'

নিরাময় বাথরুমে ঢুকল। শিখা চলে গেল রান্নাঘরে চা'এর ব্যবস্থা করতে। বাবুর্চিকে বলল, 'সসেজ এসে গেছে। চটাপট তৈরি ক'রে ফ্রিজে রেখে দাও। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে।'

শিখা চাকর রাখে না। লাঞ্চ ডিনার থাকলে কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাবুর্চি ভাড়া করে। দৈনন্দিন কাজে সাহায্যের জন্যেও একটি ঠিকা লোক আসে। সকালে তিন ঘণ্টা, সন্ধ্যায় দু ঘণ্টা। বাকি কাজ শিখা নিজের হাতে করে নেয়। রান্নাঘর তার একেবারে আধুনিক। বাবা ইউ-এন-এ'তে কাজ করেন, রোমে তাঁর চাকরি ও নিবাস। শিখাকে তিনি এনে দিয়েছিলেন রান্নার ওভেন, এবং বেন্ডার, মিক্সার, এমনকি শরবৎ তৈরির জন্যে ইলেকট্রিক ফাউনটেন। ঘর সাফ করার জন্যে ভ্যাকুয়ম ক্লীনার। শিখা বাস ক'রে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশের আধুনিকতায়। চাকর রাখা তার কাছে ফিউডাল সংস্কৃতির পরিচায়ক।

বাথরুম থেকে নিরাময় বেরুল ডিনারের জন্যে জামাকাপড় বদলে ; বসবার ঘরে এসে দেখল চা নিয়ে শিখা অপেক্ষা করছে। পাত্রে চা ঢেলে দিয়ে শিখা প্রশ্ন করল, 'তোমাদের মন্ত্রী খুব কাঁদছিলেন তো!'

'আমাদের কাছে নয়।'

'কি বললেন তোমাকে?'

'আমাকে? আমাকে আবার কি বলবেন? আমি তো তাঁর খাসমহলের লোক নই!'

'মন্ত্রীদেব জন্য আমার দুঃখ হয়, জানো। আজ আছে, কাল নেই।'

'আমাদের মন্ত্রীরা কিন্তু খুব স্বল্পায়ু নন। অনেকে তো যুগ যুগ ধ'রে মন্ত্রিত্ব করছেন।'

'কেউ কেউ তো উঠছে, পড়ছে, তাই না?'

'কেউ কেউ। তবে দীর্ঘায়ুদের দিন শেষ হ'তে চলেছে। কংগ্রেসকে একবার নির্বাচনে হারতে দাও, দেখবে মন্ত্রিত্ব নিয়ে কি পুতুলখেলা শুরু হয়।'

'কংগ্রেস হারবে কেন?'

'কোনও দলের রাজত্বই চিরদিন থাকে না। দেখ না, আসচে বছর নির্বাচনে কি হয়।'

'তুমি বলছ কংগ্রেস হারবে?'

'হারতে পারে। কেন্দ্রে না হলেও রাজ্যগুলিতে। অন্তত বিহারে।'

'তোমার তাহলে বিহারে ফিরে গিয়ে কাজ নেই।'

'কে যাচ্ছে বিহারে? বিহারে এখন মাত্র দুজন আই-সি-এস আছে। দুজনই বাঙালী। তাদের পালাতে হবে শিগগির। বিহারের মন্ত্রীরা আর আই-সি-এস চায় না।'

'চাইবে কেন? আই-এ-এসদের দিয়ে যা কিছু করিয়ে নিতে পারে। তোমাদের দিয়ে তো তা হবার জো নেই।'

'আমরাও এমন কিছু ধোওয়া তুলসী নই। কর্তার ইচ্ছায় অনেক কর্ম ক'রে থাকি।'

'সবাই নয়। মিঃ ঝা করেন নি। তুমি করবে না।'

'তুমি, মহাশয়া, বনমালীর প্রতি একটু বেশি সদয়। তোমরা জানো না তাই মানো। আমি জানি তাই মানি নে।'

'কি জানো? শিগগির বলো কি জানো তুমি।'

'স্টেট সিক্রেট। পত্নীকে, এমন কি ঈশ্বরকেও, বলা বারণ।'

'পত্নীকে নয়, ঈশ্বরকে হ'তে পারে।'

'তুমি জানো না, শিখা, স্ত্রীবশ রাজনৈতিক নেতারা পত্নীর কাছে রাষ্ট্রীয় গোপন কথা বেফাঁস ক'রে কি রকম বিপদে পড়েছেন। চার্চিল এজন্যে স্ত্রীর সঙ্গে সরকারি বিষয়ে আলোচনা করতেন না।'

'তাহলে তুমি বলবে না?'

'এখন না। পরে, সময় মত একদিন বলব।'

'যখন সবাই জেনে যাবে তখন আমার জেনে কি লাভ হবে?'

'সবাই জানবার চব্বিশ ঘণ্টার আগেই তুমি জানবে।'

শিখা শান্ত হল। নিরাময়ের চা-পান শেষ হয়েছিল। উঠে সে শোবার ঘরে এসে রেডিওগ্রামে রবীন্দ্র-সংগীত চালিয়ে দিল। বিছানার একটু দূরে একটা সোফা, তাতে ব'সে পড়ল সদ্য-আসা 'টাইম' ম্যাগাজিন খুলে। রেকর্ডে বাজছিল 'এ মণিহার', টাইম ম্যাগাজিনে রিপোর্ট ছিল ওয়াশিংটনে ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবছরই শেষ হয়ে যাবে এই মর্মে প্রেসিডেন্ট জনসনের আশ্বাসবার্তার ; দুটো একসঙ্গে নিরাময়ের মনে একটা প্রশান্ত কুহেলি সৃষ্টি করছিল, সান্ধ্য পানীয়ের তৃষ্ণা একটু একটু করে তীব্র হয়ে উঠছিল। এমন সময় গ্লাসে জীন অ্যান্ড টনিক তৈরি ক'রে শিখা এসে দাঁড়াল সামনে, বলল, 'তোমার নিশ্চয় তেষ্টা পাচ্ছে, এখন আর হুইস্কি খেয়ো না, ওঁরা এলে একসঙ্গে খেয়ো, নইলে বেশি হয়ে যাবে। এখন এটা খাও। আমার একটু অবসর আছে, এখানে বসছি।'

নিরাময় মৃদু প্রতিবাদ করল, 'সন্ধেবেলা জীন অ্যান্ড টনিক? আমি কি স্কুলের

ছাত্র?'

'না। তুমি দিল্লির শার্দূল সিং। এখন হুইস্কি শুরু করলে বেশি হয়ে যাবে।'

'তা হ'তে পারে।' নিরাময় গ্লাসে চুমুক দিল। 'মিলিয়েছ ভালো। তুমি খাচ্চ না?'

'এখন না। আচ্ছা এক চুমুক নিচ্ছি।' নিরাময়ের গ্লাসে আলতো চুমুক দিল শিখা। বলল, 'মন্দ হয় নি তো!'

'আজ ওদের ককটেল সার্ভ করলে পারো।'

'রিস্ক আছে। কার পেটে কতটা সয় না জেনে ককটেল দিতে নেই। তার চেয়ে হুইস্কি নিরাপদ। সবাই জানে, কতটুকু সইবে।'

'মেনু কি আজকের?'

'চিংড়ি কাটলেট, পোলাও, মাংস, সালাড, রায়তা, আইসক্রিম।'

'একসেলেন্ট।'

'আচ্ছা, সুজয় মুখার্জি লোকটা কেমন?'

'মোটাসোটা, মাথায় টাক, পুরু কাচের চশমা, দুটো দাঁত সোনা-বাঁধান।'

'চেহারার কথা কে জানতে চেয়েছে? মানুষটা কেমন?'

'হালকা, হাসিখুশি, হাড়-শয়তান।'

'মিসেস মুখার্জি?'

'সরল-তরল গরল।'

'তুমি কারুর মধ্যে ভালো দেখতে পাও না।'

'তোমার মধ্যে ছাড়া।'

'আমার মধ্যে এমন কিচ্ছু মন্দ নেই যা তোমার চোখে পড়ে না।'

'তার মানে আমি অন্ধ নই।'

'তার মানে তুমি লোক ভালো নও।'

'তোমাকেও তো একেবারে অন্ধ মনে হচ্ছে না।'

শিখা বসেছে মেঝের কার্পেটে, নিরাময়ের গায়ে পিঠ হেলিয়ে। চুলের সুবাস দেহের সুগন্ধের সঙ্গে মিশে নিরাময়ের নিশ্বাসের পথে মাথায় ঢুকছে। নিরাময়ের হাত নেমে এল শিখার কাঁধে, কাঁধ থেকে বুকে।

'ওঁরা এসে যাবেন এখুনি।'

'সুজয় মুখার্জিকে আমি চিনি। বলেছে আটটা, কিন্তু সাড়ে আটটার আগে আসবে না।'

'তাই বলে এখন বডিস খুলো না।'

'দেখে নি আজ তুমি কেমন রয়েছ। বডিস হুক করতে কতক্ষণ?'

শিখার নগ্ন বুকের প্রতিচ্ছবি পড়ল বরাবর দেয়ালের আয়নায়।

'ভেঙে পড়ছে,' বলল শিখা। 'আর কতদিন থাকবে বলো?'

'খুব একটা ভাঙে নি এখনও। সোজা হয়ে বসো তো! এই দেখ, বেশ ভালোই আছে।'

'ধন্যবাদ মশাই। আমি ভালো ক'রেই জানি কতটা আছে, কতটা গেছে। তুমি মানো আর নাই মানো, বুড়ি হচ্চি।'

'কক্ষনো না। আমার চুলে পাক ধরেছে। এই দ্যাখো, এখানটা শাদা হয়ে এসেছে। তুমি যা ছিলে আট বছর আগে, তাই আছ।'

হেসে উঠল শিখা : 'আট বছর আগে যদি আমার শবীর এরকম থাকত তুমি আমাকে বিয়ে করতে না।'

'মানে, তোমার শরীরের জন্যেই তোমাকে বিয়ে করেছিলাম?'

'মানে, শরীর ছাড়া আমার তো আব বিশেষ কিছু ছিল না।'

'আই-সি-এস বাপ ছিল, এফ-এ-ও'তে বড় চাকুরে।'

'রং কালো, দেখ না, আয়নায় মনে হচ্চে কালীমূর্তি। আয়নাটা নিশ্চয় ময়লা হয়ে গেছে। অত কালো আমি নই।'

'কেম্ব্রিজ থেকে বি এ. পাস কবেছিলে।'

'আর কিচ্ছু করবার ছিল না ব'লে।'

'লন্ডনে একথায় সবাই চিনত তোমাকে?'

'খুব একটা সুনাম ছিল না।'

'হুল্লোড়ে ছিলে একটু।'

'একটু না, অনেক। না কবেছি এমন কুকাজ ছিল না।'

'সবচেয়ে কুকাজ করলে আমাকে বিয়ে করে।'

'জীবনে একটা ভালো কাজ কবেছি, মশাই', শিখা বডিস পরল, 'হুক লাগাও। প্রথমটা নয়, দ্বিতীয়টা।' উঠে দাঁড়াবাব সময় নিরাময়কে আলতো চুমু খেল। তোমার আদর খেতে বড ভালো লাগে।'

'এক্ষুনি যেযো না, একটু বসো। একটা কথা আছে।'

শিখা বসল। বলল, 'সময় নেই আর। আটটা পনের।'

'ভাবছি তোমার বাবাকে লিখব।'

'ছেড়ে দেবে?'

'ভালো লাগছে না। সত্যি বলতে কি, আমাদেব প্রয়োজন নেই। আমরা জোব ক'বে নিজেদের প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য ক'রে রেখেছি। আমরা ভাবতবর্ষে

অবান্তর।'

'তুমি ছাড়া আর কোনও আই-সি-এস একথা বলবে?'

'না বললেও কথাটা সত্যি। সত্য এত কঠিন যে আমরা তাকে স্বীকার করতে চাইনে। আমার বাবা আই-সি-এস ছিলেন। তিনি অবান্তর ছিলেন না। ইংরেজের সাম্রাজ্য মজবুত করার জন্যে তাঁর প্রয়োজন ছিল। ইংরেজের সমকক্ষ অফিসর হয়ে তিনি গর্বিত বোধ করতেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে তিনি পূর্ণতা পেয়েছিলেন। আমাদের জীবনে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, অহংকার, মান, যশ, ভোগ, কোনওটার অভাব নেই, বাবাদের চেয়ে আমরা অনেক, অনেক বেশি পেয়েছি, কিন্তু পূর্ণতা পাই নি, পাবার সম্ভাবনা নেই।'

'বেশ তো! তুমি যদি তাই মনে করো, লিখে দাও বাবাকে। কাজ তো তোমার ওখানে হয়েই আছে।'

'শ্বশুরের দেওয়া চাকরি, নিতে মন উঠতে চায় না। কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার যা দেখছি।'

'কি দেখছ?'

'মনে হচ্চে, আমাদের সময় শেষ হযে আসচে। দেশটা যে-পথে চলছে সে পথে আমাদের স্থান নেই। যদি আমরা তথাপি থেকে যাই, দেশের গতিরোধ করা ছাড়া আমাদের করণীয় আর কিছু নেই।'

'তোমার কথা এতো অপরিষ্কার যে কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমার কাছেও অবস্থাটা মোটেই পরিষ্কার নয।'

'কাজ করবে তুমি ; যদি তোমাব এ কাজ ভালো না লাগে, বাবাকে লিখে দাও।'

'তাই দেব। তোমার আপত্তি নেই তো?'

'না। আমার যা প্রব্লেম তুমি ভালোই জান। যদি আমাকে সামলাতে পার, আমি কেন আপত্তি কবব? ইন্টারন্যাশনাল সিভিল সার্ভেন্টের স্ত্রী হ'তে তো আমার ভালই লাগবে।'

দুজনে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। শিখা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ি ঠিক করল নজর পড়ল ব্লাউজের দুটো বোতাম খোলা। বোতাম লাগিয়ে মাথায় মৃদু চিরুনি বুলাল, চটপট সেরে নিল শেষ মুহূর্তের প্রসাধন। কলিং বেলে আওয়াজ হল। শিখা এগিয়ে গেল, নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনার জন্যে। নিরাময় চলল পেছনে।

সুজয় মুখার্জি গীতা মুখার্জি, অনন্ত সিং গীল এবং তারা সিং গীল একসঙ্গে দরজায় দাঁড়িয়ে। শিখা ও নিরাময় দুজনেই অবাক হল। সুজয় মুখার্জি বলল, 'আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখি আর একটা গাড়িও দাঁড়াল বাড়ির সামনে। বুঝলাম

গীলেরাই হবেন। একসঙ্গে চলে এলাম।'

ড্রইংরুমে সবাইকে বসিয়ে শিখা বাবুর্চির সন্ধানে রান্নাঘরে গেল। নিরাময় তাকিয়ে দেখল সুজয় মুখার্জি আরও একটু গোলাকার হয়েছে, চিবুকে ও ঘাড়ে ডবল ভাঁজ পড়েছে। গীতা মুখার্জিকে সে বেশ কয়েক বছর আগে দেখেছিল, চার বছর তো হবেই, তারও দেহে একটু মাংস জমেছে। ধবধবে ফরসা রং ছিল গীতা মুখার্জির এককালে, খুব ফরসা, বড় বড় ড্যাবা ড্যাবা চোখ, বোঁচা নাক, পুরু ঠোঁট, আর গোলগাল মুখে চিবুক নামক অঙ্গের অনুপস্থিতি, বাপ কলকাতার প্রখ্যাত ব্যারিস্টর, প্রশান্ত গাঙুলি, বেথুন থেকে বি. এ. পাস, শ্যামা-সঙ্গীতে মন্দ নয়, এই ছিল সুজয় মুখার্জির সঙ্গে বিবাহের সময় গীতা গাঙুলির পরিচয়। এখনও মুখেব বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, কেবল বয়স যে পরিবর্তন আনে তা ছাড়া। কিন্তু আদব-আদত একেবারে বদলে গেছে। উঁচু হিলের জুতো, নকল চুলের সাহায্যে বুফা, ডগডগে লিপস্টিক, আলগা-আলগা ইংরেজি মেশান কথা : এসব তো বাহ্য। ভেতরটাও বদলে গেছে গীতা মুখার্জির। সবাই জানে, সুজয় মুখার্জি যতো না জাঁদরেল আই-সি-এস, তার চেয়ে অনেক বেশি জাঁদরেল তাঁর স্ত্রী গীতা মুখার্জি।

অনন্ত সিং গীল লোকটা একেবারে বিপরীত। চিকণ লম্বা দেহ, খোদাই-করা নাক-চোখ-ঠোঁট-ভ্রূ, কথাবার্তায় অত্যন্ত শালীন ও সংযত, ব্যবহারে একান্ত শান্ত, মুখে সর্বদা হাসির প্রলেপ, অথচ চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় এসবের পেছনে, খানিকটা দূরে, একটু গা বাঁচিয়ে, রয়েছে তীক্ষ্ণধাব একটি মন, যেখানে অনববত চিন্তা পাক খাচ্ছে, চোখ কান নাক সংগ্রহ কবছে চিন্তার রসদ, অথচ সে মনেব ছাপ মুখে দেখবার জো নেই। অর্থাৎ অনন্ত সিং গীল একসঙ্গে দুটো মানুষ, একটার চারু প্রকাশে সকলে প্রীত, অন্যটা গোপন অস্তিত্বে ক্রমাগত নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছে, তাব সঙ্গে লেনদেন একমাত্র অনন্ত সিং গীলের। তারা সিং গীল আধুনিকা, চুল ঘাড়ের কাছে ছাঁটা, বেশভূষায় ঐশ্বর্যের চেয়ে স্মার্টনেস বেশি, সবচেয়ে খাটো কাঁচুলিতে আবদ্ধ ছোট ছোট দুটি স্তন, শাড়ি পরেছে নাভির নীচে, পেট সরু, কোমবে মাংস জমে নি। নিরাময় লক্ষ্য করল তারা সিং গীলের ভ্রূ আঁকা, অধরের ওপর সামান্য গোঁফের রেখা। গীলের বয়স, সে আন্দাজ করল, পঁয়তাল্লিশ, তারা সিং গীল তাহলে নিশ্চয় অন্তত চল্লিশ ছুঁয়েছে, বলতে হবে দেহরক্ষার নিযম তার জানা, নিয়ম পালনে ত্রুটি নেই। সুজয় মুখার্জির বয়স তাব জানা, এই ডিসেম্বরে আটচল্লিশ হবে, তার নিজের বয়স গত এপ্রিলে সাতচল্লিশ পূর্ণ হযেছে, গীতা মুখার্জি, যতদূর মনে পড়ছে, সুজয়ের চেয়ে তিন বছরের ছোট, অতএব পঁয়তাল্লিশ, অতএব বুফাটা না কবলেই হত, শিখা এখনও এদের তুলনায় যুবতী, এই তো সেদিন তার চৌত্রিশ

পূর্ণ হল. শিখার বেশবাস ঠিক চৌত্রিশের না হলেও ত্রিশের উপযুক্ত, অবশ্য শিখাকে ত্রিশ বছর বলে এখনও চালিয়ে দেওয়া চলে। বাবুর্চি পানীয়-সম্ভার এবং সসেজ-অ্যাপিটাইজার রোলিং ট্রে-তে সাজিয়ে ঘরে ঢুকল, সঙ্গে শিখা। সকলে একে একে পছন্দ মত পানীয় তৈরি ক'রে নিলেন। সুজয় মুখার্জি অল্প সোডার সঙ্গে বেশি হুইস্কি মেলাল. গীতা মুখার্জি নিল জীন আর টনিক, অনন্ত সিং গীল বেশি সোডার সঙ্গে অল্প হুইস্কি, তারা সিং গীল সমান-সমান। নিরাময় রায় সুজয় মুখার্জির অনুকরণ করল, শিখা অনন্ত সিং গীলের।

'কাজকর্ম সব হল?' নিরাময় প্রশ্ন করল সুজয়কে।

'হল কৈ? যুদ্ধের ফলে একটা একোনমিক ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে, কিন্তু স্বীকার করতে কেউ রাজি নয়। রেলওয়ে কিনতে পারছে না লোকোমোটিভ ও ওয়াগন, আমাদের মাল বিক্রয় হচ্চে না। পশ্চিমবঙ্গে বিরাট সংকট ঘনিয়ে আসছে। এনজিনীয়রিং কারখানাগুলি মাল বেচতে পারছে না। দেখবে ছ'মাসের মধ্যে কারখানার পর কারখানা বন্ধ হতে শুরু করবে। আমাদের তো সরকারি প্রতিষ্ঠান, লাভ-লোকসানের অত বালাই নেই, কিন্তু আমাদের সমস্যাও ক্রমে জটিল হয়ে উঠেছে, একদিকে মাল নামছে না, অন্যদিকে শ্রমিকরা কেবল দাবি বাড়াচ্ছে।'

'আমি তো সুজয়কে কেবল বলছি চিত্তরঞ্জনের কাজ ছেড়ে দাও, এসব পাব্লিক সেক্টর প্রজেক্টগুলো শাদা হাতি, এগুলো দিয়ে কিস্যু হবে না' গীতা মুখার্জি জোর দিয়ে বলল। 'তার চেয়ে দিল্লি এসে সেক্রেটারির চাকরি করা শতগুণে ভালো।'

'সেক্রেটারি আমায় করছে কে?' বলল সুজয় মুখার্জি 'দেখচ না নিরাময় এখনও অ্যাডিশনাল হয়ে বসে আছে। কেন্দ্রে অ্যাডিশনাল হবার চেয়ে বড় প্রজেক্টের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হওয়াকে আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।'

'নিরাময় কিন্তু করে না,' শিখা যোগ দিল।

'জানি।' সুজয় গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'নিরাময় নির্ব্বাদ নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, পাওয়ারের চেয়ে পীস্ ওর বেশি কাম্য। আমি আবার পাওয়ার না হলে টিকতে পারিনে। এজন্যে জিলায় কাজ করতে আমার ভাল লাগত। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মানে প্রায় ভগবান—অন্তত আমাদের সময়ও ছিল, এখন অবশ্য আর নেই, মিঃ গীল মাপ করবেন, আই-এ-এস অফিসাররা বড় সহজে পলিটিসিয়ানদের কাছে হেরে যায়। গীতাও জিলায় থাকতে ভালোবাসত।'

'ডি. এম.-এর স্ত্রী মানে জিলার ফার্স্ট লেডি,' গীতা মুখার্জি বলল।

'আমার জিলায় কোনওদিন ভালো লাগে নি।' নিরাময় স্বীকার করল। 'বড্ড বেশি লাইমলাইট, যা কিছু ঘটচে তুমি তার মধ্যমণি। আমার বড় সংকোচ লাগত। মনে

হত এতবড় একটা মিথ্যে বয়ে বেড়াবার ক্ষমতা আমার নেই।'

'মিথ্যে কেন? কিসের মিথ্যে?' উৎসুক অনন্ত সিং গীল জানতে চাইল।

'প্রথমে বলে রাখি,' নিরাময় বক্তব্য ব্যাখা করল, 'এ হচ্ছে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন! সুজয় আর আমি একসঙ্গে পড়েছি কলেজে, এক হোস্টেলে থেকেছি, একই বছরে আই-সি-এস হয়েছি। ওর দৃষ্টিকোণ ওর কাছে যেমন নির্ভুল, আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে তেমনি। আমি ওকে আমার মতবাদ গ্রহণ করাতে চাই নে, চাইলেও পেরে উঠব না, আমাব বেলায়ও ওকে তাই করতে হবে।'

সুজয় বলল, 'আমরা ছোটবেলা থেকেই মতের অমিল অগ্রাহ্য ক'রে বন্ধুত্ব গড়েছি।'

'ভেরি ইনটারেস্টিং' মন্তব্য করল অনন্ত সিং গীল।

(ইতিমধ্যে তিন মহিলা তিন পুরুষকে একসঙ্গে বর্জন ক'রে অন্যপাশে সবে গিয়ে নিজেদের গল্প জমাল। গীতা মুখার্জি শুরু করল জিলা-জীবনের কাহিনী নিয়ে, যে-সব কাহিনীর সে ছিল মধ্যমণি।)

নিরাময় বলল : 'আমি আমার কথাই কেবল বলছি। আই-সি-এস হলাম ১৯৩৮ সনে। লাস্ট ব্যাচ। লয়েড জর্জ যাকে সাম্রাজ্যের স্টিল ফ্রেম বলেছিলেন তার শেষতম, কনিষ্ঠ মেম্বার। প্রথম যখন জিলার ভাব পেলাম তখন যুদ্ধ চলছে ; ইংরেজরা সব যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত, তা না হ'লে অত অল্প সময়ে জিলাব দায়িত্ব আমাকে নিতে হত না। বিহারের মুঙ্গের জিলার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। এই আমি প্রথম আমাদের গ্রাম্য মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হলাম। মুঙ্গেরের গ্রামে গ্রামে যত দারিদ্র্য, অত্যাচার শোষণ জমা হয়ে আছে তত বোধহয় ভারতের আর কোথাও নয়। দেখে, বুঝে, আমার মাথা গরম হবার উপক্রম। অথচ জিলা-শাসক হিসাবে আমার প্রধান দায়িত্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, যুদ্ধের বাবদ গ্রামবাসীদের ওপর যে অতিরিক্ত শোষণ আরোপ করা হয়েছে তার পথ সুগম কবা। আমার বুঝতে বেশি সময় লাগল না যে জিলা-শাসক দ্বারা নতুন সমাজ গঠন সম্ভব নয়, না ইংরাজের আমলে, না নেহেরুর। আমরা, আই-সি-এস-রা হচ্চি অন্যের গড়া মঞ্জিল পাহারা দেবার সুশিক্ষিত কর্মচারী, নতুন মঞ্জিল গড়তে হলে যে শিক্ষা, দীক্ষা, যে আদর্শগত কমিট্‌মেন্ট থাকা দরকার, আমাদের তা নেই। জিলায় বসে 'স্টেটাস কো'র প্রহরী হবার চেয়ে শহরে বসে চলতি সমাজের প্রতিরক্ষী হওয়া অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় মনে হল।'

সুজয় বলল, 'গীল, বলা বাহুল্য, আমি একেবারে ভিন্নমত।'

অনন্ত সিং গীল বলল, 'আশানুরূপ। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি পরিচিত,

রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি বিরল বলে ওটা শুনতে আগ্রহ বেশি সেজন্য মাপ চাইছি।' এবার নিরাময় রায়কে, 'তুমি যে দ্বন্দ্বর কথা বললে তা থেকে আই-এ-এস'রা মুক্ত নয় কি?'

'হতে পারত'। নিরাময় রায় বলল, 'হ'ল না, প্রধানত চার কারণে। প্রথম, শ' তিনেক আই-সি-এস তখনও প্রশাসনে নেতৃত্ব করছে, যখন সর্দার প্যাটেল আই-এ-এস প্রবর্তন করলেন।

'এখানে একটা মজার কথা বলে নি। আমার তখন ভীষণ অবাক লেগেছিল, এখন আর লাগে না, নতুন সব কিছুর মত নতুন স্বাধীনতাকেও হঠাৎ চেনা যায় না। অবাক লেগেছিল যখন দেখতে পেলাম আমাদের স্বাধীনতার নেতারা সাম্রাজ্য থেকে মুক্তি পেয়েও সাম্রাজ্য যারা রক্ষা করেছিল, সার্থক করেছিল, সেই স্টিল ফ্রেমের শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় হাতে পরলেন। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার প্রতীক নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট রইলেন, সাম্রাজ্যবাদীর প্রশাসন যা ছিল তাই রয়ে গেল। আর. এন. ব্যানার্জি এখনও বেঁচে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবে আই-সি-এস' এর ওপরে, বা বিকল্পে কিছু ভাবতে পারেন নি। বাংলাদেশে অনেক বড় বড় যৌথ জমিদারি ছিল, বড় শরিককে বলা হত বড়মশাই, ছোট শরিককে ছোটমশাই, আসলে দুজনই সমান সামন্ততান্ত্রিক, কখনও কখনও ছোটমশাই-র ক্ষমতা কম বলে, সে অত্যাচারী। স্বাধীন ভারতের আমলাতন্ত্রে আই-সি-এস হ'ল বড়মশাই, আই-এ-এস ছোটমশাই। কে. পি. এস. মেনন এক জায়গায় লিখেছেন, আই-সি-এস পরীক্ষার সময় বিলেতে দ্বিতীয় দশকে তাঁকে যে সব প্রশ্ন করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে পঞ্চম দশকে স্বাধীন ভারতে আই-এ-এস পরীক্ষার্থীদের তিনি সে ধরনের প্রশ্নই করতেন। অর্থাৎ আই-সি-এস'রা ছোটমশাইদের তৈরি করলেন নিজেদের ইমেজে, অবশ্য অনেকখানি ছোট ক'রে, দুর্বল ক'রে। দ্বিতীয় কারণ হল : আই-এ-এস'রাও আই-সি-এসদের বড়মশাই হিসেবে মেনে নিল। এবার তৃতীয় কারণটা বলি : ইংরেজ আই-সি-এসদের দিয়ে সাম্রাজ্য গঠন করে নি, সে ভার ছিল গভর্নর-জেনারেল বা ভাইসরয়দের ওপর। আই-সি-এর'রা সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্যে নিযুক্ত হ'ত, রক্ষার দরুন যেটুকু গঠন অনিবার্য ছিল তার বেশি তাদের করণীয় ছিল না। স্বাধীন ভারতের নেতারা চাইলেন আমলাদের দিয়ে নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র তৈরি করতে। তা যে সাধিত হল না তা আমরা এখনও স্বীকার করতে সাহস পাই নে। কিন্তু বেশ কয়েকটা মজার ব্যাপার ঘটল। আই-সি-এস'রা নতুন সমাজ গঠনের অর্থ করল বড় বড় শিল্প, বড় বড় দপ্তর, বড় বড় প্রজেক্ট, যার অধিকর্তা তারাই ; আর আই-এ-এস'রা বুঝল মন্ত্রীদের স্বার্থ বাস্তবে রূপায়িত করার মানেই নতুন সমাজ গঠন। তাতে হল কি?

আই-এ-এস আর পলিটিশিয়ানদের মধ্যে দিব্যি আঁতাত গড়ে উঠল, অথচ নতুন সমাজ হল না তৈরি। এবার চতুর্থ কারণ বলছি : আই-এ-এস মানে কি? আই-এ-এস হল মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ। এ সমাজের কোনও নিজস্ব আদর্শ নেই, দৃষ্টিকোণ নেই, মতবাদ নেই, মেরুদণ্ড নেই। এ সমাজ কেবল এক জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ : নিজেরটা যে করে পারো, যত শীঘ্র পারো, গুছিয়ে নাও, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করো। আই-সি-এস'এর একটা ব্যক্তিত্ব ছিল : ইংরেজের উদার সাম্রাজ্যবাদের ব্যক্তিত্ব। আই-এ-এস'এর কোনও ব্যক্তিত্ব রইল না।'

এবার শিখা উঠে এসে বলল, 'এঁরা দুটি খেতে এসেছেন ; তুমি বক্তৃতায় এঁদের পেট ভরিয়ে দিলে। আসুন, খাবার তৈরি।'

ডিনার জমল বেশ ভালো। রান্নার প্রশংসা করল সবাই। গীতা মুখার্জিও, যিনি সচরাচর কারুর সুখ্যাতি করেন না, মাংসের রিসিপেটা জেনে নিলেন। চিত্তরঞ্জনে, তাঁর বিরাট বাড়িতে, ছ'টা ঝি-চাকর-বাবুর্চি, তবু তিনি পেরে ওঠেন না, লোক-খাওয়ানোর এমন চাপ। 'কলকাতা থেকে মিনিস্টররা তো হরদম আসছেন, প্রফুল্লদা, মানে চিফ মিনিস্টর তো সেদিনও এসে গেলেন, তারপর অতুল্য কাকাও আসেন মাঝে-মধ্যে, তাছাড়া আছে বিদেশী পর্যবেক্ষকের দল, সেবার ওয়ার্লড ব্যাংকের দুজন প্রতিনিধিকে এমন মাংস খাইয়েছিলাম যে বলতে গেলে, তার জন্যেই চিত্তরঞ্জন চল্লিশ কোটি টাকা লোন পেল, সুজয় স্বীকার করুক আর নাই করুক, তবু ভাই ছোট জায়গায় বড় হয়ে থাকবার চার্ম দু-এক বছরের পর আর থাকে না। মনটা কলকাতা দিল্লির জন্যে হাঁসফাঁস করে।' তারা সিং গীলের অবশ্য অন্য মত। জয়পুর ছেড়ে দিল্লিতে তার মন বসছে না, দিল্লির দেহে যেমন জলুস, প্রাণ তেমনি শূন্য, নয় কি? 'জয়পুরের লোকগুলো সরল, সহজ, ওদের দলাদলি পর্যন্ত খোলাখুলি, হাজার হোক রাজপুতানার একটা ট্রাডিশন আছে তো। রাজপুতানার সবাই রাজা। কংগ্রেসি এম-এল-এ'দের দেখুন না, জমিদার নয় এমন কাউকে কদাচিৎ পাবেন। বেড়াবার পক্ষে রাজস্থানের জুড়ি নেই, যেখানে যাবেন সেখানেই জীবন ইতিহাস, আমি তো মিঃ গীল ট্যুরে গেলেই সঙ্গ নিতাম, এখানে এসে সময় আর কাটতে চায় না, এখন তো এয়ার ফ্রান্সে একটা কাজ নিয়েছি, তবু কিছু একটা নিয়ে আছি।' খেতে খেতে গল্প আলাপ অনেক দিকে ধাবিত হল। সুজয় মুখার্জিদের ছেলে অনুপম শেফিলড্ ইউনিভারসিটিতে এনজিনীয়ারিং পড়ছে, আসচে বছর পড়া শেষ হ'তে হ'তে তার চাকরি হয়ে যাবে ইংলন্ডেই, 'অনুপমের জন্যে একটি মেয়ে খুঁজছি' ঘোষণা করল গীতা মুখার্জি 'বান্ধবী-টান্ধবী অনেক আছে অনুপমের, কিন্তু বৌ-বাছার ভার দিয়েছে বাবা-মাকেই।' সুজয় মুখার্জি জানাল, বিবেচনাধীন প্রস্তাবগুলির মধ্যে আই-সি-

আইর চীফ এনজিনীয়রের মেয়েটির কথাই তারা বিশেষ ক'রে ভাবছে। মুখার্জিদের মেয়ে অনুপমাকে নিরাময় ছোট্ট দেখেছে, সে এখন ফেলোশিপ পেয়ে আমেরিকায় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পড়ছে : 'কলকাতার যা অবস্থা,' সুজয় বলল, 'ভদ্রঘরের মেয়েদের হোস্টেলে রেখে পড়ানো অসম্ভব।' 'অনুর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে' গীতা মুখার্জি আবার ঘোষণা করল, 'ছেলেটি নিউইয়র্কে ডাক্তার, হ্যাঁ একেবারে খাঁটি বাঙালি বামুনেব ছেলে, যদিও কুলীন নয়, কুলীন নিয়ে আর কে মাথা ঘামায় আজকাল বলো? তবু সুজয়কে আমি ছেলে না দেখে সম্মতি দিতে বারণ করেছিলাম, জুলাই মাসে সুজয় আমেরিকা গিয়েছিল, ছেলের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি, বলছে ও-বাঙালির বাচ্চা পাঁচ বছরে বছরে চল্লিশ হাজার ডলার আয় করবে, দেখে নিও। না, বিয়ে দেব ইন্ডিয়াতেই, অমন জামাই তোমাদের সবাইকে না দেখিয়ে আমি শান্তি পাবো না।' অনন্ত সিং গীলের একটি মাত্র কন্যা, রাজস্থান ইউনিভারসিটিতে পড়ছিল, এখন দিল্লি ইউনিভারসিটিতে এম. এ. পড়ছে, 'বিয়ে তো দিতেই হবে,' গীল বলল, 'কিন্তু আমি বলছি তাড়া কিসের, বিয়ে দিলেই তো বেটি পর হয়ে যাবে।' 'আসল কথা কি জানেন,' তারা সিং গীল বুঝিয়ে বলল, 'জয়পুরের রাজবংশের একটি ছেলেকে আমাদের খুব পছন্দ, দেখতে কিতাবের রাজপুত্র, এদিকে পড়াশোনায় ভালো, গত বছর ফরেন সার্ভিসে ঢুকেছে।' শিখা এসব কথা কিছুটা শুনল, কিছুটা শুনল না, ওব বুকের মধ্যে সেই অতি পরিচিত অথচ একেবাবে অচেনা পাথর-ভারটা হঠাৎ ওকে সজাগ করে দিয়েছে, শিখা কেমন অসহায় বোধ করছে নিজেকে, এ ভাবটা হঠাৎ বিনা নোটিশে আসে, কাবণ না থাকলেও, তা নয়, কারণ ছাড়াই, হঠাৎ শিখাব মনে অন্ধকাব ঘনিয়ে আসে, বুকের স্পন্দন মাঝে মাঝে থেমে যায়, ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে আসে, শিরাগুলি দেহের মধ্যে কাঁপে, মাথাটা চিন চিন ব্যথা করে, শিখার ভয় হয় এক্ষুনি বুঝি চোখের সামনে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে, কিছুই আর স্বাভাবিক, সুশৃঙ্খল থাকবে না, গীতা মুখার্জি তখন তারা সিং গীলকে বলছিল, গেলবার সুজয় আমেরিকা থেকে কি কি জিনিস এনেছে, মীট-মিনসার লাগান অস্টারাইজার ব্লেন্ডারটার গুণগান করছিল, আর তারা সিং গীল নিজের গলার জাপানি মুক্তোর মালা দেখিয়ে বলছিল কি কারণে ওটা পৃথিবীর অন্যতম সেরা মুক্তো, আর শিখার মনে হল গীতা মুখার্জির মুখ আধখানা তারা সিং গীলের মুখ হয়ে গেছে, তারা সিং গীলের মুখ আধখানা গীতা মুখার্জির ; দুটো মানুষেরা চারটে মুখ কি অদ্ভুতভাবে একসঙ্গে অনেক, অনেক, অনেক কথা বলে যাচ্ছে, কি জোরে, তবু কতো চাই, তবু জীবনে কতো ক্ষুধা আর তৃষ্ণা অতৃপ্ত শিখা উঠে গিয়ে বাথরুমে মুখ ধুল, ঘাড়ে চোখে জল লাগাল, একটু সামলে নিতে পারল নিজেকে,

ফিরে এসে টেবিলে বসল, তখন আহার শেষ হয়ে এসেছে, ডেসার্ট নিয়ে চারজনের গল্প তখনও চলছে, শিখা মনে মনে ভগবানকে ডাকল, তাড়াতাড়ি এদের বিদায় করে দাও, ঠাকুর, নিরাময় টের পায় নি, দেখতে পাচ্ছে না, পুরুষগুলি কি বোকার মতো অন্ধ হয়ে যায় মাঝে মাঝে...

নিরাময়কে সুজয় মুখার্জি বলছিল, 'অসম্ভব। তুমি দেখতে পাচ্ছ না মন্ত্রীরা কি দ্রুততার সঙ্গে নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলছেন, এবং রাজনীতিকে একটা প্রফেশনে পরিণত করছেন! এদেশের আসল সমস্যা, নেতা নেই। ক্রাইসিস অফ লীডরশিপ। এবং তার সঙ্গে এসে মিলেছে ক্রাইসিস অফ ক্যারেক্টর। চরিত্র নেই আমাদের দেশের মানুষের। দুটো প্রধান পদার্থের অভাবে ভারতবর্ষের অগ্রগতি ব্যাহত, এবং এখন দেখবে আমরা পিছিয়ে যাবো, এগিয়ে নয়।' নিরাময় জবাব দিচ্ছিল, 'চরিত্র যদি নষ্ট হয়ে থাকে তার দায়িত্বও তো আমাদেরই। আমাদেরই কতটুকু চরিত্র আছে, বল!' সুজয় বলছিল 'যদি কোথাও এখনও চরিত্র বলে কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে তা সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যেই আছে। যা তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষের তার কৃতিত্ব প্রধানত সিভিল সার্ভেন্টদের।' গীল সুজয়ের সঙ্গে মিলিয়ে বলছিল, 'যারা সৎ এবং সুদক্ষ রাজপুরুষ, তারা আর কাজ করে উঠতে পারছে না, মন্ত্রীরা বড় বেশি রাজনীতি করছেন, এবং তাই অনেকে বিদেশে কাজের চেষ্টা করছে, চলেও যাচ্ছে।' সুজয় মুখার্জি স্বর নামিয়ে চুপি চুপি বলল, 'শুনেছি, রাজমঙ্গলম, আমাদের অডিটার জেনারেল, গেল বার নিউ ইয়র্কে যাবার সময় পনেরজন আই-সি-এস, আই-এ-এস, আই-এ-এস অফিসরের দরখাস্ত পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিল ইউ-এন-এ চাকরির জন্যে ; যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে দলে দলে ভালো লোকেরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে।' নিরাময় বলছিল, 'যাবে না কেন? পৃথিবীর বৃহত্তম ক্ষেত্রে যদি তাদের প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার ব্যবহার হয় তাতে তো ভারতবর্ষের লাভ বই ক্ষতি নেই।' গীল বলছিল. 'শুনেছি, এমন কয়েকজন আই-সি-এস আছেন যাঁরা অপেক্ষাকৃত জুনিয়র পদেও ইউ-এন-এ যেতে ইচ্ছুক।' সুজয় মুখার্জি বলছিল, 'জুনিয়র পদে গেলেও মাইনে তো তিন-চারগুণ বেশি হবে।' নিরাময় বলছিল, 'ইউ-এন-এ উপযুক্ত সিনিয়র পদ পাওয়া আমাদের দেশের লোকেদের এখন সম্ভব নয়—এমনিতেই অনেক বেশি ভারতীয় রয়েছে ইউ-এন-এ, এশিয়া আফ্রিকার অন্য দেশগুলি এটা মোটেই পছন্দ করছে না।' গীল বলছিল, 'ব্যুরোক্রেসিকে সবাই দোষ দেয়, কিন্তু ব্যুরোক্রেসির জোরেই তো দেশগঠন হল ভারতবর্ষে! পলিটিসিয়ানরা তো কেবল ভেদনীতি প্রচার করছেন। পারলে তাঁরা দেশটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিজেদের জমিদারিতে পরিণত করতেন। এ দেশের ঐক্য, নতুন সমাজ গঠন,

এসব সত্যিকারেব কাদের কৃতিত্ব? ব্যুরোক্রেসির!' সুজয় মুখার্জি বলছিল, 'এবং আর্মির ও শিল্প-নেতাদের। যেটুকু ঐক্য ভারতবর্ষে আছে তার স্তম্ভ হল ব্যুরোক্রেসি, আর্মি অ্যান্ড ইনডাস্ট্রি।' শিখার কানে ওদের উত্তপ্ত আলোচনার টুকরো টুকরো খণ্ড পৌঁছচ্ছিল, এবং সে ভয়ে ভয়ে দেখছিল কি বিরাট হাঁ করে কি লম্বা লম্বা জিভ বার করে ওরা আইসক্রিম খাচ্ছে, চারজনেই, খাচ্ছে আর বলছে, আর একে অপরের দিকে কি বড় বড় লালচে চোখে লোভের সঙ্গে তাকাচ্ছে, গীল লোভ করছে সুজয় মুখার্জিকে, সুজয় মুখার্জি তারা সিং গীলকে, নিরাময় গীতা মুখার্জিকে, গীতা মুখার্জি সবাইকে, একসঙ্গে, এবং আরও, 'তুমি আইসক্রিম খাচ্ছ না শিখা?' গীতা মুখার্জির লোভাতুর প্রশ্নের জবাবে শিখা কোনও মতে বলল, 'না, আমি রাত্তিরে আইসক্রিম খাই না, সর্দি হয়,' মিথ্যে কথা, আমি রত্রিতে আইসক্রিম পেলেই খাই, খেতে ভালবাসি, অথচ এত বড় মিথ্যে কথা, শুনেও নিশ্চয় শুনেছে, শুনেও নিরাময় একবার তাকাল না, অবাক হওয়া তো দূরের কথা, আরও দূরের কথা টের পাওয়া যে শিখার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, নিরাময়ের চোখ তারা সিং গীলের পাতলা মসৃণ পেটের নগ্নতায় বিচরণ করে বুকের দিকে চোর-ঢুকছে, তিন গ্লাস হুইস্কি না গেলে নিরাময়কে সত্যিকারের চেনা যায় না, সর্বনাশ, ওরা সব চলে গেলেই নিরাময় চাইবে, ওর ভরা পেটে আর একটা ক্ষুধা চাগিয়ে উঠেছে, তিন গ্লাস মদের আগুন জ্বলছে নিরাময়ের রক্তে, সে আ.গুন নেভাতে শিকার দরকার হবে. আমাকে, আমাকে নয় আমার দেহকে, অর্থাৎ আমাকে, চাইবে নিরাময়, অথচ আমি ভেতরে ভেতরে কাচের টুকরো হয়ে পড়ছি, ঝুর ঝুর ভেঙে পড়ছি আমি...

ওরা চলে গেল, একসঙ্গে হাই তুলে, হাসিমুখে, সৌজন্য জানিয়ে, রান্নার পুনর্বার প্রশংসা করে। গীলরা যেতে বলল ওদের বাড়িতে। 'আমরা শিগগিরই তোমাদের ডাকব,' বলল অনন্ত সিং গীল, 'আমার রান্না অত্যন্ত বাজে, তবু সাহস করে ডাকব আপনাদের,' যোগ দিল তারা সিং নিরাময়ের চোখে চোখ রেখে, একটু প্রগলভ হেসে, অনেক মেয়েই যা করে থাকে সুযোগ পেলে। 'চিত্তরঞ্জন একবার বেড়িয়ে যাও না,' সুজয় মুখার্জি বলল নিরাময়কে, 'দু'চারদিনের জন্যে এলে ভালোই লাগবে,' যার সঙ্গে গীতা মুখার্জি, একেবারে বিদায় নেবার সময়, পরম স্নেহে, শেষ বাক্য একত্র করল, 'তোমাদের তো কোনও অসুবিধাই নেই, বাচ্চা নেই, কাচ্চা নেই, বেশ ঝাড়া-হাত-পা জীবন কাটিয়ে দিলে দুজনে,' শিখা দাঁতে দাঁতে ঘষল, দাঁত বার করে হাসল, দরজা বন্ধ করল, ছিটকিনি লাগাল না, নিরাময় ওদের গাড়িতে তুলে দিয়ে ফেরত আসবে, ছুটে বাথরুম গেল, পেচ্ছাপ করল, মাথায়, ঘাড়ে জল দিল, শোবার ঘরের আলমারি খুলে চারটে ট্রাংকুইলাইজার পিল একসঙ্গে জলের সঙ্গে

খেল। খাটে শুয়ে রইল শিখা, বাবুর্চি খাবার টেবিল সাফ করছে, প্লেটগুলি সরাতে এমন শব্দ করছে কেন, 'তোমার বাড়ির জন্যেও খাবার নিয়ে যেয়ো, কুন্দন সিং,' একটু বড় গলায় হাঁকল শিখা, চোখ বুজল, শরীরটা অনেকখানি শান্ত হয়েছে, বুকের স্পন্দন আর থেমে যাচ্ছে না, কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে, ঘুম-ঘুম ; বিছানা থেকে উঠল শিখা, নিরাময় এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওদের সঙ্গে, হাসির আওয়াজ শুনল শিখা, কিছু একটা সরল আলোচনা জমেছে, শাড়ি ব্লাউজ ছাড়ল, বডিস খুলল, আয়নায় নিজেকে পুরো একবার দেখে নিল শিখা, আমার চেয়ে তারা সিং গীল অনেক, অনেক ফর্সা, ওদের রং যে কি ক'রে এত ফর্সা হয় ঈশ্বর জানেন, নাইটি পরে বিছানায় এসে আবার শুয়ে পড়ল, কিন্তু আমার শরীর তারা সিং গীলের চেয়ে অনেক সুন্দর, ঘুম পাচ্ছে, ঘুম-ঘুম, তারা সিং গীলের পেছন নেই বললেই হয়, বুক দুটোও বড্ড বেশি ছোট, নিরাময় তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, অনেক পুরুষ কিন্তু মেয়েদের ছোট বুক পছন্দ করে, নিরাময়ও কি তাই, কিছু বলে নি তো কখনও, মদে বেহুঁশ হয়েও কখনও বলে নি কিন্তু, নিরাময় গুডনাইট বলছে, গাড়ি ছাড়ার শব্দ হল, দুবার, নিরাময় ফিরে আসছে, চাইবে, চাইবে, আমার এখনই ঘুমান চলবে না, কেমন ঘুম পাচ্ছে, ঘুম-ঘুম।

কাপড়-জামা ছেড়ে স্লিপিং স্যুট পরতে পরতে নিরাময় বলল, 'বুঝলে, আজ যদি বিদেশী কোনও লোক আমাদের পার্টিতে থাকত, ভারতবর্ষের যে কিছুই জানে না, তাহলে কি সে বুঝতে পারত এদেশের একশ' জনের মধ্যে আশি জন নিতান্ত গরিব, তাদের অন্নের অভাব না হলেও জীবন-ধারণের অন্যের একান্ত অভাব? সে লোকটির কি মনে হত না, আমরা সবাই বেশ সচ্ছল এবং মোটাদেহ, আমাদের ছেলেমেয়েরা সবাই বিদেশে পড়ছে, আমরা রাজপুত্র-জামাই খুঁজে থাকি, ঘন ঘন পশ্চিম প্রদক্ষিণ করি, এবং ভারতবর্ষ নামক এক বিরাট দায়িত্ব পরম আন্তরিকতার সঙ্গে অনায়াসে বহন করে থাকি? আমাদের একমাত্র সমস্যা হল ক্রমশ ক্ষীয়মাণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, একমাত্র প্রতিবন্ধক স্বল্প-বুদ্ধি মন্ত্রিগণ, একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় আমাদের প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতার বিশ্বকল্যাণে বিরাটতর সার্থকতর ব্যবহার?' বিছানায় উঠে এসে নিরাময় অবাকের সঙ্গে রাগ মিশিয়ে প্রশ্ন করল, 'এ কি, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?' শিখা প্রশ্ন শুনল, বলতে ইচ্ছা করল, হ্যাঁ, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে, ঘুম ঘুম, বলল, 'না, ঘুমুব কেন?' নিরাময় শিখার বুক স্পর্শ ক'রে হাতের মধ্যে নিয়ে, বলল, 'তোমার ক্লান্ত লাগছে?' শিখার বলতে ইচ্ছা হল ভীষণ! তুমি আজ ছেড়ে দাও, বলল, 'এই একটু,' এবং অতএব নিরাময় উদ্যোগী হল, তিন গ্লাস হুইস্কির আগুন তাকে তাড়া দিয়ে অতি সহজে বিস্ফোরণের মুহূর্তে নিয়ে গেল,

শিখাকে আজ কিছু করতে হল না, কেবল একবার, তাও অভ্যাসবশত, নিরাময়ের ঠোঁট কামড়ে ধরল শিখা, আর দুবার শব্দ ক'রে উঠল, একবার একটু জোরে, যখন নিরাময় ফেটে পড়ল শিখার মধ্যে, মুখ দিয়ে একটা অসভ্য আওয়াজ ক'রে, তারপর অনেকক্ষণ, বড় বেশিক্ষণ, শিখার শরীরের ওপরেই শুয়ে রইল, কি দারুণ ভারী হয়েছে নিরাময়ের দেহটা আজকাল, দম আটকে এল শিখার, নড়ল, তাতেই হয়তো নিরাময়ের দেহটা শিখার দেহচ্যুত হয়ে বিছানায় পড়ল, নিরাময় তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে নিরাময় জেগে গেল। গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে শিখার মুখ থেকে। বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বালল নিরাময়। এক মিনিটে বুঝতে পারল কি ঘটেছে।

উঠে বাথরুম থেকে জল এনে শিখার কপালে, ঘাড়ে, মাথায় লাগাল। নাইটির বোতাম খোলাই ছিল, শিখার দেহ প্রায় নগ্ন। নিরাময় তাকিয়ে শিখার দেহ দেখল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে ঠিকই। ঘড়িতে দেখল বারোটা পঞ্চাশ। বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল, পুরো এক গ্লাস জল খেল।

একটু ভেবে স্থির করল ডাক্তারকে ফোন করাই ঠিক হবে। পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোনে ডায়াল করল। প্রায় তিন মিনিট পরে আওয়াজ এল : 'হ্যালো।'

'আমি নিরাময় বায় বলছি। নি-রা-ময় রা-য় আই-সি-এস। আপনাকে এত রাত্রে ফোন করার জন্যে মাপ চাইছি।...আপনি বন্ধুলোক বলেই তো এরকম সুবিধা নিতে পারি।...শিখা...শি-খা, আমার স্ত্রী...ওর সেই অসুখটা আজকে আবার হঠাৎ...হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেছে...দেড় ঘণ্টা আগেও ঠিক ছিল...আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দে জেগে গিয়ে দেখি মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, হুঁশ নেই...একটা পার্টি ছিল, আমার বন্ধু সুজয় মুখার্জি আই-সি-এস তার স্ত্রীকে নিয়ে ..না, বেশ ভালোই তো ছিল...ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করছিল শেষ পর্যন্ত...না, আর কোনও উত্তেজিত কিছু ঘটে নি...প্রায় আট মাস এরকম হয় নি, ভেবেছিলাম সেরে উঠল বুঝি...এত রাত্রে আপনাকে আসতে বলতে সংকোচ হচ্ছে, কিন্তু...আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ, অত্যন্ত কৃতজ্ঞ...আমি দরজা খুলে দেব...আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ...'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে নিরাময় শোবার ঘরে ফিরে এসে অসহায় বোধ করল। শিখাকে শাড়ি পরাবে কেমন করে? পাতলা নাইটির বোতাম লাগিয়ে দিলেও শিখা প্রায় নগ্নই থেকে যাবে। ডাক্তারের সামনে এমনি করে রাখা কি ঠিক হবে? অথচ অজ্ঞান শরীরটাকে শাড়ি পরাবার সাধ্য তো নিরাময়ের নেই, অগত্যা বেডকভার দিয়ে শিখাকে সে গলা পর্যন্ত ঢেকে রাখল। ডাক্তার এসে বুক দেখবে, পিঠ দেখবে,

পেট দেখবে। দেখুক, ভালো করেই দেখুক। কিছু করবার নেই নিরাময়ের।

যদি প্রশ্ন করে, নিরাময় বলবে, না, সে রকম কিছু হয় নি।

শিখার ফিট হওয়া রোগের সঙ্গে সঙ্গমের সম্পর্ক থাকতে পারে না।

দপ্তরে বসেই দীপংকর দয়াল গুরুর আদেশ পেল। এমন আদেশ বার বার সে পেয়ে এসেছে সংকটের সময়, যখন নিজেকে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, দীনহীন মনে হয়েছে, আর প্রাণ ছুটে গেছে গুরুর দিকে, সেই কেন্দ্রবিন্দুতে, যা দীপংকর দয়ালের জীবন-উৎস।

আজ নয়, অনেক বছর আগে, সেই উত্তরপ্রদেশ সম্পূর্ণানন্দের প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকার সময়, দয়াল গুরুর সন্ধান পেয়েছিল, সেই থেকে তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু সুস্থির। তার গুরু আনন্দ মহারাজ তখনও বিশ্ববিখ্যাত হন নি, তখনও তাঁর মাহাত্ম্য কেবল উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ। সম্পূর্ণানন্দজী আনন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন না, তথাপি মাঝে মধ্যে তাঁর শরণাপন্ন হতেন, সেই সূত্রে, পরমসৌভাগ্য, দীপংকর দয়াল গুরুজীকে আবিষ্কার করেছিল। গুরুজী অবশ্য বলেন, 'তুমি আমাকে খুঁজছিলে গো, আর আমি খুঁজছিলাম তোমাকে, এ খোঁজাখুঁজি তো পৃথিবীর নিয়ম. ভক্ত খোঁজে ভগবানকে, ভগবান ভক্তকে।' এলাহাবাদের উপকণ্ঠে আনন্দ মহারাজের আশ্রম তখনই শিষ্যদের আসা-যাওয়ায় সরগরম ছিল, ক্রমে ক্রমে আশ্রমের আয়তন ও শ্রী বাড়ল, এখন পঁচাত্তর একর জমি নিয়ে বিরাট প্রেমসেবাশ্রম', তার মধ্যে মধ্যে স্কুল, হাসপাতাল, কারিগরি বিদ্যালয়, শিষ্যনিবাস। মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি দীপংকর দয়াল আনন্দ মহারাজের আশ্রমের দ্রুতবিন্যাসে সাহায্য করেছিল, জমিটা সরকার নামমাত্র শুল্কে দান করেছিলেন, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণে ও পরিচালনে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। তখন থেকে দীপংকরের প্রতি গুরুর কৃপা অপরিসীম। আজ আনন্দ মহারাজ পৃথিবী-বিখ্যাত, ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকৃত, সুদূর আমেরিকায় বছরে অন্তত একবার তাঁকে যেতেই হয়, শিষ্য ও ভক্তদের কাতর কাকুতি তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। আশ্রমের শিষ্যনিবাসে সর্বদা আট-দশ জন শ্বেতাঙ্গ নরনারী উপস্থিত থাকে, এরা আসে ইংলন্ড, জার্মানি, সুইডেন, কানাডা ও আমেরিকা থেকে, যে কয়টি দেশে আনন্দ মহারাজের কীর্তি-কাহিনী বহুল বিদিত। তথাপি গুরুর কৃপা থেকে দীপংকর দয়াল কদাচ বঞ্চিত হয় না, গুরু বলেছিলেন, 'আমি যতদূরেই থাকি না কেন, সর্বদা তোমাদের অতি নিকটে, বুঝলে দয়াল? কত নিকটে জানতে চাও গো?' নিজের বুক স্পর্শ করে বলেছিলেন, 'এতো। অন্তরে দৃষ্টিপাত কারো, দেখবে আমি বর্তমান। অন্তরে কান পেত, আমার ধ্বনি শুনতে পাবে।' ধ্বনি

তো নয়, আদেশ। সংকটে, সংশয়ে, দীপংকর দয়াল বার বার গুরুর আদেশ-ধ্বনি শুনতে পেয়েছে, যেমন আজ আবার পেল, সাতটা বাজতে বারো মিনিট আগে নিজের দপ্তরে একা একা ব'সে, বনমালী-শংকর ঝার ঘরে মিটিং ভাঙবার অনেক পরে, যখন সে ওঠবার আয়োজন করছে, অথচ মন উদাস, বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না, যে ইমারত নিয়ে দীপংকরের জীবনযাপন তার ভিত্তি হঠাৎ নড়ে উঠেছে, মনে শ্রাবণের মেঘ, আর মেঘের মধ্যেই বিদ্যুতের মত জ্বলে উঠল গুরুর ধ্বনি প্রত্যাবর্তন করো। ফিরে যাও। তোমার কর্মক্ষেত্র এখন দিল্লি নয়। উত্তরপ্রদেশ।

কিছুদিন থেকে দীপংকর দয়াল নিজেই এ আদেশের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। সাতান্ন বছর বয়স হয়েছে সরকারি দলিলে, আসলে তার উনষাট হয়ে গেছে, চাকরির স্বাভাবিক মেয়াদ আর এক বছর। কেন্দ্রে যখন আসতে হয়েছিল তখন উত্তরপ্রদেশে দীপংকর দয়ালের আসন টলে উঠেছিল : সম্পূর্ণানন্দের রাজনৈতিক তিরোভাবের পর চন্দ্রভানু গুপ্ত ও কমলাপতি ত্রিপাঠীর দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতায় তার স্থান ছিল না। ভুল হয়ে গিয়েছিল : সম্পূর্ণানন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যাওয়ায় দয়াল কংগ্রেসের অন্য নেতাদের সঙ্গে সেতু নির্মাণ করতে পারে নি। কেন্দ্রে তিন বছর থাকবার সময় দীপংকর এ ভুল অনেকখানি শুধরে নিয়েছে। পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে তার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশের সরকারের সঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে। মন্ত্রী দীক্ষিত মধ্যপ্রদেশের লোক, প্রতিমন্ত্রী প্যাটেল গুজরাটের, সেক্রেটারি ঝা উত্তরপ্রদেশের হলেও আই-সি-এস অফিসরদের অহমিকায় নিজেকে সর্বভারতীয় মনে করেন, মন্ত্রণালয়ে, অতএব, দীপংকর দয়াল উত্তরপ্রদেশের স্বার্থের প্রধান সংরক্ষক। অন্তত এ ধারণাটুকু লক্ষ্ণৌর রাজনৈতিক নেতাদের মনে তিন বছরে সে সৃষ্টি করতে পেরেছে, এবং সৃষ্টি করতে গিয়ে সাবধানে দেখে নিয়েছে যাতে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের কোনও একটি দলের সঙ্গে বেশি রকম আত্ম-সংযোগ না হয়ে যায়, যেন সবগুলি বড় উপদলের সঙ্গেই সমান সংযোগ তৈরি হ'তে পারে। তিন বছরের প্রযত্নে দীপংকর দয়াল উপদলপতি সি. বি. গুপ্ত কমলাপতি ত্রিপাঠী, এবং চরণ সিং, তিনজনের সঙ্গেই বলিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। এখন তার পক্ষে উত্তরপ্রদেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব।

এবং প্রয়োজন। আটান্ন বছরের পর কেন্দ্রে আর চলবে না। এক সময় আশা ছিল ঝা'র কাছ থেকে বড় কোনও একটা প্রজেক্টের কর্তৃত্ব মিলবে, যেমন দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের চেয়ারম্যান, অথবা ভাকরানাঙ্গল প্রজেক্টের। সে আশা পূর্ণ হয় নি। অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে কোনও প্রাইভেট কোম্পানিতে ভালো রকম একটা চাকরির সম্ভাবনাও দীপংকর দয়াল আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারে নি ; মনে হয়েছে

যে সব গুণাবলী তাকে সম্পূর্ণানন্দ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মূল্যবান করেছিল, কোম্পানির মালিকরা, যারা পাঁচসালা পরিকল্পনার কল্যাণে বিপুলকায় হতে পেরেছে, বিশেষ গ্রাহ্য করে না। এ ধারণা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে, গুরুর আশীর্বাদে, দীপংকর দয়ালের মনে নতুন ভবিষ্যতের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। আই-সি-এস'রা যদি অবসর নেবার পর কেন্দ্রে রাজনীতির মাধ্যমে এম-পি, এমনকি মন্ত্রী হতে পারে, আই-এ-এস'রাই কেন তবে রাজ্যে তা হ'তে পারবে না? অর্থাৎ অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, দীপংকর দয়াল সংকল্প করেছে, সে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। আপাতত কংগ্রেসের মাধ্যমেই তাকে রাজনৈতিক সোপান আরোহণ করতে হবে, কিন্তু সুযোগ ও প্রয়োজন মত জনসংঘে যোগদান করতে মানসিক প্রস্তুতি দীপংকর দয়ালের অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

নতুন ভূমিকার এ প্রস্তুতি সম্ভব হ'ত না, যদি-না আনন্দ মহারাজের আশীর্বাদ ও উৎসাহ দীপংকর দয়ালের ভাগ্যে জুটত। দশ বছরে আনন্দ মহারাজের প্রতিষ্ঠান উত্তরপ্রদেশে গভীর ও ব্যাপক হয়েছে, অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। 'আনন্দ-সঙ্ঘ' এখন উত্তরপ্রদেশের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। প্রায় প্রতি জিলায় এখন 'আনন্দ-সঙ্ঘের' স্কুল, ব্যায়ামাগার, ডিসপেনসাররি সমাজ-সেবা কেন্দ্র। 'আনন্দ-সঙ্ঘ' সরকারের কাছ থেকে কনট্রাক্ট পেয়ে কয়েকটি বড় বড় আপিস ও হাসপাতাল তৈরি করেছে, এখন রাস্তাঘাট বানানোর কনট্রাক্টও পেতে শুরু করেছে। আনন্দ মহারাজ উত্তরপ্রদেশের, এমনকি সমস্ত দেশেরও ব্যবহারিক কল্যাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলে 'আনন্দ-সংঘ' হিন্দীভাষী ভারতবর্ষে একটি ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। দীপংকর দয়াল অবশ্য জানে এ কুৎসা সত্য নয়, আনন্দ মহারাজ আদৌ রাজনীতি করেন না, তিনি সর্বত্যাগী মহাপুরুষ, তাঁর মাঙ্গলিক শক্তি পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হ'তে চলেছে, তিনি নির্লোভ, নিষ্কাম, নির্মল। গতবছর গো-হত্যার বিরুদ্ধে তিনি যে অনশন মৃত্যুর হুমকি দিয়েছিলেন, যার ফলে 'আনন্দ-সঙ্ঘ' দশ লক্ষ উত্তরপ্রদেশ-নিবাসীর প্রতিবাদের নেতৃত্ব করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং যার ফলে, উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভাকে পরিষ্কার ভাষায় অঙ্গীকার করতে হয়েছিল সবরকমের গো-হত্যা বারণ ক'রে আইন প্রণীত হবে, তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না একেবারেই, দীপংকর দয়াল জানে, তার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সংস্কৃতি সংরক্ষণ, যে সংস্কৃতির বিনাশ হলে হিন্দু সমাজও বিনষ্ট হ'তে বাধ্য।

আনন্দ মহারাজ দীপংকর দয়ালকে আশীর্বাদ করেছেন : 'তোমার অভিপ্রায় শুভ, এবং আশীর্বাদ করছি, সার্থক হোক। হিন্দুধর্মে মানুষের স্থান সবার ওপর, এমন কি ভগবানেরও। মানুষই যদি না থাকল তবে ভগবান থেকে কি লাভ? শুভ্রমন মানুষ

দেবতার সমান। তুমি শুভ্রমন, তুমি রাজনীতি করলে রাজনীতিও শুভ্র হবে। 'আনন্দ-সঙ্ঘ' তোমায় সাহায্য করবে, তুমি প্রস্তুত হও।' এখানেই আনন্দ মহারাজের মাহাত্ম্য। তিনি মানুষকে বিচার করেন না, ক্ষমা দিয়ে পবিত্র ক'রে আশীর্বাদে শ্রীময় করেন। তাই তাঁর কাছে আসে দলে দলে তারা যাদের সমাজ কেবল বিচার করতে চায়। উত্তরপ্রদেশের পুলিশ বিভাগের উঁচু মান থেকে দারোগা পর্যন্ত অফিসরদের অধিকাংশ আনন্দ-সঙ্ঘের সভ্য, অনেকে আনন্দ মহারাজের শিষ্য। ইনকাম ট্যাক্স বিভাগের এমন অফিসর বিরল যে আনন্দ মহারাজের শিষ্য নয়। বড় বড় ব্যবসায়ী, কনট্রাক্টর, কোম্পানির ডিরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজার, জমিদার ; এরা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আনন্দ মহারাজের কৃপা ও আশীর্বাদের পাত্র হয়ে ওঠেন। 'তুমি কালোবাজারে পয়সা করেছ', আনন্দ মহারাজ বলেন, 'তাতে কি হয়েছে? ব্যবসা দ্বারা তুমি জনসেবা করছ। মন্দের দিকে মন রেখো না, মন্দ তোমায় স্পর্শ করবে না।' আনন্দ মাহারাজের কাছে ধনী-দরিদ্র, সাধু-অসাধু, ভালো-মন্দ, সব এক ; মানুষকে তিনি দেবতা মনে করেন, তাঁর কাছে তোমার একমাত্র পরিচয় তুমি মানুষ।

আনন্দ মহারাজের আদেশ পেয়ে দীপংকর দয়াল উত্তরপ্রদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা সরকারিভাবে জ্ঞাপন করেছে মাস ছয়েক আগে, সেক্রেটারি অনুমোদন মন্তব্যের সঙ্গে তা পাঠিয়ে দিয়েছেন হোম মিনিস্ট্রিতে, ওটা হয়ে যেতে দেরি নেই বেশি। লখনৌ থেকে সম্মতিসূচক পত্রের পথও তৈরি। বছর খানেক লখনৌতে রাজ্য সচিবালয়ে সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করার সঙ্গে কোন্ কোন্ কংগ্রেসি নেতার সঙ্গে আঁতাত পাতাতে হবে, দীপংকর দয়াল তাও ঠিক ক'রে নিয়েছে। রাজনৈতিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, একক নেতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরের বিপদ অগ্রাহ্য করা যায় না।

আজ দপ্তর ছাড়বার প্রাক্কালে দীপংকর দয়াল আবার গুরুদেবের আদেশ শুনতে পেল অন্তরে, সন্দেহ হল, এ কি আদেশ না নিজের চিন্তা, সঙ্গে সঙ্গে গুরুর কণ্ঠ পরিষ্কার ধ্বনিত হল। তখন আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। দীপংকর দয়াল লিফ্ট না নিয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল, ঘড়িতে দেখল, সাতটা সতের। নিচের তলায় এসে দরজা পেরিয়ে বড় বড় পা ফেলে পৌঁছল গাড়িতে। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে হুস ক'রে ফাটক পেরিয়ে দীপংকর দয়াল রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড ধ'রে জনপথে পড়ল, জনপথ ধ'রে ধাবিত হল সাউথ-এন্ড রোড পর্যন্ত, তারপর পৃথ্বীরাজ রোড ধ'রে এল মেহ্‌রলি রোডে, ধাবিত হল সফ্‌দরজং হাসপাতাল, গ্রিন পার্ক, হাউজ খাস পেরিয়ে কুতবের দিকে, কুতবের কিছু আগে বড় একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, ফটক খুলে দরজায় এসে বেল টিপল, মিনিট তিনেক সাড়া-শব্দ না পেয়ে, দ্বিতীয়বার, এবং বেয়ারা-জাতীয় যে লোকটি এবার দরজা খুলল, তাকে প্রশ্ন

করল, 'মহিমপুরের মাতাজী আছেন?' উত্তর শুনে বলল, 'বলো দীপংকর দয়াল সাহেব একবার দেখা করতে চান', এবং ঘরে ঢুকে বুঝল ওটা ওয়েটিং রুম, কোণের একটা পুরান তুলো-বার-করা সোফায় বসল। নার্ভাস লাগল দীপংকর দয়ালের, প্রথম হেমন্তেও কপালে ঘাম দেখা দিল, ইচ্ছে হল ধূমপানের, নিজের অজান্তে হাত পকেট হাতড়াল, মনে পড়ল, গুরুর আদেশে তিন বছর সে সিগারেট ছেড়েছে, কারণ ডাক্তার বলেছিল অন্যথা শক্ত ক্রনিক ব্রংকাইটিস অনিবার্য। হাতঘড়িতে দেখল পাঁচ, সাত, দশ মিনিট অতিক্রান্ত, এর মধ্যে দুবার উঠে জানলার কাছে দাঁড়াল, আবার গিয়ে বসল সোফাতে, ব'সে ব'সে গুরুর নাম স্মরণ করল, আর তখনই সেই বেয়ারা-জাতীয় লোকটি পুনরায় উপস্থিত হয়ে জ্ঞাপন করল, 'মাতাজী একটু ব্যস্ত আছেন। আপনাকে খানিকক্ষণ বসতে হবে, যদি অন্য সময় না আসতে পারেন।' দীপংকর দয়ালের কান গরম হল, হৃৎপিণ্ড একবার কাঁপল, সে বলল, 'আমি অপেক্ষা করছি', লোকটি ভেতর দিকে পা বাড়াতে প্রশ্ন করল, 'খুব দেরি হবে কি?' উত্তরে শুনল, 'মালুম নেই।'

অপেক্ষা করল দীপংকর দয়াল। করতে করতে স্মরণ হল, বাড়িটা দোতলা হ'লেও ছোট, সামনে এক চিলতে লন, হয়তো তার ঘাস সবুজ, হয়তো ফুল ফুটেছে গাছগুলিতে, যাদের কিছুক্ষণ আগে মনে হয়েছিল স্তূপ স্তূপ অন্ধকার, স্মরণ হল এ বাড়িটায় মহিমপুরের মাতাজী বার বছর বাস করছেন, একা ; দিনের বেলা ওখানে স্কুল বসে বোবা ও কালা একদল ছেলেমেয়ের, যারা 'আনন্দ-সঙ্ঘের' আশ্রমে পালিত, আশ্রমটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। মহিমপুরের মাতাজী, স্মরণ হল, ছেলেদের পড়ান না, তাঁর ওপর আরও অনেক, অনেক বড় দায়িত্ব, কত-বড় সঠিক কেউ জানে না। একমাত্র আনন্দ মহারাজের আদেশেই আমি এখানে এসেছি, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই, দু-বার এসেছি, গুরুর আদেশ না শুনলে আমি আসতাম না এখানে ; মহিমপুরেব মাতাজী, দীপংকর দয়াল স্মরণ করতে পারল না দেখতে কেমন, অথচ এককালে আমি তাঁকে জানতাম, অন্তত তাই তো আমার ধারণা...

বন্ধ দবজা খোলার শব্দ পেল না দীপংকর দয়াল, তাই স্ত্রীকণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। 'মাপ করবেন, আমার বড় দেরি হয়ে গেল, অনেকক্ষণ বসতে হল আপনাকে,' চমকিত দীপংকর দয়াল কণ্ঠস্বরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল মধ্যচল্লিশ এক নরমকান্তি স্ত্রীমূর্তি তার অদূরে দাঁড়িয়ে মৃদুহাস্যে কথা বলছে, যে কথাগুলি সে এইমাত্র শুনতে পেল, এবং যার অর্থ তার কাছে গোপন রইল না, যেমন রইল না আপাতবিনীত হাসির পেছনকার তীক্ষ্ণ আঘাত ; কথাগুলি সহজবোধ্য ভাষায় অনূদিত হয়ে দীপংকরের এবার কানে গেল।

সে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও নি। বলে পাঠিয়েছিলে যাতে আমি চলে যাই। চলে যাবার সময়ও দিয়েছিলে। কিন্তু যাবার উপায় আমার নেই। তোমার কাছে বড় প্রয়োজন। তাই বসে আছি তোমার অপেক্ষায়।'

বেশি কথা বলার অভ্যাস দীপংকর দয়ালের। কিন্তু এখন এতগুলি কথা সে বলল অভ্যাসের বশে নয়, না বলে তার উপায় ছিল না, বলে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করল, মনে হল ভিতরটা যেন হঠাৎ শূন্য হয়ে গেছে।

মহিলা বললেন, কণ্ঠস্বর তাঁর কঠিন, 'কেন এসেছ?'

'বলছি', ক্ষীণ স্বর দীপংকর দয়ালের। 'বলছি।'

'এতদিন পর তুমি আবার এসেছ কেন? না এলেই কি ভালো করতে না?'

'বলছি', দীপংকর দয়ালের কণ্ঠ শুষ্ক। 'তুমি না বসলে, অমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে, বলতে পারব মনে হচ্ছে না।'

মহিলা বসলেন।

দীপংকর সহজ হবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'ভালো আছ তো? অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম, তা বোধকরি পনের বছর হবে, না কি আরও বেশি, সেই যে'—

'তুমি কেন এসেছ?'

হোঁচট খেয়ে থামল দীপংকর।

'গুরুর আদেশে।'

'গুরুর আদেশে?'

'গুরুর আদেশে।'

'আনন্দ মহারাজ তোমাকে আসতে বলেছেন আমার কাছে?'

'তাঁর আদেশ ছাড়া কিছু করি না আমি।'

'আনন্দ মহারাজ বলেছেন? মুখে না পত্রে?'

'আদেশ করেছেন। একবার নয়, দুবার। তা নইলে'—

'কবে?'

'আজ। এই তো সাতটা বেজে সতের মিনিটে, তখনও আমি আপিসের কাজ শেষ ক'রে উঠতে পারি নি, জান তো আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি, মানে অনেক বড় বড় দায়িত্ব আমাকে'—

'জানি, তোমাদের সেক্রেটারি বনমালী ঝা, না? পর্শু এসেছিলেন এখানে।'

'মিঃ ঝা? এখানে? কেন?'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'কেন?'

'প্রয়োজনটা তাঁরই ছিল, আমার নয়।'

দীপংকর দয়াল চুপ হয়ে গেল।

মহিলা কথায় হেসে বললেন, 'তা হলে আনন্দ মহারাজের আদেশে তুমি এসেছ! কি আদেশ করেছেন তোমাকে?'

'তোমার কাছে আসতে।'

'শুধু আসতে?'

'তোমার সাহায্য আমার বড় প্রয়োজন।'

'কিন্তু তোমাকে আমি সাহায্য করব কেন বলতে পারো?'

'গুরুর আদেশে আমি এসেছি, একবার নয়, দু'বার'—

'চুপ করো! বুজরুকি যাদের কাছে চলে তাদের শুনিয়ো। আনন্দ মহারাজ তোমাকে বলেন নি আমার কাছে আসতে। বলতে পারেন না।'

'কেন?'

'তিনি জানেন, আমি তোমাকে কোনওদিন ক্ষমা করবো না।'

'কিন্তু পূর্ণিমা, আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নি। বরং তোমার উপকার করেছি। আনন্দ মহারাজের কাছে তোমাকে পৌঁছে না দিলে আজ তুমি এত বড় হ'তে পারতে?'

'দীপংকর দয়াল, তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকবে না। তুমি মিথ্যেবাদী এবং কাপুরুষ। জীবনে কোনওদিন সত্যের মোকাবিলা করো নি। আমার সময় নেই। তুমি কি চাও পরিষ্কার করে বলো। ধাপ্পা দিও না। ধাপ্পা দিলেই ধরা পড়বে। তোমাকে, তোমাদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

'কিদোয়াই ভবন' নিয়ে এনকোয়ারি বসবে তা জান?'

'জানি।'

'আমার ইচ্ছে ছিল না 'আনন্দ-সঙ্ঘ' এত বড় একটা বাড়ি নির্মাণের ভার নেয়। যাট লক্ষ টাকার কনট্রাক্ট!'

'মিথ্যে কথা। কনট্রাক্ট পেতে তুমি 'আনন্দ-সঙ্ঘ'কে সাহায্য করেছিলে।'

'উপায় ছিল না বলে। গণেশ মহারাজ বললেন গুরুর আদেশ।'

'তোমরা সবাই গুরুকে ভাঙিয়ে যে-যার গুছিয়ে নিচ্ছ। আনন্দ মহারাজ ব্যাপারটা জানতেনই না। আমাকে নিজে বলেছেন। গণেশ মহারাজ 'আনন্দ-সঙ্ঘ'কে বিল্‌ডিং কনট্রাক্টারস্‌এ পরিণত করেছেন। তোমাদের মত লোভী, অসৎ রাজকর্মচারীদের সাহায্যে।'

'আমার মত ছিল না। আমি জানতাম ওতে বিপদ আছে।'

'কিন্তু বাধা দাও নি। তোমাদের এই হল আসল বৈশিষ্ট্য। তোমরা বাধা দাও না। গোপনে ষড়যন্ত্র করো।'

'বাধা দিলেও গণেশ মহারাজ মানতেন না।'

'কথাটা তা নয়। তুমি যদি জানতে কাজটা ঠিক হচ্ছে না, তোমার সরাসরি বাধা দেওয়া উচিত ছিল। তুমি আনন্দ মহারাজকে জানাতে পারতে। বিপদ জেনেও, অন্যায় বুঝেও, তুমি গণেশ মহারাজকে সাহায্য করেছ তাও আমার অজানা নেই। জীবনে কম তো গুছিয়ে নাও নি। এত লোভ তোমাদের কোথা থেকে আসে?'

'গুছিয়ে নিচ্ছে না কে বলতে পারো?'

'পারি, কিন্তু লাভ নেই। তাদের সংখ্যা কমে আসছে। তোমাদের সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন।'

'এনকোয়ারিটা বন্ধ করা দরকার।'

'বন্ধ হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'না হলে অনেকের সর্বনাশ হবে।'

'তাদের মধ্যে একজন তুমি।'

'আমার সর্বনাশ'—হবে না। ক্ষতি হবে। আমি গুরুর আদেশে লক্ষ্ণৌ ফিরে যাচ্ছি। বছর খানেক পরে রিটায়ার করব। তারপর'—

'মন্ত্রী হবার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগবে। তোমার প্ল্যান আমার অজানা নেই।'

'রাজনীতি করতে গেলে'—

'এনকোয়ারির কাদা তোমার গায়ে লাগলে ক্ষতি হবে, এই তো?'

'তুমি সব কিছু বড় তাড়াতাড়ি বোঝ।'

'পনের বছর তোমাদের দেখে আসচি। তোমরা মুখ না খুলতে তোমাদের কথা আমি শুনতে পাই।'

'ক্ষতি তোমার হবে না? 'আনন্দ-সঙ্ঘে'র নামে কালি পড়লে সে কালি লাগবে না তোমার গায়ে? লোকে তোমাকে পবিত্র মাতাজী বলে জানে'।

'আমার আবার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? আমার যা ক্ষতি হবার সতের বছর আগে হয়ে গেছে।'

'কিন্তু তোমার এই পনের বছরের সুনাম, প্রভাব, ক্ষমতা?'

'দীপংকর দয়াল, সারাটা জীবন রাজনৈতিক নেতাদের দালালি ক'রে তোমার মন ব'লে কিছু আর নেই। তুমি এসব বুঝবে না। আমি চেষ্টা করছি তোমার ওপর না রাগতে, শত হলেও তুমি আনন্দ মহারাজের শিষ্য।'

'সে ভরসাতেই তোমার কাছে আসা।'

'লাভ নেই। আমি আনন্দ মহারাজকে বলেছি এনকোয়ারি হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'আনন্দ-সঙ্ঘ'কে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে বড় রকমের একটা পার্জ দরকার। লোকেদের জানা দরকার কতগুলি দুষ্টু মানুষ সঙ্ঘের ভেতরে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছিল, এবং সঙ্ঘকে তার স্ব-নির্বাচিত সৎ-সেবার পথ থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল। তাদের ছাঁটাই ক'রে 'আনন্দ-সঙ্ঘ' নিজের পথে ফিরে এসেছে। তুমি শুনে খুশি হবে, আনন্দ মহারাজ আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।'

'এনকোয়ারি তাহলে হবে?'

'হবে।'

'এ ব্যাপারে আমার অংশ সামান্যই ছিল। আমাকে তুমি চেষ্টা করলেই এ ব্যাপারটা থেকে সরিয়ে আনতে পার।'

'একেবারে সামান্য ছিল না। লক্ষ্ণৌতে তোমার বাড়িটা প্রায় বিনি পয়সায় তৈরি করে নিয়েছ।'

'মোটেই নয়। তিপ্পান্ন হাজার টাকা খরচ হয়েছে আমার।'

'দেড় লাখ টাকার বাড়ি পেয়েছ তিপ্পান্ন হাজারে।'

'মিথ্যা কথা।'

'যাই হোক, আমি তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবো না।'

'কেন?'

'ইচ্ছে নেই। কারণ নেই।'

'একটা মানুষের বিপদে তোমার সহানুভূতি হবে না?'

'তোমার বিপদে আমার সহানুভূতি হবার কথা নয়।'

'তুমি অন্যায় করছ আমার ওপর।'

'তুমি যে-অন্যায় আমার ওপর করেছিলে তার তুলনায় কিছু নয়।'

'বাধ্য হয়েছিলাম।'

'তোমার বড় সহজে বাধ্য হয়ে পড়ো। তোমাদের না আছে আত্ম-প্রত্যয়, না আত্ম-সম্মান, না দায়িত্ববোধ। স্বার্থ তোমাদের বড় সহজে সব কিছু করতে বাধ্য করে।'

পূর্ণিমার চোখে-মুখে বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল। দীপংকর দয়াল চুপ ক'রে রইল।

পূর্ণিমা পুনরায় বলতে লাগলেন : 'তোমার স্মৃতিশক্তি এককালে খুব প্রখর ছিল। এখনও আছে কি?'

দীপংকর দয়াল বিষণ্ণ চোখে তাকাল।

'যদি থাকে তবে তুমি নিশ্চয় ভুলে যাও নি। যে মন্ত্রীর হয়ে তুমি আমার কাছে

প্রথম এসেছিলে, তাকে তুমি নিশ্চয় ভালো করে জানতে। প্রতিবাদ করো না। তুমি একটু বেশি বক-বক করো, কিন্তু মানুষটা তুমি বোকা নও, বরং খুব ধূর্ত। আমার বাবাও তাই বলতেন। ওকালতি ক'রে তোমার যখন পয়সা হয় নি, তখন তুমি বাবার একটা উপকার করেছিলে, যদি ভুলে না গিয়ে থাকি, এক প্রকাশক তাঁকে দারুণ ঠকাচ্ছিল, তুমি মামলা ক'রে বাবার বই চুরি ক'রে ছাপা বন্ধ করেছিলে। তাঁকে কিছু অর্থও পাইয়ে দিয়েছিলে। এ জন্যে তুমি ফী নাও নি, গরিব অধ্যাপকের প্রতি তোমার শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে ফী-না-নেওয়াটা জাহির করেছিলে। আসলে তোমার নজর ছিল অধ্যাপকের সুন্দরী মেয়ের ওপর, তা কি তোমার মনে আছে, দীপংকর?'

দীপংকর দয়াল আর্ত চোখে তাকিয়ে রইল।

'তার সঙ্গে ভাব-জমাবার চেষ্টার তুমি ত্রুটি করো নি। সে তোমাকে নিয়ে বেশ মুশকিলে পড়েছিল। একদিকে আকর্ষণ, অন্যদিকে বিকর্ষণ। তোমার মনোযোগে তার মন নরম হয়েছিল কিন্তু তোমাকে কিছুতেই পুরো বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারে নি। তার বাবাও তোমাকে নিয়ে দোমনা ছিলেন। কখনও বলতেন, দীপংকর দয়াল ছেলেটি ভালো, দেখছিস না পুরানো মাস্টারমশাই বলে এখনও আমাকে খাতির করে, হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করে? আবার অন্য সময়ে বলতেন, লোকটা বোধহয় অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ধূর্ত, যা সব শুনতে পাই মাঝে মধ্যে! কি শুনতে পান বলতেন না, মেয়ে জানতেও চাইত না। আসলে মেয়েটা ছিল লোভী আর দুর্বল, এক পাল ভাইবোন ও একশ পঁয়ত্রিশ টাকার অধ্যাপক বাপ, এর মধ্যে যুবতী মেয়ে, তার রক্তে লোভ হবে, বুকে দুরাশা, তাতে আশ্চর্য কি? সে লোভ, দুর্বলতা আর দুরাশার সুযোগ নিয়ে লোকটা তার সর্বস্ব লুটে নেবে, তাতে বা অবাক হবার কি থাকতে পারে? কি বল, দীপংকর দয়াল?'

দীপংকর দয়াল বুঝতে পারল তার বাথরুম যাবার দরকার। অথচ বলতে পারল না। উঠতে পারল না।

পূর্ণিমা বললেন, 'হঠাৎ তোমার ভাগ্য বদলে গেল, তুমি রাজানুগ্রহ লাভ করলে। মন্ত্রীদের সঙ্গে তোমার দারুণ খাতির জমে উঠল বছর খানেকের মধ্যে। এত দিনের ওকালতিতে যা ক'রে উঠতে পারো নি, রাতারাতি নিজের ভাগ্য গুছিয়ে নিতে উঠে প'ড়ে লেগে গেলে। আমি তখনও জানি, একদিন, খুব দেরি নেই সেদিনের, তুমি আমাকে বিয়ে করবে। একটা না একটা অজুহাতে তুমি অবশ্য বিয়ের ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে লাগলে। তারপর বাবা একদিন টুপ ক'রে পটল তুললেন। তুমি আবার পরম উপকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে। আমাকে বললে, একজন মন্ত্রীর কাছে আমার চাকরি হ'তে পারে। প্রাইভেট সেক্রেটারি, বিশেষ কিছু কাজ নেই, মন্ত্রীকে

দেখা-শোনা করা, তাঁর আপিস সুন্দর সুঠাম রাখা। মাইনে যা বললে, আমার পক্ষে তখন তা বিয়ের চেয়েও লোভনীয়। মন্ত্রী যে রাজা সরযূপ্রসাদ, সে কথা কিন্তু ভাঙলে অনেক পরে, যখন চাকরির জন্যে আমার মন স্থির, চাকরির ভরসায় আমার ভাইবোনেরা স্কুল-কলেজ ছাড়ল না।'

দীপংকর দয়াল উঠে দাঁড়াল।

'তুমি যাচ্ছ? বেশ, যাও। আর একটু শুনে যাও। মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি যখন তাঁর সেবাদাসীতে পরিণত হল,—বলেছি তো মেয়েটা ছিল লোভী আর দুর্বল—এবং একদিন পেটে তার বাচ্চা এল, তুমি আবার পরম উপকারীর ভূমিকায় উপস্থিত হলে। পৌঁছে দিলে তাকে আনন্দ মহারাজের কাছে। সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা। তারপর আজ তুমি তারই কাছে সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্যে এসে দাঁড়িয়েছ। বয়স তোমার সাতান্ন, একবছর পরে অবসর নেবে, তবু উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, আরও ক্ষমতা চাও, অর্থ চাও, প্রতাপ চাও। তুমি বারবার অনেক উপকার করেছ আমার, আমিও তোমার উপকার করেছি, দীপংকর দয়াল। বনমালীশংকর ঝা-র হাতে কিদোয়াই ভবন সংক্রান্ত সব কাগজপত্র কাল আমি তুলে দিয়েছি। তার মধ্যে তোমার বিষয়ে যা আছে, তার ফলে তুমি ভালয় ভালয় রিটায়ার করতে পারো কি না দেখ, মন্ত্রিত্বের স্বপ্ন তোমাকে আর দেখতে হবে না।'

দীপংকর দয়াল বলে উঠল, 'বাথরুমটা কোনদিকে?'

'এবাড়িতে পুরুষের জন্যে বাথরুম নেই।' কঠিন কণ্ঠে বললেন পূর্ণিমা। 'এবারে তুমি আসতে পারো।'

রাত প্রায় একটার সময় দীপংকর দয়াল ওয়েলেস্‌লি রোডে তার ফ্ল্যাটের বেল টিপল। দরজা খুলেই ধর্মপত্নী নন্দরাণী বুঝতে পারল, পতির হুঁশ নেই। শাড়ির আঁচলে নাক চেপে, দীপংকরকে ধরল নন্দরাণী, মুখে রামনামের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে গালি দিতে দিতে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। দীপংকর দয়ালকে দেখাল নিদ্রালু নির্জীব বৃদ্ধের মত, মুখে কথা নেই, হুঁশ নেই। নন্দরাণী তার জুতা খুলল, মোজা খুলল, শার্ট প্যান্ট খুলল। আন্ডারওয়ার খুলছে, এমন সময় দীপংকর দয়াল নির্জীব বেহুঁশ অবস্থাতেই গল গল বমি ক'রে ফেলল। নন্দরাণী 'হে রাম, হে রাম' বলতে বলতে রান্নাঘরে গিয়ে জল আর ন্যাকড়া নিয়ে এল, পরিষ্কার করল বমি, দীপংকর দয়ালের গা মুখ চোখ ধুয়ে দিল। এতক্ষণে দীপংকর দয়াল কথা বলল, টেনে টেনে :

'কে তুমি?'

'শুয়ে পড়!'

'ও তুমি নন্দরাণী! মহিমপুরের মাতাজী কোথায় গেল? শালা বজ্জাৎ বেইমান আওরৎ! কোথায় গেল সে?'

'বোকা না, শুয়ে পড়ো।'

'নন্দরাণী, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমাকে আমি মন্ত্রীপত্নী করতে পারব না।'

'শুয়ে পড়ো।'

'ও মাগীকে আমার খুন করা উচিত ছিল।' বলেই দীপংকর দয়াল হঠাৎ থেমে গেল, নেতিয়ে পড়ল বিছানায়।

নন্দরাণী স্বামীকে ঠিক করে শুইয়ে দিল। গা ঢেকে দিল কম্বলে।

তারপর স্নানের জন্যে বাথরুমে ঢুকল।

সাতটার সময় পরশরাম ঠাকুর কৃষি-ভবন থেকে বার হল নিজের পনের বছরের পুরানো হারকিউলিস্ সাইকেলে চেপে। সাইকেলের প্যাডেলটা কাল থেকে ভালো চলছে না, চেন বদলান দরকার, অথচ এ মাসে বাড়তি খরচটা কোনওমতে এড়িয়ে যেতে পারলে ভালো হয়। পরশরাম সাইকেলে উঠে দেখল, বেশ জোরে প্যাডেল না করলে সাইকেল চালান সম্ভব হবে না। জোরে প্যাডেল করতে গিয়ে দেখল হাঁপিয়ে পড়ছে বড় সহজে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিপ্পান্ন বছরের রাজপুতের এভাবে হাঁপিয়ে পড়া উচিত নয়, 'ঠাকুর সাহেব,' সে নিজেকে উদ্দেশ ক'রে বলল, 'এ ঠিক নেহি হ্যায়।' চোখের সামনে ভেসে উঠল সাতটি সন্তানের মুখ, এবং তাদের জননীর। হঠাৎ একটা দোতলা বাস এসে পরশুরামের সামনে পড়ল, সে কষ্ট ক'রে সামলে নিল সাইকেলটা, নিতে গিয়ে দেখল ব্রেকটাও পুরো ঠিক নেই। পনের বছর বয়স হয়েছে সাইকেলটার, মনে পড়ল, সেকশন অফিসর হবার দু বছর আগে এটা কেনা হয়েছিল তৃতীয় সন্তান জগ্‌মোহনের জন্মের পরেই। 'যেমন মালিক, তেমনি সাইকেল,' মনে মনে বলল পরশরাম, 'দম ফুরিয়ে এসেছে দুজনারই।' সোজা বাড়ি চলে গেলে ভালো হ'ত, ছোটমেয়েটার জ্বর দেখে এসেছে সকালে, চারদিন থেকে চলছে জ্বরটা, সকালে গায়ে হাত দিয়ে মনে হল একশ'র কম নয়, সর্দিজ্বরই হবে, তবু বলা যায় না, যা টাইফয়েড হচ্চে এক বছর দিল্লিতে। বাড়ি যাবার আগে গোলমার্কেট পাড়ায় যেতেই হবে একবার, সে পথেই চলছিল পরশরাম ঠাকুর, নিকলসন স্কোয়ারে যেতেই হবে একবার। প্রথম মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে ফতুর হয়ে গেছে পরশরাম, আরও তিনটি মেয়ের বিবাহ কি ক'রে দেবে, আদৌ দিতে

পারবে কি না, এ চিন্তা ওকে এখন প্রায়ই পেয়ে বসে। সমস্যা বর্তমানে দ্বিতীয় কন্যা সীতাকে নিয়ে, ম্যাট্রিক ফেল ক'রে আর সে স্কুলে যায়নি, বাইশ বছর বয়স হয়েছে, তার বিয়ে না দিলেই নয়। অথচ কি ক'রে যে বিয়ের খরচ সংগ্রহ হবে ভগবানও বোধকরি জানেন না। সীতার মা প্রায়ই ঘ্যান ঘ্যান করছে অতবড় মেয়েকে বছরের পর বছর ঘরে বসিয়ে রাখা নিয়ে, 'তারপর যদি কিছু একটা হয়ে বসে, তখন তুমি কি করবে?' আরে, আমি এখনই বা কি করতে পারছি, বলো? সাইকেলটাই কি সারাতে পারছি? সব কেটে-কুটে পাঁচশ' বত্রিশ টাকা মাইনে মাসকাবারে, পনের দিন পর তার চিহ্ন পর্যন্ত উধাও হবার যোগাড়! দাম বাড়ছে সব কিছুর হু হু করে, সেদিন মেয়েদের জন্যে একটা সাবান কিনতে গিয়ে দেখি এক টাকা দাম, তিন মাস আগেও ছিল সত্তর পয়সা। একমাত্র সম্বল প্রভিডেন্ট ফান্ড, সেখান থেকে ধার ক'রে বিয়ের খরচ মেটান এ বাজারে অসম্ভব। বরের পিতাদের লোভ যা বেড়ে গেছে! 'ছেলেগুলি উপযুক্ত হলেও না হয় কথা ছিল,' পরশরাম ভাবল, 'ওদের এক একটাকে বিয়ে দিয়ে যা ঘরে আসত, তা-দিয়ে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যেত।' কিন্তু দু' মেয়ের পর, প্রথম ছেলে, কৃষ্ণমোহন, এই মাত্র কলেজে ঢুকল, তিন বছর লাগবে তো বি. এ. পাস করতেই। আর দুটো তো এখনও স্কুলে! 'ছেলে তিনটাকে বন্ধক রেখে কিছু টাকা পেলে মন্দ হত না,' পরশরাম রসিকতা করল নিজের সঙ্গে, 'কিন্তু হবার জো নেই। যা সব ছেলে হয়েছে, একশ' টাকাও পাওয়া যেত না এক একটার পেছনে।'

নিকিলসন স্কোয়ারে চৌদ্দ নম্বর খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। দরজার সামনে সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে দম নিল পরশরাম ঠাকুর। সাইকেলে তালা মারল। তারপর বারান্দায় উঠে বন্ধ দরজায় শব্দ করল।

পাকাচুল পাকাদাড়ি একজন দরজা খুলল, 'কাকে চাই?'

'প্রেমসাগর মেহ্তাজি আছেন? আমার নাম পরশরাম ঠাকুর।'

'আসুন, ভেতরে আসুন। বসুন। আমিই প্রেমসাগর মেহ্তা।'

গদগদ হয়ে পরশরাম বলল, 'নমস্তে, আমার চিনতে পারা উচিত ছিল, মার্জনা করবেন। যা শুনেছি তাই, আপনাকে দেখেই মনে হয় পবিত্র, শুদ্ধচিত্ত মানুষ আপনি, আনন্দধামের লোক আপনি।'

প্রেমসাগর মেহ্তা গম্ভীর মুখে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমি অতি নগণ্য লোক, কীটের অধম। তা কি প্রয়োজন আপনার এই দীনদরিদ্র হীনের কাছে?'

'আপনার মাহাত্ম্যের কথা কে না জানে, মেহ্তাজী? রাজস্থানের এমন আদমি দিল্লি শহরে নেই যে আপনার গুণগান না করে। আমি অনেক দুঃসাহস ক'রে আপনার মত শুভাত্মার কাছে হাজির হয়েছি। আপনাকে একখানা কার্ড লিখেছিলাম।'

'ও, মনে পড়েছে। আপনি আমার পুত্র প্রতাপসাগরের সঙ্গে আপনার গুণবতী রূপবতী সুকন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন।'

'আজ্ঞে, ঠিক তাই। এ বয়সেও আশ্চর্য স্মরণশক্তি আপনার। শতসহস্র চিঠির মধ্যে আমার পত্রখানাও মনে রেখেছেন।'

'শতসহস্র না হলেও, প্রস্তাব এসেছে অনেকগুলি।'

'তা তো আসবেই। এমন পুণ্যবান সুপুত্র আপনার, এমন মহান তার পিতৃদেব, এমন গৌরবান্বিত আপনাদের বংশ। অনেক দুঃসাহস করেই পত্রখানা আপনাকে লিখেছিলাম। এখন আপনার সুমুখ থেকে যদি করুণা-বাণী শুনতে পাই...'

'আপনার কন্যার কথা কিছু বলুন।'

'আজ্ঞে, দীনহীন দরিদ্র পিতার ঘরে জন্ম নিলেও আপনার পুত্রবধূ হবার যোগ্যতা তার আছে। এই শ্রাবণে আঠার'য় পড়েছে। নিজের মেয়ে, বললে ভালা শোনাবে না, অতি নম্র স্বভাব, অমন বাধ্য মেয়ে আজকাল সচরাচর চোখে পড়ে না। বি. এ. পড়ছে, মানে আজকাল কলেজে পড়াতেই হয়, ছেলেরা শিক্ষিত মেয়ে চায়, কিন্তু মনে-প্রাণে সে একেবারে গৃহলক্ষ্মী। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, মা-র ছায়ার মত পেছন পেছন কাজ ক'রে বেড়ায়। রান্না বলুন, ঘর দুয়ার পরিষ্কার রাখা বলুন, ভাইবোনদের দেখাশোনা বলুন, সবই তার হাতে। গাল দিলেও উচ্চবাক্য উচ্চারণ করে না, মাথা নিচু করে থাকে। দেব-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি। প্রতি মঙ্গলবার হনুমানজির-মন্দিরে পূজা দিতে যায়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে পিতামাতার পদধূলি নিয়ে দিন শুরু করে।'

'বয়স কত বললেন, উনিশ?'

'আজ্ঞে না তো! মাত্র আঠারোয় পড়েছে।'

'বি. এ. পড়ছে?'

'মানে কলেজে ভর্তি হয়েছে।'

'কো-এডুকেশনের কলেজে?'

'আজ্ঞে না, না। আমার মেয়ে যাবে ছেলেদের সঙ্গে একত্র কলেজ করতে? একেবারে মেয়েদের কলেজ। 'মাতাসুন্দরী কলেজে'র নাম শুনেছেন নিশ্চয়?'

দরজার ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এল : 'পাড়ার ছোকরাদের সঙ্গে মেলামেশা করে না তো?'

হাতজোড় ক'রে পরশরাম ঠাকুর বলল, 'নমস্তে বহিনজি নমস্তে। ও রকম মেয়েই নয় আমার। আমি দীনহীন, কিন্তু আমার পূর্বপুরুষদের মান-মর্যাদা ছিল বিস্তর, জায়গীর ছিল রাজা মানসিংহের আমল থেকে। এখনও উদয়পুরের সিংহগড় গ্রামে এককথায় সবাই আমাদের চেনে। যদিও আপনাদের কাছে আমরা কিছুই নই,

তবু আমরা আমাদের হিন্দুধর্ম ও সংস্কার পুরোপুরি মেনে চলতে চেষ্টা করি। এমন পবিত্র শিশুর মত সরল মেয়ে আপনি সহজে দেখতে পাবেন না।'

প্রেমসাগর মেহ্‌তা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে বিদেশে বাস করে। উগান্ডায়। নাম শুনেছেন? পূর্ব আফ্রিকায়। সেখানে তার বিরাট ব্যবসা। ওখানকার লোকেরা তো এখনও অসভ্য, ইংরেজ আর ভারতীয় ব্যবসায়ীরাই ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে রাখছে। আপনার কন্যার বিদেশে বসবাস করতে সম্মতি আছে তো?'

'সে রকম কন্যাই নয়, মেহ্‌তাজি, আমরা তার যা ব্যবস্থা করব হাসিমুখে সে তাই মেনে নেবে। বিদেশে বসবাস তো উত্তম প্রস্তাব, এদেশে যা লোকের চাপ বাড়ছে, বুঝলেন কি না, আমি তো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সেকশন অফিসর, অনেক কিছুই আমরা জানি যা জনসাধারণ জানতে পারে না, আমাদের গভর্নমেন্ট তো পপুলেশন প্রব্লেম নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত।'

'আপনার সন্তান ক'টি?'

'আজ্ঞে, আটটি। আমরা চৌদ্দ ভাই-বোন ছিলাম। পরিবার বড় না হলে সন্তানরা স্বার্থপর, বিলাসী হয়ে ওঠে।'

'পুত্রের বিবাহ দিয়ে অর্থ সংগ্রহের প্রবৃত্তি আমার নেই। আমি দরিদ্র মানুষ, তা বলে লোভী নই। একমাত্র যেটুকু দরকার তার ওপরে আমি এক পয়সাও চাই না।'

'একথা জানি বলেই তো দুঃসাহস ক'রে আপনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি।'

'কত ব্যয় করবেন আপনি কন্যার বিবাহে?'

'আজ্ঞে, দিনকাল যা পড়েছে, সব কিছু অগ্নিমূল্য, সেভিং তো কিছু নেই, তথাপি আপনাদের প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করব।'

'বিবাহের খরচ এবং পুত্র ও পুত্রবধূর উগান্ডা যাবার ভাড়া বাবদ সাত হাজার টাকা নগদ আমার দরকার হবে। ত্রিশ ভরি সোনার গহনা দেবেন, তার বেশি আমি চাইব না। আসবাবের মধ্যে পালংক, সোফা-সেট...'

দরজার ভেতর থেকে সংযোগ এল, 'ড্রেসিং টেবিল, গদরেজের আলমারি।'

প্রেমসাগর মেহ্‌তা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'এ যৎসামান্য ব্যয়ে আপনার সম্মতি আছে তো?'

পরশরাম ঠাকুর মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলে, পনের হাজারের ধাক্কা। সীতার মা-র বাকি সব গহনা কেড়ে নিলেও—। মাথাটা ঘুরে উঠল। ইষ্টনাম স্মরণ করে বলল, 'যদি অপরাধ না নেন, একটা প্রশ্ন করি।'

'করুন।'

'আপনার সুপুত্র বিদেশে বসবাস করে। এত সব ফার্নিচার কি হবে?'

'বিবাহটা তো পুত্রের একার নয়। সমস্ত পরিবারের। আমি মর্ডান নই, সনাতন হিন্দু। হিন্দুধর্মে কেউ কেবল নিজের জন্যে নয়, প্রত্যেকে পরের জন্যে। কথাটা বুঝতে পেরেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বিলক্ষণ। তা কবে আপনারা মেয়ে দেখতে চান?'

'কন্যা পছন্দ হ'লে, আমি যা বললাম তাতে আপনার সম্মতি আছে?'

'আপনি মহাপ্রাণ হৃদয়বান ব্যক্তি, আপনার কথার অমর্যাদা করার সাধ্য আমার নেই।'

'উত্তম। আগামী রবিবার সকাল দশটায় আমরা আপনার মেয়েকে দেখতে যাব। আপনার কোঠি তো নেতাজী নগরে? ঠিকানাটা আছে, আবার দিতে হবে না। এ পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী যাতায়াতের গাড়ি-ভাড়া আপনাকে বহন করতে হবে।'

'অবশ্য, অবশ্য, অবশ্য। এ তো আনন্দের কথা। আপনার সুপুত্রও আসবে আশা করছি।'

'যদিও এ কাজের দায়িত্ব সে সম্পূর্ণ আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছে, তাকে সঙ্গে নিয়েই যাবো। আমরা বোধহয় ছ'সাতজন যাবো। দুখানা ট্যাক্সি লাগবে।'

'আজ্ঞে, যদি আমি গাড়ির ব্যবস্থা করি?'

'আপনার গাড়ি আছে?'

আমার গাড়ি তো ঐ সাইকেল! পনের বছরের পুরনো। বন্ধুবান্ধব কারুর গাড়ি।'

'আপত্তি নেই। একটায় চাপাচাপি হবে। দুখানার ব্যবস্থা করবেন।'

'আজ্ঞে, তাহলে আমি এখন আসি। রবিবারে আপনাদের প্রতীক্ষা করব।'

'একটু চা—'

'এখন আর নয়। বহুদূর যেতে হবে। আর একদিন এসে বহিনজীর হাতে রান্না অমৃত ভক্ষণ করে যাবো।'

সাইকেলে চ'ড়ে জোরে জোরে প্যাডল করতে করতে পরশরাম ঠাকুর অনুচ্চারে বলল, শালা হারামজাদা, পিশাচ, হারামির বাচ্চা। সাত হাজার টাকা নগদ, ত্রিশভরি সোনা, দুহাজার টাকার ফার্নিচার। আবার বলে কি না, আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। যে সম্বন্ধটা এনেছিল, বলেছিল পুত্রের পিতা গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী, পূজা-অর্চনাতেই সময় কাটায়, অতি সৎ ও নির্লোভ মানষ। তার প্রমাণ পাওয়া গেল অক্ষরে অক্ষরে। ব্যাটা বহিনচোৎ। বলে কিনা আমার ছেলের বিরাট ব্যবসা। আমি কি খোঁজ নিই নি ভেবেছিস তুই? আমার কি কোনও কানেকশন নেই? জে. এস-ট্যু কাম্পালায় গিয়েছিল টেকনিক্যাল মিশনের সঙ্গে, তাকে দিয়ে খোঁজ করাই নি?

ছেলেটা তো গুজরাটি এক ব্যবসায়ীর দোকানে চাকরি করে, পাঁচশ টাকা মাইনে, বিদ্যায় বি. এ. ফেল, দেশে চাকরি-বাকরি না পেয়ে এক গুজরাটি বন্ধুর সঙ্গে চলে গেছল উগান্ডা। তা ভালোই করেছে!

তুই যেমন মিথ্যেবাদী আমিও মিথ্যেবাদীর বাপ! দশটা মেয়ে দেখেছিস, তাও জানি, কাউকে পছন্দ হয়নি বলে বেড়াচ্ছিস, আসলে কেউ তোর লোভ মেটাতে পারে নি। টাকাটা যোগাড় করতে পারলে বিয়েটা বোধকরি হয়ে যায়। কিন্তু আসবে কোথা থেকে? প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে হাজার পাঁচেক, বড় জোর ছ' হাজার, লাইফ ইনস্যুরেন্স পলিসির ওপর ধার পাওয়া যাবে হাজার দু-এক, ব্যাংকের ম্যানেজারকে ধরে পড়লে আরও দু'হাজার। তবু তো অনেক বাকি! বাজারে আর কতোই-বা ধার-দেনা পাওয়া যায়। একমাত্র সম্বল গ্রামের কিছু জমি, এবার তাও বেচতে হবে হারামজাদার দাবি মেটাতে। তারপর আরও দুটো মেয়ে আছে, তাদের কপালে কি হবে ঈশ্বর জানেন। এমন শালার চাকুরি যে এক পয়সা উপরি রোজগার নেই। চাপরাশিরাও ওভারটাইম পায়। ইউ-এস থেকে সেক্রেটারি চাই কি মন্ত্রীদের, উপরির পথ খোলা। টাকা না হয় নাই নিল, আজ বিদেশে যাচ্ছে, কাল ছেলের চাকরি করে নিচ্ছে, পরশু জামাইয়ের প্রমোশন। টাকাই বা কম নিচ্ছে নাকি কেউ কেউ? দীপংকর দয়ালের কথা তো সবাই জানে। 'কিদোয়াই ভবন' তৈরিব কনট্রাক্ট পেল 'আনন্দ-সঙ্ঘ' কার সাহায্যে? আর কার টাকায় তৈরি হল দীপংকর দয়ালের বাড়ি লক্ষ্ণৌতে? এবার শুনেছি শালা ফেঁসে গেছে। তা তোরা না হয় কবে নিচ্ছিস, করে যা, আমাদের মতো গরিবদেরও দে ছিটেফোঁটা? মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না টাকার অভাবে, পাইয়ে দে না দু-দশ হাজার। অন্তত ওভারটাইমটা তো দে। এই যে রোজ পাঁচটার পরেও দু তিন ঘণ্টা দপ্তরে বসে থাকতে হয় তার জন্যে দিস তোরা একটা বাড়তি পয়সা? তোরা গাড়িতে আসিস, গাড়িতে যাস, বোম্বাই-মাদ্রাজ-কলকাতা করিস এরোপ্লেনে, সিগারেট খেয়েই ফুঁকে দিস একশ' দেড়শ' টাকা মাসে। আর আমাদের দশাটা দেখ তো তাকিয়ে! সাইকেলটা মেরামত করব তার পয়সা নেই। বাস-ভাড়া বাঁচাতে গিয়ে এই তিপ্পান্ন বছর বয়সে রোজ দশ-বারো মাইল সাইকেল করছি। তার ওপর মেয়ের বিয়ে, আর শালা হারামজাদা ছেলের-পর লকলকে লোভ। সরলা-শুকদেবকে মনে পড়ল পরশরামের। ছুকরিটা নিজেই নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছে। কত ছেলেকে এর আগে ধরেছে তার ঠিক কি? তবু ভালো, শেষ পর্যন্ত একটা কব্জা করছে। অবশ্য বিয়ে না হওয়া তক বিশ্বাস নেই। এর মধ্যে কি করছে না করছে ঈশ্বর জানেন। শুনি রোজ অনেক রাত পর্যন্ত একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। না করেই বা উপায় কি? সরলার মা-র সাধ্যি আছে মেয়ের বিয়ে

দেয়? ঘর-বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে না শালাদের খাঁই মেটাতে?

বাসায় পৌঁছতে ন'টা বেজে গেল। ঘরে ঢুকতে মনে পড়ল মেয়েটার জ্বর যাচ্ছে ক'দিন ধরে। জামা ছাড়তে ছাড়তে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল 'মুন্নার জ্বর সেরেছে?'

'না। তবে আজ একটু কমের দিকে।'

'ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'এই তো ঘুমল।'

পাশের ঘরে ছেলেমেয়েগুলি বাপ বাড়িতে ঢুকতেই চুপ হয়ে গেছে। তিন ঘরের ফ্ল্যাট, এক ঘরে পরশরাম ঠাকুর, তার স্ত্রী ও ছোটমেয়ে এবং তার আগের ছেলেটা শোয়। মাঝের ঘরটায় কেউ শোয় না, ওটা বসবার ঘর, অতিথি এলে খাট পেতে শুতে দেওয়া হয়। তৃতীয় ঘরে থাকে সীতা দুই ভাইবোনকে নিয়ে। পেছনের দিকে বারান্দা। ঘর হিসেবে ব্যবহার করে বড়ছেলেটা। ওখানেই খাবার টেবিল, চারখানা চেয়ার। বেনিয়ান ছাড়তে গিয়ে পরশরাম বলল, 'হংসরাজ কই? গলা শুনছি না যে?'

'সিনেমায় গেল বন্ধুদের সঙ্গে', স্ত্রী জবাব দিল।

'সিনেমায়? পড়াশোনার নাম নেই, রোজ সিনেমা। টাকা পেল কোথায়?'

'দিতে হল।'

'মাথা খাচ্চ তুমি ওর,' চেঁচিয়ে উঠল পরশরাম, 'এর পর দেখবো পকেট কেটে জেলে যাবে।'

'বিশ্বনাথ চাইলে তাই হবে। খাবে এসো।'

ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়ে গেছে। পরশরাম হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসল আটার রুটি, ঢেঁড়সের তরকারি, আচার।

খেতে খেতে বলল, 'হয়ে এলাম ওখান থেকে।'

'কি বলল?'

'রবিবার আসবে সীতাকে দেখতে। ট্যাক্সি-ভাড়া দিতে হবে আমাকে। দু'খানা ট্যাক্সি। মানে ত্রিশ টাকার ধাক্কা।'

'দাবি-দাওয়া?'

'সাত হাজার নগদ, ত্রিশ ভরি সোনা, হাজার দুই টাকার ফার্নিচার।'

'হে বিশ্বনাথ!'

'বিশ্বনাথ-টাথ কিছু নেই। আছে হারামজাদা ছেলের বাপ আর অসহায় মেয়ের বাপ।'

'এত টাকা কোথায় পাবে?'

'জমিটা বেচে দেব। মেয়েটাকে তো আর ঘরে রাখা যাচ্ছে না।'

গলা নামিয়ে স্ত্রী বলল, 'ছোঁড়াটা ভীষণ পেছনে লেগেছে।'

'অন্যকে দোষ দেবার আগে নিজের মেয়েকে সামলাও। তোমার মেয়ে সুবিধার নয়। আমি সব জানি, সব দেখি, মুখে কিছু বলি না। বলার সাহস নেই। কখন হয়তো বলে বসবে, বিয়ে দেবার মুরোদ নেই, নিজে বিয়ে করব তাতেও বাধা। ছেলেটা রাজপুত হলেও কথা ছিল না। হোক না নিচু জাত, দিয়ে দিতাম ঝুলিয়ে। পঞ্জাবি সর্দার, মোটরগাড়ি মেরামত করে, একেবারে নিরক্ষর।'

'সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি।'

'না এভাবে তো চলতে পারে না, কখন কি একটা বিপদ ঘটবে। দেখি এ বিয়েটা হয় কি না।'

খাওয়াটা শেষ হলে পরশরাম হিসাবের খাতা নিয়ে বসল। দিনের হিসাব লিখল স্ত্রীকে প্রশ্ন করে। ছ'টাকা তিরাশি পয়সা খরচ। মাসের তহবিলে আর পঞ্চাশ টাকাও নেই। মাসের আজ মাত্র আঠার দিন।

এবার ছেলেমেয়েদের ডাক পড়ল। হংসরাজ নেই, প্রথমে এল অনীতা, তারপর গজেন্দ্ররাজ, তারপর মীরা, সমর, সবার শেষে সীতা। সীতা দাঁড়াল সবার পেছনে, দূরে। বাপ একসঙ্গে কদাচ সবাইকে ডাকে, সবার মনে ভয়, কি জানি কি ঘটেছে আজ, বকুনি খেতে হবে বুঝি। সন্তানরা বাচ্চা থাকলে পরশরামের আদর-আহ্লাদ পায়, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে যায়, পরশরাম আর ওদের সঙ্গে মিশতে পারে না। রোজ সন্ধ্যাবেলা স্কুলে-যাওয়া ছেলেমেয়েদের পড়া দেখতে বসে পরশরাম, বসে বসে ঝিমোয়, ছেলেমেয়েরা টেপাটেপি হাসে, কখনও বা হোম ওয়ার্ক করা হয় নি দেখে রেগে যায় পরশরাম, গালমন্দ করে, কদাচিৎ মারে। বড় হয়ে গেলে ছেলেমেয়েদের কেমন যেন ভয় করে চলে পরশরাম, সামনা-সামনি বকতে পারে না, এড়িয়ে চলে, গাল-মন্দ বকাবকি করে আড়ালে, ওদের মা-র কাছে, অথবা নিজের কাছেই, মনে মনে। সবচেয়ে ভয় করে পরশরাম বড়ছেলে হংসরাজকে এবং এখনকার বড়মেয়ে সীতাকে, তাদের সঙ্গে কদাচিৎ কখনও কথা বলে, তাদের এড়িয়ে চলে। আজ এখন সবাইকে একসঙ্গে ডাকাটা অতএব পরশরামের পক্ষে অস্বাভাবিক, ছেলেমেয়েদের পক্ষেও।

কারুর মুখের ও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা অনভ্যাস পরশরামের, কথা বলার সময় সে হয় তাকায় মাটির দিকে, নয় জানলার বাইরে, নয় কড়িকাঠে। এখনও ছেলেমেয়েদের একত্র ক'রে পরশরাম কথা বলল মাটির ওপর চোখ রেখে, গোঁফের প্রান্তচুলগুলি ডান হাতের আঙুলে নাড়তে নাড়তে। প্রভুত্ব দেখাবার এই একমাত্র পন্থা পরশরামের, দফতরে অথবা গৃহে, গুরুতর কিছু বলবার সময়

ডানহাতের আঙুল দিয়ে সে গোঁফের প্রান্ত-চুলগুলিকে নাড়তে থাকে।

'তোমাদের একটা গুরুতর কথা বলার আছে', বলল পরশরাম, মাটির ওপর চোখ রেখে, 'মন দিয়ে শোনো এবং যা বলছি সেভাবে তোমাদের বিহেভ করতে হবে, অর্থাৎ চলতে হবে। রবিবার, মানে পর্শু, সীতাকে দেখবার জন্যে সাত আটজন লোক আসবে। সকাল দশটা নাগাদ আসবে মনে হচ্ছে। ওদের মধ্যে থাকবেন একজন বৃদ্ধ, পাকা চুল পাকা দাড়ি, দেখতে অনেকটা সাধু আসলে লোকটি ভীষণ দুষ্টু, এবং মিথ্যাবাদী। তার স্ত্রীও সুবিধের লোক নন। বিবাহের ব্যাপারটা বড়ই জটিল, কন্যাপক্ষকে খুব সতর্ক থাকতে হয়। এর আগেও সীতাকে একবার দেখতে এসেছিল, তোমাদের মনে থাকতে পারে, তখন সমস্যাটা এরকম ছিল না। তোমাদের বড়-দিদিকে একবারই দেখতে এসেছিল, তাতেই তার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। রবিবার যারা আসবে তাদের বলা হয়েছে সীতার বয়স উনিশ, এবং সে মাতাসুন্দরী কলেজে বি. এ. পড়ে। বিয়ের ব্যাপারে এরকম মিথ্যে বলা দরকার না বললে বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তোমরা এ কথা দুটি মনে রাখবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, বলবে সীতার বয়স উনিশ, বি. এ. পড়ছে মাতাসুন্দরী কলেজে। সব চেয়ে ভালো হয় রবিবার সকালে তোমরা যদি বাড়ি না থাকো, যদি খেলতে যাও, কিংবা বন্ধুদের বাড়িতে দেখা করতে। যদি বাড়ি থেকেই থাক, তাহলে যা বললাম তাই করবে। এবার তোমরা যেতে পার।'

বিছানায় শুয়ে পরশরাম ঠাকুর ককিয়ে বলে উঠল, 'সাইকেলটা না সারালেই নয়। প্যাডেল করতে করতে পা দুটো ব্যথা হয়ে গেছে। টন টন করছে।'

স্ত্রী মাত্র ঘরে ঢুকেছিল। পায়ের কাছে বসে পা টিপতে লাগল।

'বুড়ো বয়সে এত পরিশ্রম সহ্য হয়? কিছু একটা হয়ে গেলে আমি এই একপাল জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কি করব?'

'আরে না, না, কিছু হবে না আমার।'

'না হলেই বাঁচি।'

পরশরাম ঠাকুরের পা স্ত্রীর থলথলে অতিকায় স্তন দুটিকে আদর করতে থাকে।

'ঘুমোও তো! পা টন টন করছিল না?'

'এখন অন্য কিছু টন টন করছে।'

'অসভ্য। বুড়ো হয়েছ, আট আটটা সন্তানের বাপ, তবু মুখের কথা দেখ।'

'বুড়ো হয়েছি! কে বলে আমি বুড়ো হয়েছি?'

'কেউ বলে না। তবে হ্যাঁ, আমার একটা কথা শুনতে হবে।'

'তোমার কথাও শুনতে হবে? কথা শুনে শুনে মাথা সর্ষেক্ষেত হয়ে গেল।'

'দু গণ্ডা হয়েছে। আর নয়। আর কিছুতেই নয়।'

'ওরে বাবা! তুমিও 'দুই বা তিন, ব্যস' হয়ে উঠলে?'

'তুমি যাই বলো না কেন, আর নয়। এ পাপ আর নয়। এ পাপ আর নয়।'

স্ত্রীর চাপা কান্না শুনে পরশরাম ঠাকুর বোকা হয়ে গেল।

অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির সঙ্গে কথাবার্তা বঙ্কিম ঘোষের মনকে তিক্ত করে দিয়েছিল। উন্নয়নের সঙ্গে রাজনীতির গলাগলি সম্পর্ক সম্বন্ধে সে সচেতন, আমেরিকার মত অগ্রসর দেশেও সে দেখেছে, সেনেটর ও কংগ্রেসম্যানরা কিভাবে কাড়াকাড়ি করে উন্নয়নের মোটা ভাগ নিজেদের রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্যে। আসলে যারা ভোট দিয়ে কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠায় তারা আশা রাখে প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটনকে বাধ্য করবে তাদের রাজ্যে নতুন রাস্তা নির্মাণে, শিল্প প্রতিষ্ঠায়, অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনায়। ভারতবর্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। ভারতবর্ষে, বরং সমস্যাটা অনেক বেশি তীব্র, যেহেতু 'কেক' ছোট, ভাগাভাগির অংশ ক্ষুদ্র, অংশীদার অনেক। মন্ত্রীরা যে নিজ নিজ রাজ্যের এবং নিজ নিজ নির্বাচন এলাকার স্বার্থের জন্যে উদ্যোগী হবেন এটাই নিয়ম এবং এভাবেই কেন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত দেশের যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। যার জন্যে বঙ্কিম ঘোষ প্রস্তুত ছিল না তা হচ্ছে মন্ত্রণালয়ের জীবনযাত্রা, ইংরিজিতে যাকে বলে 'লাইফ-স্টাইল'। পর্বতপ্রমাণ ব্যুরোক্রেসির গজেন্দ্রগতি, কাজ না-হবার হাজার 'নিয়ম', এবং সব কিছু মিলে একটা ব্যাপক সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা : এর সঙ্গে সরকারের বিজ্ঞাপিত উন্নয়ন-নীতির সম্পর্কটা মিলনের নয়, শত্রুতার। পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম ঘোষ জানতে পেরেছিল, সেক্রেটারি ও মন্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব নেই, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মধ্যেও সদ্ভাবের অভাব এ বিভেদ মন্ত্রণালয়ের উঁচু স্তরে কিভাবে প্রসারিত হয়ে পড়ল, সৃষ্টি করল আরও অনেক ছোট-বড় বিভেদ, তাও সে প্রত্যক্ষ করেছে। অফিসরদের মধ্যে কে কার 'দলে', কে কার 'লোক', এটাই হয়ে দাঁড়াল তাদের প্রধান পরিচয়, এবং এই দলাদলি এতই অস্থায়ী ও ক্ষিপ্রগতি, যে প্রায় সবাই সবাইকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখতে লাগল। এর সঙ্গে তাল ঠুকে চলবার বঙ্কিম ঘোষের না ছিল গরজ, না অভিরুচি, এজন্যেই মন্ত্রণালয়ে সে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, তাকে কেউ পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, তার উপস্থিতি সরস 'গোপন' আলোচনাকে স্তব্ধ করে, কেউ তাকে ডাকে না আড্ডায়, তার ঘরে এসে ফুস ফুস

করে না, না-জানতে চায়, না-জানায় নিত্যকার নেপথ্য সমাচার। মন্ত্রণালয়ে আসন-প্রাপ্ত টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজররা পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছে এই রাজনীতির কবলে। একেই তো তারা সদাসর্বদা আই-সি-এস আই-এ-এস'দের সঙ্গে কাছে হাত-কচলান অস্তিত্বে অভ্যস্ত, তার ওপর সেক্রেটারিয়েট পলিটিক্স-এর খেলা খেলতে গিয়ে বার বার তাদের বিশেষজ্ঞতার ঘরে টান পড়ছে, এবং তাতে তারা বিশেষ একটা বিচলিত হচ্ছে না। বঙ্কিম ঘোষ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছে কি সহজ বিশেষজ্ঞতার সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের অ্যাডভাইজর বিনোদবিহারী মালহোত্রা বাগমতী নদী বাঁধ পরিকল্পনায় একবার মন্ত্রীর মত, অন্যবার সেক্রেটারির মত সমর্থন ক'রে সমান লম্বা নোট লিখেছে।

মধ্যপ্রদেশে আর. ই. স্কীম নিয়ে কাজকর্ম যা চলছিল তা স্থগিত রাখবার নির্দেশ মেনে নিতে বঙ্কিম ঘোষের বিবেকে বাধে নি। বরং, মন্ত্রী বদলের সঙ্গে সঙ্গে এ কাজকর্ম যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বর্তমান সময়ে তা স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। পার্লামেন্টের সভ্যদের ঔৎসুক্য থেকে সরকারি মন্ত্রকগুলিকে প্রায়ই অর্ধেক সত্য, অর্ধেক মিথ্যা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়, তাও বঙ্কিম ঘোষ জানে। যে-টা তার ভালো লাগে নি তা হচ্ছে নিরাময় রায় এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব নিতে রাজি না হয়ে সবটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। দায়িত্ব নিতে সে অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু আমলাতন্ত্রের মাথায় যারা আসীন, তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপক ও গভীর প্রয়াস বঙ্কিম ঘোষের বরদাস্ত করা সহজ মনে হয় নি। দফতর থেকে বের হবার আগে এ কথাটাই বার বার তার মনে হচ্ছিল।

এবং আরও মনে হচ্ছিল আজ সন্ধেবেলা থেকে রাত্রির নিদ্রা পর্যন্ত তার কিছুই বিশেষ করবার নেই। এই যে কিছু-করবার-নেই, এটা, বঙ্কিম ঘোষ জেনেছে, রাজধানীর সামাজিক জীবনের একটা পীড়াদায়ক বৈশিষ্ট্য। মাঝে মাঝে, তা কেন, প্রায়ই, আপিসের পর বঙ্কিমের মনে হয়, এখন আর করবার কিছু নেই। তার মানে এই নয় যে তার বন্ধু-বান্ধব নেই, সে একা এবং নিঃসঙ্গ। ইচ্ছে করলেই বন্ধু বা বান্ধবীদের কারুর সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায়, হিন্দী বা ইংরেজি ছবি দেখতে যাওয়া যায়, কনট প্লেসে কোনও রেস্তোরাঁয় ব'সে কফি পান, চাইলে ডিনার, খাওয়া যায়, অনুদ্দেশ্যে পালামের রাস্তা ধরে দশ-বিশ মাইল ড্রাইভ করা যায়, কিংবা কোনও পরিচিত বাঙালির বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ গাল-গল্প ক'রে আসা যায়। করবার এমন অনেক কিছু আছে, অথচ, মজা হল, তার একটাও না করলে মনে বিন্দুমাত্র খেদ জন্মায় না, মনে হয় না কিছু একটা করা হল না। এই হল দিল্লির জীবনের বৈশিষ্ট্য; এ শহরটা, বঙ্কিমের মনে হয়েছে বার বার, তোমাকে আঁকড়ে ধরে না, এর এতো

বানানো বৈভব, তার কিছুই তোমাকে 'গ্রিপ্' করে না। তরুণ চ্যাটার্জিকে ফোন ক'রে তার ফ্ল্যাটে গেলে যতো ইচ্ছে হুইস্কি মেলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাল-গল্পও চলে তরুণ আর তার অবশ্যম্ভাবী সান্ধ্য-বন্ধুদের সঙ্গে, যারা তার গজিয়ে-ওঠা প্র্যাকটিসের তারিফে শতমুখ, এবং নবীন উদীয়মান ব্যারিস্টার তরুণ চ্যাটার্জির কাছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সম্বন্ধে নানা মুখরোচক গল্পও শোনা যায়, যেমন শোনা যায় নামজাদা সব আইন-জীবীদের সম্বন্ধে ; আবার তরুণ চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটে না গেলেও একেবারে আসে যায় না। ইন্দ্র ছুগ বা নীলা সরকারকে ডাকলেই কনট প্লেসে কফি পানে, রিগ্যালে ছবি দেখায়, অথবা পালামের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে কোথাও না-যাওয়ার সুন্দরী সঙ্গিনী মেলে, ওরা দুজনেই কথাবার্তায় মার্জিত, প্রগল্ভতায় প্রায় সমান পটু ; আবার ইন্দ্র ছুগ অথবা নীলা সরকারকে না ডাকলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। রবি চৌধুরীর বাসায় গেলে তিনি খুশিই হবেন, দুর্গা চৌধুরী চাকরের হাতে তৈরি চা দেবেন সযত্নে, ইরা এসে বস'বে গল্প করতে এবং একটু পরে পড়ার টানে পাশের ঘরে চলে যাবে, আবার এসে একটু বসবে, আবার চলে যাবে, এবং রবি চৌধুরী দফতর জীবনের ধারা-বিবরণী দিয়ে চলবেন, মাঝে মাঝে বলবেন তাঁর গুরু হরিদাসবাবার কথা, এবং এক সময় দুর্গা চৌধুরী বলবেন, খেয়ে যাবেন নাকি একেবারে, অর্থাৎ এবার বাছা তুমি এসো, আমাদের খাবার সময় হল ; রমেশ চোপরার বাড়িও অনায়াসে যাওয়া যায়, সে-ও খুশি হয়ে হুইস্কি খাওয়াবে, অমরজিৎ চোপরা ঘন হয়ে বসবে, বুক থেকে খসে পড়া আঁচল সামলাবার চেষ্টামাত্র করবে না, রমেশ চোপরা বলবে কি ক'রে সে ধনী হয়েছে, কোন্ আমলাকে ঘুষ কত দিতে হয়, কোন্ মন্ত্রীর কোন্ রমণীতে কি ধরনের আকর্ষণ, অমরজিৎ চোপরা অশ্লীল হাসবে, বঙ্কিম ঘোষ মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে একসময় নিজেও অশ্লীল হাসতে শুরু করবে, এবং এক সময় কোনও মতে গাড়ি চালিয়ে নিজের বাসায় পৌঁছে কোনও মতে সিঁড়ি বেয়ে, ঘরে ঢুকে, জামা-কাপড় না খুলেই বিছানায় পতিত হবে; এসব করা যায়, করা চলে, দিনের পর দিন ; না করলেও মনে হয় না কি যেন করা হল না। এই দিল্লির কালচার, যা ধরা দেয়, কিন্তু ধরে না ; চেঁচায়, কিছু বলে না; ছোটে, কোথাও যায় না। বঙ্কিমের মনে হয় দিল্লি একটা বিরাট রথের মেলা, সবাই এখানে বেশি দামে সস্তা জিনিস বেচবার জন্যে উৎসুক, খদ্দেরের সঙ্গে কেবল বেচাকেনার সম্পর্ক, তোমার কি আছে আর আমার কি আছে মিলিয়ে দেখে নাও, তারই জোরে তোমার আমার আদান-প্রদান, হয় আমি বড়, নয় তুমি, অথবা তিনি, এবং বড়কে কেন্দ্র ক'রে ছোটদের জীবন, এই হল দিল্লির কালচার।

আজও, প্রথম হেমন্তের আসন্ন সন্ধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষের মনে হল কিছু করবার

নেই, যা যা ক'রে সময় কাটান যায় তার একটাও না করলে কিছুই এসে যায় না। মনটা শূন্য ও বিস্বাদ হয়ে উঠল। কয়েকটা নাম এল মনের ছায়ায়, নামগুলোকে জিভের কাছাকাছি রেখে আস্বাদ পাবার চেষ্টা করল, একটা নামও রসাল মনে হল না, তবু তাদেরই মধ্যে দুজনকে ফোন করবে করবে ভেবে টেলিফোনে হাত রাখল, কিন্তু ডায়াল করল না, পেল না উৎসাহ। সকাল বেলার সামান্য পঠিত সংবাদপত্র প'ড়ে ছিল টেবিলের উপর, তুলে নিয়ে সিনেমায় পাতায় চোখ রাখল, দেখতে পেল কনট প্লেসের তিনটে হলেই চলছে হিন্দী ছবি, একটাতে এন্টনী কুইন ও বেটী ডেভিস, কিন্তু বইটা দুবছর আগে নিউইয়র্কে বঙ্কিমের দেখা, দ্বিতীয়বার এক সিনেমা দেখতে সে কখনও তৈরি নয়। একবার মনে হল, যাক গে, বাড়ি চলে যাই, রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে, বই পড়ে কেটে যাবে সন্ধে, কিন্তু মন উঠল না, বঙ্কিম আর একবার টের পেল, যে কর্মব্যস্ততায় অলসতা মূল্যবান, দিল্লিতে তার একান্ত অভাব, অতএব আলস্যের আরামটুকু পর্যন্ত এখানে অনুপস্থিত। বুঝতে পারল আজকের সন্ধ্যা কাটাবার সবচেয়ে ভাল উপায় হল একা একা মদ খেয়ে নিবিড় ভাবে মাতাল হয়ে যাওয়া, এবং সে অসংকল্প নিয়ে দফতর থেকে বেরিয়ে ফিয়াট গাড়িতে স্টার্ট দিল মনে পড়ল বাড়িতে মদ বাড়ন্ত, অতএব চলল কনট প্লেসে পানীয়ের সন্ধানে দোকানে পৌঁছবার আগেই দেখা হয়ে গেল সুমিতা দত্তর সঙ্গে। বঙ্কিম দেখতে পেল ওয়েংগার কনফেকশনারির সামনে দাঁড়িয়ে সুমিতা দত্ত, গাড়ি পার্ক ক'রে তার কাছাকাছি পৌঁছুতে সুমিতা দত্ত দেখতে পেল বঙ্কিম ঘোষকে, দুজনে দুজনকে প্রায় একসঙ্গে 'গ্রীট' করল।

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?' প্রশ্ন করল বঙ্কিম ঘোষ।

'কেক কিনব কি না ভাবছি। তুমি এদিকে কি বদ্ উদ্দেশ্যে?'

'মদ বাড়ন্ত।'

'এখনও পুরোদস্তুর আমলা হতে পারো নি। নিজের পয়সায় মদ কিনতে আস।'

'এখন কোনও কড়াকড়ি নিয়ম নেই। তুমি কিনে দিলেও চলবে।'

'আমার তো ধারণা উঁচু আমলাদের মদ আসে অন্যের পকেট মেরে।'

'আমি উঁচু আমলা নই।'

'নিরীহ গোবেচারি বঙ্কিম ঘোষ।'

'কাছাকাছি। তোমার কি কাজ আছে? মানে, কি করবে কেক কিনে?'

'কেক কিনবো না ঠিক করলাম তোমাকে দেখে। না, কাজ নেই।'

'আশ্চর্য লাগছে যে তোমার নামটা সাড়ে পাঁচটার সময় একবারও মনে পড়ে না।'

'পড়ার প্রয়োজন ছিল?'

'দফতর ছাড়বার সময় মনে হল আজ সন্ধ্যায় কিছু করবার নেই। নাম মনে এল, পুরুষ এবং স্ত্রীলোক। কাউকে ফোন করার উৎসাহ পেলাম না। তোমার নামটা মনে এল না। এলে ফোন করতাম।'

'অবচেতন মনে যে-সব চিন্তা লুটোপুটি করে, সচেতন মনে অনেক সময় তার ছায়াও পড়ে না। তারপর একসময় হঠাৎ'—

'চল, কোথাও বসা যাক।'

ওয়েংগার রেস্তোরাঁ। পায়ের কাছে, সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে ওরা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটাতে ঢুকে বসল।

সুমিতা বলল, 'অনেকদিন দেখা নেই তোমার।'

বঙ্কিম বলল, 'তোমারও।'

সুমিতা বলল, 'ছিলাম না। ওড়িশায় ঘুরে বেড়াতে হল মাসখানেক।'

'আদিম ও অসভ্যদের ওপর লোভ তোমার আর কাটল না।'

'তার জন্যে কিন্তু ওড়িশায় যেতে হয় না। নিউ দিল্লির রাজপথে, জনপথে আদিম ও অসভ্যরা সর্বদা বিচরণ করে।'

'জহুরির চোখ থাকা চাই, আমি তো তাদের দেখতে পাইনে।'

'অন্ধ, অন্তত স্বল্প-দৃষ্টি না হলে ভারত সরকারের বড় চাকরি করা যায় না।'

'তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও যে দূরদৃষ্টির ছড়াছড়ি তার কোনও প্রমাণ নেই।'

'দাবিও আমরা করি নে। আমরা ছাত্রদের চোখ খুলে দেবার চেয়ে বন্ধ ক'রে দিতে অধিকতর উৎসাহী। ছাত্রছাত্রীদের আমরা রোজ উপদেশ দিই. চোখ খুলো না, মন খুলো না, নির্বিবাদে সরু অন্ধকার রাস্তায় পিতা-নামক লাঠির উপর নির্ভর ক'রে টুক টুক ক'রে চলো, দেখবে শেষ পর্যন্ত আই-এ-এস হয়ে ভারত-সরকার নামক মহাশ্মশানে উপনীত হবে, অথবা আই-এ-এস বিয়ে ক'রে মোক্ষপ্রাপ্ত হবে। নেহাত যদি মন্দভাগ্য হও, এই সমাজতান্ত্রিক দেশের মালিক পঞ্চাশটি বৃহৎ কোম্পানির কোনও একটিতে কভেনেন্টেড অফিসারের চাকরি মিলে যাবে।'

'তুমি সিডিশান করছ। ওড়িশার আদিম ও অসভ্যরা তোমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। যদি আর কিছু খুলে না দিয়ে থাকে।'

বয় এসে দাঁড়াতে বঙ্কিম ঘোষ কফি ও কেকের অর্ডার দিল।

সুমিতা বলল, 'তোমাদের মিনিস্ট্রিতে তো ভূমিকম্প হল।'

বিশেষ কেঁপেছে মনে হচ্ছে না। একটি মহীরূহ উৎপাটিত হয়েছে।'

'আরও গাছপালা পড়বে, সবুর করো।'

'তাই নাকি? তুমি জানলে কি করে?'

'নিজস্ব সংবাদদাতা।'

'এই এক আশ্চর্য দিল্লি-জীবনের। এখানে সবাই সব কিছু ঘোড়ার মুখে শোনে। সবাই সব কিছু জানে। দফতরে, কফি-হাউসে, প্রেস ক্লাবে, উঁচু মানুষের বৈঠকখানায় গুজব নিয়ে হোলিখেলা হয়। অথচ সবাই এমন ভাবে কথা বলে যেন প্রধানমন্ত্রীর ঘরে আড়ি পেতে সব কিছু শুনে এসেছে।'

'এ কথাও সত্যি যে দিল্লিতে গোপনীয় বলে কিছু নেই। কাগজওয়ালারা না লিখতে পারে. কিন্তু এমন গোপনীয় ব্যাপার কমই আছে যা কথায় জানাজানি না হয়ে যায়।'

'তা হয়তো সত্যি।'

'তুমি তো তোমাদের মন্ত্রণালয়ে কোণঠাসা। কোনও খবরই রাখ না।'

'প্রতিবাদ করছি। এমন কিছু ঘটে না পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে যা আমার অজানা।'

'তাই নাকি? দীপংকর দয়ালকে চেন?'

'বিলক্ষণ! গোলগাল পেটমোটা ডবল চিবুক থলথল বুক জে. এস. থ্রী ; হাত দেখেন নাকি চমৎকার। এ সুবাদে ভারতবর্ষে এমন কোনও মন্ত্রী নেই যার অন্তরঙ্গ নন দীপংকর দয়াল।'

'মহিমপুরের মাতাজীর নাম শুনেছ?'

'না। বসিরহাটের বাবাজীর নামও শুনি নি।'

'ঠাট্টা রাখ। মহিমপুরের মাতাজী আনন্দ মহারাজের শিষ্যা, আনন্দ-সঙ্ঘের নেত্রী।'

'দুটোর একটার সঙ্গেও পরিচিত নই।'

আমাদের দেশে তো চার্চ নেই, হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠানিক নয়, আনুষ্ঠানিক। তথাপি চেষ্টা চলছে রাজশক্তি আর ধর্মের মধ্যে মিতালি সংগঠনের, যেমন য়ুরোপে রাজা আর চার্চ মাসতুতো ভাই। ভারত সাধু সমাজ তৈরি ক'রে ধর্মকে রাজশক্তির সহায়ক ভূমিকা দিতে চেষ্টা করছেন কোনও কোনও নেতারা। 'আনন্দ-সঙ্ঘ' রাজশক্তি ও জনতার মধ্যে সেতু বাঁধছে। সঙ্গে সঙ্গে কনট্রাকটরি ক'রে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বহু লক্ষ টাকা কামিয়েছে।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে. রামস্বামী বলছিল বটে।'

'একটা বড় কনট্রাক্ট পাইয়ে দিয়েছিল দীপংকর দয়াল। প্রসঙ্গত, দীপংকরের নিজের একটা বাড়িও হয়ে গেছে প্রায় বিনি পয়সায়।'

'ফেয়ার এনাফ।'

'কিন্তু বিল্ডিংটা এত বাজে হয়েছে, ছাদ ফেটে, দেয়াল ফেটে জল পড়ছে, সি-পি-ডবলু-ডি'র লোকেরা দুজন এম. পি-কে সব কাগজপত্র সাপ্লাই করেছে, পার্লামেন্টে এ নিয়ে অনেক হৈ চৈ, এবং এখন একটা ক্রাইসিস চলছে। দীপংকর দয়াল পড়েছে মহা বিপদে।'

'ধরা পড়লে বড় বিদ্যা কঠিন বিপদই হয় বটে।'

'মহিমপুরের মাতাজী একগাদা কাগজপত্র তোমাদের সেক্রেটারিকে দিয়েছেন, যার ফলে দীপংকর দয়ালের পালাবার পথ বন্ধ।'

'দিল কেন সে?'

'মাতাজী যখন যুবতী কন্যা ছিলেন দীপংকর তাকে প্রতারণা করেছিল।'

'প্রতিশোধ? সাধু-সাধুনীরাও প্রতিশোধ নেয় নাকি?'

'প্রতারণাটা সহজ ছিল না। বিয়ে করবে বলে ভাব জমিয়ে মজা লুটছিল দীপংকর দয়াল। পরে উত্তরপ্রদেশের এক মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি ক'বে দেয় মেয়েটিকে। মন্ত্রীর দাক্ষিণ্যে তার পেটে বাচ্চা এসে যায়। তখন দীপংকর ওকে পৌঁছে দেয় আনন্দ মহারাজের কাছে।'

'তুমি এসব জানলে কি ক'রে?'

'কান পেতে শুনে। আরও শুনবে?'

'কান পাতলে পারব না।'

'তোমার বস্ নিরাময় রায়।'

'সে আবার কি ক'রে বসল?'

'এফ-এ-ও'তে চাকরি নিচ্ছে। শ্বশুর এফ-এ-ও'তে বড় কাজ করে।'

'তাই নাকি?'

'শিখা রায়কে দেখেছ?'

'না।'

'কালো, কিন্তু বেশ দেখতে। দারুণ চালু মেয়ে ছিল লন্ডনে। এমন কোনও ব্রাইট ছেলে ছিল না যার সঙ্গে ডেট না করত।'

'বেশ তো!'

'তারপর একসময় নার্ভাস ব্রেকডাউন হল। মেন্টাল হসপিট্যালে রাখতে হয়েছিল দেড় বছর।'

'তাই নাকি? নিরাময় রায়কে পেল কি ক'রে?'

'দেশে এসেছিল সুস্থ হবার পর। মাঝে মাঝে ফিট হত, বছরে দু'তিনবার। নিরাময় রায়ের সঙ্গে বয়সের তফাত অনেক। আলাপ হয়েছিল দুমকায়। অত বড়

বাপের মেয়ে বলেই নাকি নিরাময় রায় বিয়ে করেছিল। এখন শুনেছি দুতিন মাস পরে পরেই ফিট হ'চ্ছে। বাচ্চা হয় নি ব'লে বেচারার মনকষ্ট।'

'অন্যের শোবার ঘরের গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে না।'

'তাহলে তোমার শোবার ঘরের গল্প বলো।'

কফি ও কেক খাওয়া শেষ হয়ে আসছিল। বঙ্কিম সিগারেট ধরাতে সুমিতা একটা চাইল।

'খাও নাকি আজকাল?'

'অভ্যেস নেই। শখ ক'রে কখনও সখনও।'

'আমার কেন জানি মেয়েদের সিগারেট খাওয়া দেখতে ভাল লাগে।'

'সমান-সমান মনে হয়, তাই না?'

'ঠিক বলেছ। মনে হয় এক-লেভেলে কথা বলতে পারছি।'

'তাই তো তোমার কাছে চাইলাম। তোমার শোবার ঘরের গল্প বলতে এবার বাধবে না একটুও।'

'ছাই। দেশে ফিরে এসে শোবার ঘরের গল্প আর হ'ল না।'

'ওদেশে অনেক হ'ত?'

'একেবারে হয় নি তা নয়।'

'সে গল্পই শোনা যাক।'

'বলবে কে?'

'তুমি।'

'না। শোবার ঘরে যা ঘটে তা তুমি জান। বলাবলির ব্যাপার নয়।'

'তুমি তো একটি বিদেশী মেয়েকে প্রায় বিয়ে ক'রে ফেলেছিলে।'

'প্রায়।'

'করলে না কেন?'

'কপালে ছিল না। হিন্দুর ছেলে, যা হবার, যা হবার নয়, জন্মের ছ'দিনের দিন বিধাতাপুরুষ নিজের হাতে কপালে লিখে দিয়ে গেছেন।'

'কারণটা বলতে আপত্তি আছে?'

'কিছুমাত্র না। মেয়েটি বলল বিয়ের পরে আমাকে আমেরিকায় বাস করতে হবে, সে ভারতে এসে বাস পারবে না। আমার চারহাজার বছরের ঐতিহাসিক পুরুষ-দম্ভ রাজি হ'তে পারল না।'

'তার মানে তুমি তাকে তেমন ভালবাসতে না।'

'অথবা সে আমাকে। অথবা দুজন দুজনকে।'

'তুমি মেয়েটিকে মিস্ করো?'

'মিসেস তো করতে পারলাম না, তাই এক-আধটু মিস্ করি।'

'এখানে তোমার বান্ধবী হয় নি?'

'নিশ্চয় হয়েছে। একজনের সঙ্গে বসে কফি-কেক খাচ্ছি।'

'অ। তোমার সব বান্ধবীরাই এ-জাতীয়?'

'সুমিতা, তাহলেও তো বেঁচে যেতাম।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝেছ ঠিকই। তোমার মত বান্ধবী আমার আর একজনও নেই।'

'তাই নামটাও মনে করতে পার না।'

'ঠিক তাই। যাদের মনে প'ড়ে নিজের মন-খারাপ হয়ে যায় তুমি তাদের মধ্যে নও।'

'প্রশংসা করছ কি নিন্দা, বোঝা যাচ্ছে না।'

'দুটোর একটাও না। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিনই মনে হয়েছিল তুমি দুটোরই বাইরে।'

'হরিদাস বাৎসায়নের বাড়িতে। হিন্দী কবিতা পাঠ ছিল। তুমি এসেছিলে। মনে আছে আমার।'

'হিন্দী কবিতা পাঠের গায়কীর সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমার। এমন গান ক'রে, প্রথম লাইন দু'বার বলা শুনে ভারি মজা লেগেছিল। বাৎসায়ন ছিল, তুমি, হীরা বলে একটি মেয়ে, আর আমি। বাকি সবাই চলে গিয়েছিল। বাৎসায়ন তোমার সঙ্গে কি-একটা যৌন রসিকতা করেছিল। আর তক্ষুনি তুমি বলে উঠেছিলে, যা বলবার সাফ ক'রে বলো, আমি কচি খুকি নই, অনেক পুরুষের সঙ্গে শুয়েছি, পুরুষ দেখলেই বুঝতে পারি কার মনে কি ঘোল পাক খাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিদেশে এমন স্পষ্টভাষণ মেয়েদের মুখে শুনেছি। আমাদের দেশেও যে কোনও মেয়ে এত সহজে নির্বিকারে এমন কথা বলতে পারে আমার ধারণা ছিল না। তোমাকে সেই দিন থেকে আমার দারুণ পছন্দ।'

'কতোটা? এ—তোটা?'

'অনেকখানি।'

'অনেক পুরুষের সঙ্গে শুয়েছি বলে?'

'তোমার সততা, সাহস আর স্পষ্টতার জন্যে।'

'প্রেমে পড়ো নি তো? কৈ? তাকাও তো আমার চোখে। না। বেশ সুস্থ সবলই তো আছ দেখতে পাচ্ছি।'

'মেয়েদের মধ্যে ন্যাকামি আমার একেবারে বরদাস্ত হয় না।'

'অনেকের ভীষণ ভালো লাগে।'

'সেজন্যে সহজ স্বাভাবিক সমান-সমান বন্ধুত্ব হয়ে উঠতে চায় না।'

'কলেজে গিয়ে দেখ। এখন হ'তে শুরু করেছে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক। আমরা তো প্রাচীনের দলে।'

'তোমার বন্ধুর খবর কি?'

সুমিতা গম্ভীর হল।

'খবর নেই।'

'মানে?'

'বর্তমানে তার একটি বান্ধবী জুটেছে। আমার চেয়ে বছর দশেকের ছোট। এবং সুন্দরী।'

'তোমার চেয়েও?'

'ধন্যবাদ। আমার চেয়েও।'

'মতলবটা কি?'

'ঠিক জানি নে। মেয়েটাকে আমি বলে দিয়েছি, বিয়ে ক'রে ফেল্, বিয়ে না ক'রে সব কিছু দিয়ে বসিস নে।'

'তুমি চেন নাকি মেয়েটিকে?'

'খুব চিনি। বাচ্চা মেয়ে। খুব সুন্দব দেখতে।'

'যদি সত্যি ওদের বিয়ে হয়ে যায়?'

'শ পাঁচেক টাকার মধ্যে একটা প্রেজেন্ট কিনতে হবে। কি কিনবো তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নেব।'

'কিন্তু, সুমিতা, তুমি তো ওকে ভালোবাসো!'

'তার মানে কি ও অন্য মেয়েকে ভালোবাসতে পারবে না?'

'তোমাদের তো বিয়ে হবার কথা।'

'এটাই হয়েছে মুশকিল। আঠার বছর বয়স থেকে জেনে আসছি আমাদের বিয়ে হবে। আজ চৌদ্দ বছর হল। এখন বুঝতে পারছি, হবে না।'

'কিন্তু তোমরা একনিষ্ঠ থাকো নি।'

'না। আঠার বছর বয়সে ওকে আমি সব দিয়েছিলাম। জানতাম, একদিন আমাদের বিয়ে হবে। বাবা-মাও জানতেন। বাবা দিনরাত আইনের বইয়ে ডুবে থাকতেন, অন্য দিকে নজর ছিল কম। আমি ছোটবেলা থেকে স্বাধীনতার মধ্যে মানুষ হয়েছি, জানতাম আমার শিক্ষা, কর্ম, বিয়ে এসব ব্যাপারে আমি যা চাইব, বাবা-মা

তাতেই রাজি হবেন। ওকে বাবা-মা দুজনেই ভালোবাসতেন, বাঙালি নয় বলে আপনার হবে না, এমন ছিল না আমাদের পারিবারিক কালচার। আঠার বছর থেকে আমাকে তৈরি করেছে কে জান? বাবা-মা নয়।'

'তোমার বন্ধু?'

'এ বিশেষ্যটা ওর বেলা আর প্রযোজ্য নয়। তা হোক। প্রথম থেকেই ও আমাকে বলত একনিষ্ঠতার কোনও অর্থ নেই, বহুনিষ্ঠতার মধ্যেও পারস্পরিক আকর্ষণ এবং প্রেম আমাদের সম্পর্কে প্রকৃত ভিত্তি যাচাই করবে। আমার বয়স যখন কুড়ি তখন দেখলাম তুমি যাকে বন্ধু বলছ সে অন্য মেয়ের সঙ্গে শোওয়াশুয়ি করছে। প্রশ্ন করতে জবাব পেলাম, ওটা কিছু নয়, আমি করলেও তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। বছর দু'এক, তথাপি, আমি একনিষ্ঠই ছিলাম। তারপরে দেখলাম, মানে নেই।'

'তুমিও বহুনিষ্ঠ হলে?'

'হলাম। বহু কথাটা খারাপ শোনায়। একাধিক বলতে পার।'

·'আর কাউকে বেছে নিয়ে সম্পর্কটা পাকাপোক্ত করলে না কেন?'

'অর্থাৎ আর কাউকে বিয়ে করলাম না কেন? ইচ্ছে হল না।'

'তার মানে আর কাউকে তেমন ভালোবাসতে পারলে না। ভালোবাসাটা তোমার কিন্তু একনিষ্ঠ হয়ে গেল, সুমিতা।'

'তা গেল। আসলে কি জানো? আঠার বছর বয়সটা ভীষণ খারাপ। ও বয়সে মনে একটা ভূমিকম্প হয়ে গেলে আর ভাঙাচোরা জোড়া লাগে না।'

'তোমার লোকটির তো লাগছে দেখতে পাচ্ছি।'

'আমিও তো তাই দেখছি।'

'তোমার নিজেকে বঞ্চিত মনে হয় না?'

'মাঝে মাঝে বোকা বোকা লাগে। মনে হয়, ওর পথে চলতে গিয়ে, ও গেল অন্যপথে, আমিও ঠিক পথের খোঁজ পেলাম না।'

'এখনও তোমার দিন যায় নি, সুমিতা।'

'মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়েছে, তবে অপরাহ্ণটাও এমন কিছু খারাপ নয়। অন্তত দিবানিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত।'

'তুমি কি খুব একা-একা, সুমিতা?'

'কে নয়? যার মন আছে, প্রাণ আছে, সে একা। তাই নয় কি?'

'তা হলেও, আমি যা জিজ্ঞেস করলাম তার জবাব এ নয়।'

'জবাব দিচ্ছি। বিয়ের দরকার এক সময় যতটা মনে হ'ত এখন আর তা হয় না। বরং আমি যে একান্ত নিজের, অন্য কারুর নই, ভাবতে ভাল লাগে। সিকিউরিটির

প্রশ্ন আসে না, চাকরি আছে, বুড়ো বয়সে কারুর ওপর নির্ভর করতে হবে না। চাকরি করে, বই পড়ে, এক আধটু লিখে-টিখে, বেড়িয়ে-চেড়িয়ে, কিছু না ক'রে, যা করতে মন চায় তাই করে, জীবনটা মন্দ কাটছে না। বয়স্কা কুমারী মেয়ে, অনেক পুরুষের আদিম অসভ্য চেহারা দেখতে পাই, নানা বয়সের উঁচু খুব-উঁচু, মাঝারি, কিছু নিচু, দেখে মজা লাগে, হাসি পায়, মনে হয় কি নির্লজ্জ ফাঁকি মানুষের সভ্যতা, কৃষ্টি. আর নীতির আচরণ, দেহ কি নিদারুণ পরিহাসই না করে থাকে সব কিছুকে। কদাচ কখনও এক এক জনকে আকর্ষণীয় মনে হয়, কিছুক্ষণের জন্য, পরে দেখতে পাই পুরুষে পুরুষে প্রভেদ খুব কম, অন্তত বিছানায়। বিছানার সম্পর্কটা, তাই, দ্রুত কমে আসছে, বুঝতে পারছি, হঠাৎ একদিন আর থাকবেই না। তখন তো আমি একেবারে মুক্ত! ভেবে দেখ তো, কাউকে বিয়ে করলে পঞ্চাশ-ষাট বছর পর্যন্ত তার তিন মিনিটের ক্ষুধা মিটিয়ে যেতে হত! ভাবতেও আমার বমি আসে আজকাল।'

'তার মানে তুমি সন্ন্যাসিনী হ'তে চলেছ।'

'ইয়ার্কির কথা নয়, বঙ্কিম। ভেবে দেখ, একটা জীবনে এক-একটা পুরুষ ও স্ত্রীলোক কত হাজার বার এ কাজ করে, নেহাত অভ্যাসের বশে, নেহাত অন্য কোনও সুন্দরতর উপভোগ বা বিনোদনের পথ জানা নেই বলে। সত্যিকারের চায় বলে নয়, করতে হয় বলে। অথচ সেক্স-অ্যাক্ট বাদ দিয়ে নরনারীর সম্পর্ক অনেক শান্ত, সুন্দর ও সফল হ'তে পারে। আমার তো মনে হয় চল্লিশের পর করার আর দরকারই হয় না, ছেড়ে দিলে সম্পর্ক সুন্দর সুশান্ত হয়, এবং স্বামী-স্ত্রী, অথবা নরনারী, অন্তত কিছুদিন সুসভ্য জীবন যাপন করতে পারে। আইডিয়াটা কি খুব বাজে মনে হচ্ছে?'

'ইনটারেস্টিং শিষ্য-শিষ্যা বিশেষ পাবে—ভরসা দিতে পারছি না।'

'আমিই বক বক করলাম। তোমার কথা শুনলাম না কিছুই।'

'বলবার মত কিছু নেই। তোমার মত নিজেকে ব্যক্ত করার সাহসও নেই।'

'দফতর করেই দিন কাটছে?'

'তাই তো দেখছি। বাকি যা করছি, তা না করলেও এসে যায় না।'

'ক'টা গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দিলে?'

'শ' তিনেক ফাইলে গ্রাম্য বিদ্যুৎ এখনও অন্ধকার হয়ে প'ড়ে আছে।'

'দেশে থাকবে, না পালাবে?'

'দেশে থেকে বেঁচে থাকা, বুঝতে পারা যে বেঁচে আছি, মানুষ হিসেবে বেঁচে আছি, বড় কঠিন ; পালানো সোজা, কিন্তু পালিয়েও তো বাঁচার আস্বাদ পাওয়া যায় না! এই দেড় বছর দেশে থেকে কি মনে হয়েছে বলব, সুমিতা? মনে হয়েছে

ভারতবর্ষ নামক এক ভোজ চলেছে, লাখ খানেক লোক গোগ্রাসে গিলছে, আর দূরে, বহু, বহু মানুষ জমাট ক্ষুধা নিয়ে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে গত জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। তারা জানেও না, পেটে তাদের ক্ষুধা, জানেও না ভোজ চলছে, নিমন্ত্রণ আদায় ক'রে নেবার কথা ভাবতেও পারে না তারা। এই ভোজ-নাটকে, না-বেঁচে বেঁচে থাকার ভূমিকায় আমাদের মত আছে কিছু লোক, আমরা না-দিচ্ছি, না-নিচ্ছি, কেবল গড়িয়ে চলছি স্বপ্নবিলাসের কার্পেটের ওপর। এভাবে কতদিন বেঁচে থাকা যায় বল তো?'

'অভ্যেস হয়ে গেলে, মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যুর পরেও, পরজন্মে।'

'আরও কি মনে হয়, বলবো? মনে হয়, ভারতবর্ষ কোনও দেশ নয়, সমাজ নয়, সভ্যতা-সংস্কৃতি নয়, ভারতবর্ষ একটা সুপ্রাচীন অভ্যাস।'

দুজন তাকিয়ে রইল দুজনের চোখে। প্রথম হেমন্তের কোনও এক কুমারী রাত্রিতে দিল্লির এক রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি ব'সে। ওরা অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, ওদের সম্পর্ক গভীর নয়, ওরা দুটি কক্ষচ্যুত মানুষ, ভারতবর্ষ নামক অভ্যাসে ধরা না দিয়ে, বেঁচে থাকার শিহরনসন্ধানী।

সুমিতা হেসে উঠে বলল, 'তুমি পাগল। একেবারে হোপলেস।'

বঙ্কিম ঘোষ বলল, 'তুমি আমার চেয়েও পাগল। চলো উঠি। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমোই। মদ আর কেনা হল না।'

আগরওয়ালাকে যদিও বলেছিলেন বনমালীশংকর ঝা, আজ সন্ধ্যার পরেও আপিসে থাকবেন, জনার্দন দীক্ষিতের সঙ্গে মোলাকাতের পর থেকে মেজাজটা কেমন বিগড়ে গেল, দফতরের কাজকর্ম যথারীতি চলল, মিটিং-এর পরে মিটিং, অনেক, অনেক আলোচনা যার চার ভাগের তিনভাগ তাৎপর্যহীন, টেলিফোন বাজল পঞ্চাশ-ষাট বার, নানান লোকের নানা প্রশ্ন, অনেকের একই প্রশ্ন, ফাইলের পরে ফাইল, হলদে পাংশুটে প্রাণহীন কাগজে একটা চলমান জাতির ভাগ্য-নির্ধারণ, এবং একের পর এক অফিসরদের যাওয়া-আসা, সবার মুখে প্রতি কথায় কর্তা-খুশি হাত-কচলান দন্ত-বিকাশ হে-হে-স্যার-স্যার, আপনি যা বলেছেন তাই ঠিক, তা ঠিক হ'তেই হবে; দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নিরুত্তেজক পুনরাবৃত্তি, বনমামালীশংকর ঝা ছ'টা বাজতে কেমন হাঁপিয়ে উঠলেন, ঠিক ক'রে ফেললেন আজ আর নয়, এবার ওঠা যাক, বাকি সব কাল হবে, অথবা কালের পর পর্শু, অথবা এক সপ্তাহ কিংবা এক মাস, চাই কি এক বছর পরে, তাতে কারুর কিছু এসে যাবে না, আপাতত মাথার মধ্যে একটা অপরিচিত ব্যথা, মনে অসমাপ্ত ক্লান্তি। আগরওয়ালের ফোন তুলে বললেন, আমি

এখন যাচ্ছি, তুমিও যেতে পার, আগরওয়াল বলল, আমি স্যর কালকের কাজকর্ম একটু গুছিয়ে নিয়ে তারপর যাবো, ঝা উঠলেন, দুখনলাল কাগজপত্র গুছিয়ে পোর্টফোলিও ব্যাগটা হাতে নিয়ে দাঁড়াল, সাহেবকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, জিজ্ঞেস করল কোন কোন ফাইল সঙ্গে যাবে, ঝা বললেন, কোনটাই না, বলে সোজা দরজা খুলে বাইরে এলেন, পাঁচজন চাপরাশী বসে ছিল, হুট করে দাঁড়িয়ে সেলাম করল, তাদের প্রতি নজর না দিয়ে ঝা লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে গেলেন, পথে দু'চারজন কেরানি নমস্কার করল, দেখতে না পেয়ে এগিয়ে গেলেন, লিফ্‌টম্যানের সেলামও নজর পেল না, তর তর করে লিফ্‌ট নেমে গেল একতলায়, ঝা সোজা গিয়ে গাড়িতে বসলেন, স্টাফ কার, বিরাট ফোর্ড, নিজের গাড়ি দুপুরে অরুণাকে নিয়ে বেরিয়েছিল, আর ফেরে নি, বাড়িতেই রয়েছে, ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ফটকের বাইরে এসে জানতে চাইল, কোথায় যেতে হবে, বনমালীশংকর ঝা বললেন, ক্লাব।

ক্লাব মানে জিমখানা, দিল্লির আভিজাত্যের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। গ্রেট প্লেস পেরিয়ে, কিং জর্জেস এভিনিউ ধরে গাড়ি রেস কোর্স রোডের দিকে ধাবিত হল, বনমালীশংকর ঝা'র মনে পড়ল গৌতমকে পত্র লেখা হল না, সপ্তাহে গৌতমকে নিয়ম করে তিনি একবার পত্র লেখেন, সাধারণত নিয়ম মেনে চলা তাঁর অভ্যাস, আজ কিছুতেই হয়ে উঠল না, রাত্রিতেও হবে না, কলম নিয়ে বসবার ইচ্ছে একেবারে নেই, মাথায় অপরিচিত একটা ব্যথা, মনে অসমাপ্ত ক্লান্তি। গাড়ি ঢুকল জিমখানায়, নেমে বনমালীশংকর ঝা বার-রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন, পথে পরিচিত দু'জন লোক নমস্কার করল, মৃদু হেসে চললেন এগিয়ে, নজর পড়ল সর্দার মোহন সিং-এর স্ত্রী রীটা সিং লাউঞ্জের এক কোণে বসে কোনও এক পুরুষের সঙ্গে গল্প করছে, সে সর্দার মোহন সিং নয়, কৌতূহল হল, একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন লোকটাকে, দাড়ি-পাগড়ি নেই, লোভী-লোভী ছুক-ছুক মুখ-চোখ, রীটা সিং এখনও বেশ সুন্দরী রয়েছে বলতে হবে, বার-রুমে ঢুকতে দেখতে পেলেন বেশ কয়েকজন পুরুষ-মহিলা সান্ধ্য পানের আসর জমিয়েছে, অনেকেই চেনা, দিল্লির অভিজাত সমাজ স্বাধীনতার পর একেবারে বদলে গেছে, আগেকার দিনে জিমখানায় আসতেন বেশির ভাগ ইংরেজেরা এবং দেশি আই-সি-এস প্রায় সবাই, রাজা-মহারাজারাও দিল্লি-প্রবাসের সময়, আর এখন এদের বেশির ভাগ ব্যবসায়ী, কনট্রাক্টর, বড় বড় কোম্পানির উঁচু উঁচু লোক, এরই মধ্যে দেখতে পেলেন জগৎ লালওয়ানীকে, বোম্বাইতে যার মস্ত ব্যবসা, এবং গোপীনাথ নন্দকে, ফরিদাবাদে যার রেডিয়ো এবং বিজলিবাতির কারখানা, এবং অযোধ্যাপ্রসাদকে, যে দিল্লিতে বড় এক ইন্দো-জার্মান

ওষুধের কারখানার প্রতিনিধি, এবং নরেন্দ্র সিংকে, যে গতবছর পর্যন্ত কিনিয়ায় ভারতের অ্যামবাসাডর ছিল, এখন পররাষ্ট্র দপ্তরে জয়েন্ট সেক্রেটারি। বার-ম্যান সেলাম জানালে, বনমালী বললেন, 'একটা বড় দাও তো ছোটেলাল, মাথাটা ব্যথা করছে', বলে দাঁড়িয়েই রইলেন, পানীয় তৈরি হ'লে, প্রথম এক চুমুক পান করে বললেন, 'ভেরি নাইস', পানীয় হাতে ক'রে এক পাশে সোফা চেয়ারে বসলেন। লক্ষ্য করলেন কেউ কেউ এগিয়ে আসবার উপক্রম করছে, কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল না কাউকে না-দেখি না-দেখি ভাব দেখিয়ে নিজের মনে পান ক'রে চললেন, মনে ওলট-পালট চিন্তা, জনার্দন দীক্ষিতের মুখ, থলথলে গাল, বড় বড় লালচে চোখ, গলায়, ঘাড়ে তাল তাল বাড়তি মাংস, কি কদর্য দেখতে আজকালকার পলিটিশিয়ানরা, ভোগ আর লোভ আর ভোগ তাদের মুখচোখের চেহারায় প্রকট, নেহেরুর সঙ্গে সঙ্গে পলিটিক্যাল গ্রেস চলে গেল দেশ থেকে, জনার্দন দীক্ষিত সারাদিনে বোধকরি শ'খানেক পান চিবোয়, চিবিয়ে চিবিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করছিল আজ, মনে প'ড়ে গা আবার জ্বলে গেল বনমালীশংকর ঝা'র ; নরেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে মহিলাটি কে? ছিমছাম দেখতে, ফিগারটা বেশ, তাই না, আগে ক্লাবে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না, দাঁতগুলি সুন্দর তো, হাসলে বেশ দেখায়, নরেন্দ্র সিং লোকটা দারুণ স্মার্ট, প্রায়ই নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে ক্লাবে আসে ; গৌতম, গৌতম, গৌতম, এখন তো লন্ডনে দুপুর, মানে দুটো-আড়াইটে হবে, তুই কি ক্লাস করছিস, না কোনও বান্ধবীকে নিয়ে কফি পান করছিস, না কি লাইব্রেরিতে ব'সে পড়ছিস : তোর পায়ের ব্যথাটা সেরেছে তো রে? দীপংকর দয়ালকে হঠাৎ মনে পড়ল কেন? গৌতমের সঙ্গে কি সম্পর্ক দীপংকর দয়ালের? দয়াল জানেও না তার সর্বনাশের নথিপত্র জমা রয়েছে আমার কাছে, উচ্চাশা বড় বেশি বেড়ে গিয়েছিল, রিটায়ার করে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী হবার চাল খেলবে ভেবেছিল দীপংকর দয়াল, এবার সব চাল শেষ হবে তোমার, একটু সবুর করো . গৌতম তুই বোধহয় ভালোই করেছিস এর মধ্যে না এসে, তোকে এত বড় একটা চাকরি করে দিলাম, তুই বিচ্ছিরি হেসে বললি, তোমরা সবাই আছ বেশ, নিজেরা গুছিয়ে নিয়েছ তাতে তৃপ্ত নও, ছেলেদের জন্যে দু'তিন হাজার টাকার চাকরি বাগাচ্ছ, অথচ বলছ তোমরা দেশের সেবা করছ, রেগে গিয়েছিলাম, খুবই রেগেছিলাম যখন বলেছিলি, তোমাকে এত বড় একটা ঘুষ দিচ্ছে তারা কি এর বদলে কিছুই আদায় করে নেবে না ভেবেছ? তুমি টাকা নাও না, লোকের কাছে বড়াই করো তুমি শক্ত আই-সি-এস, ইনকরাপ্‌টিব্‌ল্, অথচ তোমার ছেলের চাকরি যারা করে দিচ্ছে তাদের কাছে তুমি কি ঘুষখোর নও? না, তুই ভালোই করেছিস, এর মধ্যে আসিস নি, লন্ডন থেকে পি.-এইচ. ডি. করে মাস্টারি

জীবনে তোর পয়সা হবে না, কিন্তু মানুষ হিসাবে যদি সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারিস, কি জানি, তা কি সম্ভব হবে এ দেশে, গৌতম, তোর কড়া কড়া মতামতগুলি কি এখনও আছে রে, ইংলিশ ওয়েদার তোকে কি নরম করে আনে নি, হোয়াট ইউ নীড ইজ এ প্রেটি নাইস গার্ল, জানিস, আমার একটি বান্ধবী ছিল লন্ডনে, নাম? নামটা মনে পড়ছে না কেন? কি সর্বনাশ, নামটা কি ভুলে গেলাম, বুকে বড় একটা তিল ছিল, অলমোস্ট অ্যাজ বিগ অ্যাজ হার নিপ্‌ল্‌, নামটা...দীপংকর দয়াল নাকি মহিমপুরের মাতাজীর লাভার ছিল, মোটা বোতল ঢোলঢাল দীপংকর দয়াল, মহিমপুরের মাতাজী, নাম তো ওর পূর্ণিমা, পূর্ণিমা নিগম, ওর বাবা সংস্কৃত পড়াত লক্ষ্ণৌর একটা কলেজে, এ. পি. সেন রোডে থাকত, আমি দেখেছি তাকে, পূর্ণিমাকে দেখি নি, কাল প্রথম দেখলাম, চেহারাটা বেশ, কথাবার্তায় চমৎকার, 'আনন্দ-সঙ্ঘ' যদি অন্যায় করে থাকে শাস্তি তাকে পেতেই হবে', গম্ভীর স্বরে বলেছিল পূর্ণিমা, 'সঙ্ঘ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু খারাপ এর মধ্যে হয়তো ঢুকেছে, আনন্দ মহারাজ চান তাদের মুখোশ খুলে দিয়ে সঙ্ঘকে পবিত্র করতে। তাই নথিপত্র যা আমার কাছে আছে আপনাকে দিয়ে দিলাম। দেখতে পাবেন আপনারই এক সহকর্মী এ ব্যাপারে বিশ্রীভাবে জড়িত। আশা করব অন্যায়কারীদের যখন শাস্তি দেবেন, সরকারের বড় চাকুরে বলে কেউ যেন রেহাই না পায়।' বুদ্ধির তারিফ না করে পারি নি। রীটা সিং বার-এ এসেছে দেখছি, কোমরে এখনও এক চিলতে বাড়তি মাংস নেই, হাঁটার ভঙ্গিটি বেশ, তাই না? কি দারুণ পাতলা শাড়ি পরেছে, প্রায় সী-থ্রু, পুরো থাই দুটো দেখা যাচ্ছে, নরেন্দ্র সিং বেশ জমে উঠেছে মেয়েটির সঙ্গে, লাকি গ্যাই, গৌতম, তুই যাই বলিস, এ হচ্ছে ভারতবর্ষ, এ রাশিয়া বা চীন নয়, এখানে কোনওদিন বিপ্লব হবে না, এ দেশ ধর্মের দেশ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দের দেশ, এ দেশের গরিব মানুষ ধর্মভীরু, তারা কম্যুনিজম্‌ কখনও গ্রহণ করবে না, তুই, তোরা যাই বলিস, তা ছাড়া, আই-সি-এস'এর ছেলের মুখে কম্যুনিজম্‌ একটা হালকা পরিহাস বৈ তো নয়? তোর অনেক আছে, সব আছে, জীবনে দুঃখ-কষ্ট কাকে বলে জানিস না, তাই গরিবদের জন্যে মমতা তোর বেশি, হতিস গরিবের ছেলে, আই-এ-এস হবার জন্যে মুখে লালা ঝরত! না, তোকে আই-এ-এস হতে বলিনি কখনও, আমার ছেলে আই-এ-এস হবে তার আগে যেন আমি মরে যাই, কোম্পানির চাকরিটা কিন্তু ভালো ছিল রে, কাছাকাছি থাকতিস, তোর সঙ্গে মতের অমিল, বাট, মাই বয়, আই মিস ইউ...পূর্ণিমা নিগমকে নাকি লক্ষ্ণৌর এক মন্ত্রী পেটে বাচ্চা করে দিয়েছিল, না কি সে ছিল দীপংকর দয়াল, মাই গড, দীপংকর দয়াল!! হেনরিয়েটা! মনে পড়েছে, নামটা হল হেনরিয়েটা, কতো বছর আগেকার কথা, কত বছর, কত বছর, পৃথিবী

তখন নতুন ছিল, ভার্জিন মেইডেন, ভারতে বিবাজ করত সুশাসিত শান্তি, আই-সি-এস হয়ে দেশেব কত মঙ্গল করার সুযোগ ছিল, একটি ইংরেজ তরুণী ছিল, নাম হেনরিয়েটা ম্যাকডোনাল্ড, একমাথা সোনালি চুল, কাঁধের নিচে ছাঁটা, একটু প্লাম্প্ই ছিল হেনরিয়েটা, বন্ধুরা বলত পাম্প্কিন, বুকে বড় একটা কালো তিল ছিল, বোঁটার মতই বড়, নাইস, নাইস গার্ল ছিল হেনরিযেটা, কেম্ব্রিজে পোশাকের দোকানে কাজ করত, আবার রাত্রিতে পড়তও। সে পৃথিবীর কুমারী কন্যা ছিল, তাতে জনার্দন দীক্ষিত ছিল না, দীপংকর দয়াল আব মহিমপুরের মাতাজী ছিল না, গৌতম, আমি অন্য-এক তুই ছিলাম, তুই হেনরিয়েটাকে চিনিস, ও কি এখন লন্ডনে বাস করছে? যদি দেখা হয় ওকে বলবি আমার কথা? বলবি, ঝা, যে তোমাকে প্রায়ই সিনেমায় নিয়ে যেত আর আইসক্রিম খাওয়াত, আর তোমার সঙ্গে প্রেম করত? বললে, দেখবি, চিনতে পারবে, নামটা হেনবিয়েটা, হেনরিয়েটা ম্যাকডোনাল্ড, একদিন কি হয়েছিল বলব? সে দারুণ মজার কাহিনী, এখন, হঠাৎ, সব মনে পড়ছে। শুনলে তোর ভীষণ হাসি পাবে, একদিন।—

'কি হে, বনমালী, একা একা বসে মদ খাচ্চ আর মিটমিট হাসছ? দেখে মনে হচ্ছে জীবনটা বেশ উপভোগ করছ।'

বনমালীশংকর ঝা তাকিয়ে দেখলেন ত্রিলোচন মুলগাওকর। স্বাস্থ্য ও জন্ম-নিযন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি। বনমালীশংকর ঝা'র থেকে চার বছরের জুনিয়র আই-সি-এস। ঝা পছন্দ কবেন না মুলগাওকরকে, মুলগাওকর ঝা'কে। ঝা মনে করেন মুলগাওকর মন্ত্রী-তুষ্টির জন্যে আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা অনেকখানি বর্জন কবতে রাজি : মন্ত্রীদের রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতেও তার আপত্তি নেই। ঝা'র মনে আছে নেহেরু-পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের মধ্যে বিরোধের সময় দিল্লিতে এ-আই-সি-সি'র যখন সভা বসল, মুলগাওকর এবং আরও কয়েকজন সিভিল সার্ভেন্ট নেহেরু-সমর্থকদের হয়ে রীতিমত ক্যানভাস করেছিল মেম্বরদের ঘরে ঘরে। মুলগাওকর মনে করে, ঝা 'ওল্ড বৃটিশ হ্যাট', স্বাধীন ভারতের দাবি মেটাতে অক্ষম।

ঝা বললেন, 'পুরনো অভ্যেস।'

'আজ অবশ্য তোমার খুশি হবার বিশেষ কারণ আছে। তা একা একা সেলিব্রেট করছ কেন?'

'এটাও পুরানো অভ্যেস।'

'তোমার গ্লাস তো খালি। এসো, আর একটু নাও। আমি খাওয়াচ্ছি তোমাকে। ইউ ডিজারভ্ ইট।'

'না, ধন্যবাদ, ত্রিলোচন। তিন পেগ হয়ে গেছে। আর নয়।'

'বনমালী, তোমার কাছে তিন পেগ কি?'

'আজ মাতাল হবার ইচ্ছে নেই।'

'ও. কে.। শুনেছ, প্রাইম মিনিস্টর একটা বড় রকমের সেক্রেটারি আদলবদলের প্ল্যান করেছেন?'

'তাই নাকি?'

'তাই তো শুনছি। শুনছি আমাকে কোম্পানি ল'তে যেতে হবে। ওয়েল, আই কান্ট্ সে আই উড্ মাইন্ড।'

'স্ত্রীলোকদের লুপ পরাতে পরাতে থকে গিয়েছ মনে হচ্ছে।'

'তোমাকে অন্য কোথাও যেতে হবে, বনমালী।'

'যেতে হলে যাব। আচ্ছা, আমি এখন উঠব। বাই বাই।'

বার-রুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় বনমালীশংকর ঝা আর একবার রীটা সিংকে দেখে নিলেন। এখনও বেশ শরীর রেখেছে রীটা সিং, মাই গড, চৌলিটা এত স্বল্প যে টরসো'র তিন ভাগ নগ্ন : কে বলবে আমাদের মেয়েরা পরিকল্পিত নগ্নতায় পশ্চিমের মেয়েদের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে, নরেন্দ্র সিং তার সঙ্গিনীকে নিয়ে নিরালা এক কোণে বসে মদ খাচ্ছে, তার বাঁ হাতে সঙ্গিনীর কোমর বেষ্টিত, খাসা আছে ফরেন সার্ভিসের লোকগুলো, বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চললেন বনমালী, হাতঘড়িতে দেখলেন আটটা বাজতে সতের, গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বললেন মীনাবাগ।

মীনাবাগের চুয়াল্লিশ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপলেন বনমালী দরজা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন, 'আরে, বনমালী, তুমি! এস, এস, এস তোমাকে এভাবে ঘরে পাওয়া বিশেষ দুর্ঘটনা।'

'হঠাৎ ইচ্ছে হল, চলে এলাম। তুমি ব্যস্ত নও তো?'

'তোমার হঠাৎ-আসাটা এমন নিয়ম-ভঙ্গ যে আমার ব্যস্ত থাকা না থাকা অবান্তর বোসো। কি খাবে? চা না কফি?'

'কিছু না। এখন বাড়ি যাই নি। ক্লাব থেকে সোজা চলে এলাম।'

'অরুণা ভাববে না? ফোন ক'রে দেবে?'

'অরুণা জানে ফিরতে দেরি হবে আমার। ফোন করার দরকাব নেই।'

'আরাম ক'রে বোসো। এই চেয়ারটায়। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'বয়স তো কম হ'ল না। বুড়ো হয়ে গেলাম।'

'তুমি কখনও বুড়ো হবে না। এ বয়সে তোমার মতো চেহারা ক'জনের আছে'

'তোমাকেও আমি একই প্রশ্ন করতে পারি।'

'আমি? আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি। দেখছ না চুল পেকে গেছে। চলতে ফিরতে টের পাই দেহ নোটিশ দিচ্ছে। আজকাল সহজেই থকে যাই।'

'আমরা কেউ আর ছোকরা নই। তবু তোমাকে দেখলে মনে হয়'—

বেদ মেহ্‌তা লজ্জায় লাল হলেন। শাড়ির আঁচল বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'থামো। কে না জানে স্ত্রীলোক দেখলেই তুমি উদার। তার ওপর এসেছ ক্লাব থেকে। দু'চার গেলাস নিশ্চয় পেটে গিয়ে থাকবে।'

'মাথাটা ব্যথা করছিল দুপুর থেকে। তিন পেগ খেতে সেরে গেল।'

'দুটো এনাসিনেও সেরে যেতো।'

'সমান সারা নয়, ও তুমি বুঝবে না। সারাটা জীবন নিরামিষ কাটিয়ে দিলে। তবু তুমি বেশ আছ। অলওয়েজ লিভিং ফর এ কজ। তোমার কাছে এলে মনটা শান্ত হয়।'

'আজ বুঝি খুব অশান্ত তোমার মন?'

'না, ঠিক তা নয়। বিস্বাদ। মাঝে মাঝে আজকাল এমন হয় দেখতে পাচ্ছি। মনে হয়, ঠিক চলছে না রেলগাড়ি। লাইনের গোলমাল হয়ে গেছে।'

'কোন রেলগাড়ি?'

'এই ধরো, দেশ, গভর্নমেন্ট, তোমরা, আমরা।'

'বনমালী, তোমরাই তো এঞ্জিন চালাচ্ছ। লাইনের গোলমাল হলে তার দায়িত্ব তো তোমাদের।'

'ঠিক বললে না। এঞ্জিন আমরা চালাচ্ছি না। তোমরা যখন স্বাধীনতা পেলে, এঞ্জিন চালাবার ভার যদি পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিতে, হাজার হাজার কর্মী ছিল তোমাদের, তাদের লাগিয়ে দিতে এঞ্জিন চালাবার কাজে, তা হলে নির্দিষ্ট পথে হয়তো দেশটা চলত। তা না ক'রে তোমরা হলে সারথি, আর রথের ঘোড়া করলে আমাদের। অথচ আমাদের চালিয়ে নেবার ক্ষমতা তোমাদের ছিল না। ইংরেজের তৈরি প্রশাসন যন্ত্র এবং যন্ত্রীদের দিয়ে নতুন স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়বার অপচেষ্টার জন্যে দায়ী তোমরাই, আমরা নই। যদি পুরোপুরি আমাদের হাতে এঞ্জিন চালাবার ভার থাকত তা হলেও দেশটা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাছাকাছি হয়তো পৌঁছে যেত।'

বেদ মেহ্‌তা বনমালীশংকর ঝা'র কাছাকাছি চেয়ার টেনে বসলেন। মৃদু হেসে বিস্ময়ের স্বরে বললেন, 'তোমার কিছু একটা ঘটে থাকবে আজ। তোমাদের রথের ঘোড়া করে দেশটা যে চলতে পারছে না এতবড় স্বীকারোক্তি তোমার মত আই-সি-এস'এর কাছে সহজে শোনা যায় না।'

'সকাল থেকে এ কথাটাই বার বার মনে হচ্ছে। বেদ, জনার্দন দীক্ষিতের মন্ত্রিত্ব গেছে, জানো তো?'

'অপমান কোরো না। ভুলে যেয়ো না আমি কংগ্রেসি এম. পি.'।

'হ্যাঁ, মনে পড়ল বটে। আমার খেয়ালই থাকে না তুমি এখনও কংগ্রেসি এম. পি.। আমার কাছে তুমি এখনও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্রোহী ছাত্রী, বেদ মেহ্‌তা।'

'স্ত্রীলোক দেখলে এখনও তুমি মন-ভোলানো কথা শুরু করো। বয়েস তো কম হল না।'

'মাত্র ছাপ্পান্ন।'

'অরুণা তোমাকে এত বছর সামলাল কি করে তাই ভাবি।'

'সামলাতে পেরেছে এ খবরটা তুমি কোথায় পেলে?'

'সি. বি. আই. থেকে। যাক গে, জনার্দন দীক্ষিতের মন্ত্রিত্ব টিকবে না সবাই জানত। তিন বছর যে টিকল এটাই আশ্চর্য।'

'তিন বছর মন্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও হয় নি আমার, পদে পদে মতবিরোধ। তিন বছর দেখে এসেছি, পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের রথ না চালিয়েছেন জনার্দন দীক্ষিত, না বনমালীশংকর ঝা। ফলে, কাজ যা হতে পারত তা হয় নি। পঞ্জাব ও মহীশূরকে আমরা পুরোপুরি ইলেকট্রিফাই করতে পারতাম, প্রতি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যেত, শিল্প গড়ে উঠত, কৃষি-বিপ্লব শুরু হয়ে যেত। জনার্দন দীক্ষিত চাইলেন রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন শুরু হোক মধ্যভারতে, রাজস্থানে আর উত্তরপ্রদেশে। আমি ইউ পি.'র আই-সি-এস, তবু আমি জানি, গ্রামে বিদ্যুৎ এলে যে রাজ্য দু'টি সর্বপ্রথম শিল্প ও কৃষি-বিপ্লব আনতে পারবে তারা ইউ. পি. ও মধ্যভারত নয় ; পঞ্জাব এবং মহীশূর।'

'তুমি তো শেষ পর্যন্ত জিতলে।'

'বাজে কথা বোলো না। এবার যিনি মন্ত্রী হবেন তিনি হয়তো বলবেন, সবার আগে বিহার অথবা অন্ধ্রপ্রদেশ।'

'তোমাদের বিশেষজ্ঞরা কি বলেন?'

'তারা যে-পাল্লায় ক্ষমতা, সেদিকে ঝোঁকে। একটি ব্রিলিয়ান্ট এঞ্জিনিয়ারকে আমি নিজে আমেরিকা থেকে আনিয়েছি, বাঙালি ছেলে, নাম বঙ্কিম ঘোষ। রুরাল ইলেকট্রিফিকেশনের ভার পেয়ে তার আনন্দ ও উৎসাহ যদি দেখতে। দেড় বছরে ছোকরা শ'তিনেক ফাইল ছাড়া বিশেষ কিছু তৈরি করতে পারে নি। অপেক্ষা করছি এবার একদিন এসে বলবে, আমি চললাম, আমার আর ফাইল তৈরি পোষাচ্ছে না।'

'তোমার মুড্‌টা আজ একটু বিষণ্ণ দেখছি। শরীর ভালো আছে তো?'

'শরীরের কোনও গুরুতর অপরাধ এখনো হয় নি। কি জান, সব সময় একটা মেকি মাহাত্ম্যের মধ্যে থাকতে থাকতে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।'

'মেকি বলছ কেন? তোমাদের মত প্রিভিলেজড্ ক্লাস্ দেশে আর আছে নাকি? সত্যিকারের বলতে গেলে আমাদের সংবিধান মাত্র দু'টি অভিজাত শ্রেণীকে স্বীকৃতি দিয়েছে : প্রিনসেস এবং আই-সি-এস। প্রিনসেসদের আছে প্রিভি পার্স, তোমাদের এক-জাহাজ বোঝাই প্রিভিলেজ। তোমাদের একজন তো বিনি পয়সায় সপরিবারে 'হোমে' যাবার অধিকারের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে কেস করে জিতে গিয়েছিল। নামটা ভুলে গেছি, তোমার নিশ্চয় মনে আছে।'

'আছে। বলব?'

'থাক। আমার তোমাদের ওপর যতটা রাগ হওয়া উচিত, হতে পারে নি, তার কারণ তুমি।'

'মিথ্যে হলেও বুড়ো বয়সে শুনতে ভালো লাগছে, বেদ।'

'লোকটার নাম, তবু, মনে পড়ে গেল। পুরো পেনসন ইত্যাদি সব আদায় করে পদত্যাগপত্রে লিখেছিল, 'যে সরকারি আবহাওয়া দেশে সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে আমার প্রাণ আর মানিয়ে চলতে পারছে না।'

'এবারে কিন্তু তুমি রেগে যাচ্ছ।'

'বেয়াদবির একটা সীমা থাকা উচিত, উচিত নয়? কিছুদিন আগে একটা বই পড়ছিলাম। ডজন খানেক আই-সি-এস-এ জবানবন্দী। প্রত্যেকে কবুল করেছে যৌবনে তাদের দেশপ্রেম কি উগ্রই না ছিল। একমাত্র দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা সবাই আই-সি-এস হয়েছিল। এবং দেশ স্বাধীন হবার পর একমাত্র দেশসেবা ছাড়া আর কিছুই তারা কেউ করে নি। ঐ যে লোকটি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সরকারি খরচে বিলেত যেতে বাধা পাওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে কেস করেছিল, সে-ও লিখেছে, স্কুলের বয়স থেকেই সে স্বদেশী শোভাযাত্রা করত, আর আই-সি-এস পরীক্ষা পাস ক'রে ভারতবর্ষকে ধন্য করেছিল কেবলমাত্র তার মায়ের আশ্বাস-বাণী শুনে। মা কি বলেছিল শুনবে? মা নাকি বলেছিল, আমার বুকের দুধ খেয়ে যে বড় হয়েছে তার দ্বারা দেশের উপকার ব্যতীত আর কিছু হ'তে পারবে না।'

'বইটে আমি পড়েছি।'

'তোমাদের এটুকু সৎসাহস নেই কেন যে, বলতে পারো না, তোমরা ইংরেজের ভারতবর্ষে সবচেয়ে সেরা চাকুরি পেয়েছিলে, পাবার পর বশংবদ হয়ে ইংরেজের সেবা করেছ, দেশ স্বাধীন হবার পরও, ঈশ্বরের কৃপায়, তোমরা যা ছিলে তার চেয়ে

দশগুণ বেড়ে গেছ, এবং তাকডুমাডুমতাক, দিব্যি আছ, খাসা আছ, মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক, অনেক খাসা আছ।'

'তুমি যে বইটার কথা বললে তাতে একজন কি আত্মতুষ্টির সঙ্গে লিখেছে যে, সরোজিনী নাইডু একদা তার অতিথি ছিলেন, এবং স্নানের ঘরে বসে বসে একটি কবিতা রচনা করে তাকে উপহার দিয়েছিলেন।'

'ওটাই হল গোড়ার গলদ, বুঝলে? আমাদের নেতারাও সব আই-সি-এস হ'তে চেয়েছিলেন। রাজেনবাবুর মতো অমন দেশসেবক, তিনিও তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, আই-সি-এস হবার বড় ইচ্ছে ছিল আমার, নেহাত বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন আমার বিরহে বেঁচে থাকবেন না এ ভয়েই আমি বিলেত যাই নি পরীক্ষা দিতে। সরোজিনী নাইডুও বোধহয় আই-সি-এস স্বামী পেলে বেশি খুশি হতেন।'

'তুমি হ'তে না?'

'ভুলে গেছ? তুমি যেদিন বললে আই-সি-এস হবার জন্যে বিলেত যাচ্ছ, সেদিন আমি কি বলেছিলাম?'

'এক দিনের জন্যেও ভুলি নি, বেদ। বলেছিলে, তুমি আমার শত্রু হয়ে ফিরে আসবে। প্রয়োজন হ'লে আমি তোমাকে নিজের হাতে হত্যা করব।'

'ভাগ্যিস প্রয়োজন হয় নি।'

'তুমি বোধহয় জান না, বালিয়াতে আমি তখন ডি. এম., আর তুমি '৪২ সালের বিদ্রোহে নেতৃত্ব করছ। আমার উচিত ছিল তোমাকে পাকড়াও ক'রে জেলে আটকে রাখা। তোমার গতিবিধি সব আমার জানা ছিল, কিন্তু তোমার গ্রেফতার হ'তে আমি দিই নি।'

'যখন টের পেলাম, তার পরের দিনই বালিয়া ছেড়ে আমি লক্ষ্ণৌ চলে গেলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে পুলিশ ধ'রে ফেলল। আসলে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিকস করতে জানতাম না। আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল জেলে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দী হওয়া। দেশকে স্বাধীন করা নয়।'

'সময়ের কি সুন্দর রসিকতাবোধ, আজ তুমি এম. পি., আমি সেক্রেটারি একই এসটাব্লিশমেন্টের আমরা অংশীদার।'

'আমি আর একটু সৌভাগ্যবতী হলে তোমার মন্ত্রীও হয়ে বসতে পারতাম।'

'সর্বনাশ হ'য়ে যেত তা হ'লে। আমি নির্ঘাত নতুন ক'রে তোমার প্রেমে পড়তাম।'

'সে অপরাধে আমি তোমাকে বরখাস্ত ক'রে দিতাম, তা জানো?'

'আই-সি-এসকে বরখাস্ত করা সহজ নয়, তার চেয়ে বরদাস্ত করা বরং সহজ।'

'তোমাকে নিয়ে, বনমালী, এই রয়ে গেল আমার আজীবন সমস্যা। তোমাকে না পারলাম বরদাস্ত করতে, না বরখাস্ত।'

'মাঝে মাঝে আমি ভাবি, আই-সি-এস না হয়ে তোমার মতো স্বদেশী করলে বেশ হ'ত। তোমাকে বিয়ে ক'রে স্বামী-স্ত্রী তাহলে একসঙ্গে এতদিনে মন্ত্রিত্ব করা যেত।'

'তুমি পারতে না। আমাদের ছোটবেলা একটা ছোট্ট শ্রেণীর ছেলে ছিল, যারা জন্ম থেকে আই. সি. এস.। পড়াশোনায় তুখোড়, হাবভাবে দশজনের থেকে দশ হাত উঁচু, গায়ে ইংরেজ ইংরেজ গন্ধ, দৃষ্টিভঙ্গিতে খবরদারি প্রচ্ছন্ন। আমরা কলেজে তেরঙ্গা পতাকা আর বন্দেমাতরম্ দিয়ে ইংরেজ তাড়াবার পাঁয়তারা কষতাম, তুমি দূর থেকে সামান্য কৌতূহল আর অসামান্য অশ্রদ্ধা নিয়ে দেখতে, আর ভাবতে কবে এদের শায়েস্তা করার সুযোগ মিলবে।'

'যদি তাই হ'ত তাহ'লে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ত না।'

'বিপরীতের পারস্পরিক আকর্ষণ। আমার মুশকিল কি জানো? অনেক বড়ো কিছু একটাকে না ধ'রে আমি বাঁচতে পারি নে। ছোটবেলায় ইংরেজ তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করাকে বিরাট বড়ো কিছু মনে হ'ত। দেশ স্বাধীন হবার পর বড়ো আর কিছু রইল না। তখন তুমি যদি অবিবাহিত থাকতে হয়তো তোমাকে বিয়ে ক'রে বসতাম। তাহ'লে আর এই এম. পি. হবার জন্যে মন্ত্রীদের হাতেপায়ে ধরতে হ'ত না প্রতি পাঁচ বছর অন্তর।'

'দেশ-গড়াও তো বড়ো কিছু হ'তে পারত?'

'সে সুযোগ পেলাম কোথায়? দেশ-গড়ার ভাব নেতারা আমাদের না দিয়ে, দিলেন তোমাদের হাতে। ধরো, আমি যদি স্বাধীন ভারতে বালিয়া জেলার ডি. এম হতাম! ওখানকার হাজার হাজার মানুষ আমার চেনা-জানা, তাদের সঙ্গে আমার অন্তরের সম্পর্ক। তাদের মাধ্যমে আমি বালিয়াকে নতুন ক'রে গড়তাম। আমি না হ'য়ে বালিয়ার ডি. এম. হ'ল তোমার মতোই একজন আমলা। আমি হলাম এম. পি। এম. পি'রা কি দেশ গড়ে? তারা কেবল আবার এম. পি. হ'তে চায়।'

'তুমি তো কংগ্রেসে থেকেও বিরোধী দলের লোক। এজন্যেই এখনও মন্ত্রী হ'তে পারলে না।'

'উপায় কি বলো? দল ছাড়লে রাজনৈতিক মৃত্যু। দলের নেতৃত্ব যাঁদের, তাঁদের দেখে দেখে অরুচি হ'য়ে গেছে। দলে থেকেও যতোটুকু বামপন্থী আওয়াজ করা সম্ভব, তার বেশি আমরা করি নে। যেটুকু করি তাতে সংবাদপত্রে নামটা বেঁচে থাকে, কর্তারা মাঝে-মধ্যে একটু নজর দেন, ওতে দেশের কিছু যায় আসে না, আমাদের

পুনর্নির্বাচনের পথটা মোটামুটি তৈরি থাকে।'

'তোমার কম্যুনিস্ট হওয়া উচিত ছিল।'

'ওদের দশা তো আমাদের চেয়েও অধম। ওরা কংগ্রেসের লেজ ধরে ঝুলছে, পার্লামেন্টারি পলিটিকস্ করতে করতে চমৎকার ভদ্রলোক হয়ে গেছে। ওরা না শাসন করছে, না সংগ্রাম। গৌতমের খবর কি?'

'যতদূর জানি, ভালোই।'

'প্রকৃতির পরিহাস বড়ো মর্মান্তিক, বনমালী। তোমার ছেলে কম্যুনিস্ট হবে, কেউ ভাবতে পেরেছে?'

'গৌতম? গৌতম তো বই-পড়া কম্যুনিস্ট। পার্টি-ফার্টিতে ভেড়ে নি কখনও। দেশে থাকলে হয়তো ভিড়তে পারত। তাই বিলেত পাঠিয়ে দিলাম।'

'বুদ্ধিমানের কাজে করেছিলে। ইংলন্ডে লেবার পার্টি ক্যাপিটালিজম্ গড়ছে, কম্যুনিস্টরা প্রায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। গৌতম দেখবে পুরোপুরি বুর্জোয়া হ'য়ে ফিরে আসবে।'

'আমিও তাই আশা করছি।'

'অবশ্যি, তোমার দেওয়া চাকরি হয়তো গৌতম নেবে না। আমাকে অন্তত তাই বলেছিল যাবার আগে দেখা করতে এসে। তবে তোমার সম্পত্তি পেতে আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা আসলে হাড়ে হাড়ে বুর্জোয়া। এবং ফিউডাল। তুমি শুধুই ঘাবড়িয়ে ছিলে গৌতমকে নিয়ে। তোমার ছেলে ঠিক আছে, বনমালী। গোলমাল বরং তোমাকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে? কেন? কিসের গোলমাল?'

'অনেক। আজ পর্যন্ত ঠিক করতে পারলে না তুমি কে, তুমি কি? ভুলতে পারলে না, ইংরেজ আর নেই, এখন শাসক হচ্ছে জনার্দন দীক্ষিত। পুরানো আই. সি. এসি. চালে চলতে গিয়ে কেবল মন্ত্রীদের সঙ্গে তোমার ঝগড়া। দু' বছর পর যখন অবসর নেবে, ভাবছ প্রধানমন্ত্রী তোমাকে কোনও রাজ্যের গভর্নর ক'রে দেবেন? মোটেই না। আই-সি-এস গভর্নর হয় তারাই, যারা মন্ত্রীদের ইচ্ছামতো রাজনীতি করতে প্রস্তুত। এদিকে, যতোদূর জানি, প্রাইভেট সেক্টরে একটা সিংহাসন তৈরি ক'রে রাখার মতো সুবুদ্ধিও এখনও তোমার হ'ল না। তিন-চার লাখ টাকা নিয়ে না হয় রিটায়ার করলে, কিন্তু আশী বছর যদি বেঁচে থাকো, করবেটা কি ভেবে দেখেছ তাছাড়া, অরুণার অবস্থাটা কি হবে? তুমি রিটায়ার করবে ভেবে ভেবে ওর নার্ভাস ব্রেকডাউন হবার যোগাড়। আই-সি-এস'এর স্ত্রী না হ'য়ে বেচারা একদিনও বেঁচে থাকতে পারবে না। অরুণার জন্যেও অন্তত তোমাকে হয় গভর্নর নয় বড়ো একটা

কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হ'তে হবে। যদি এ পথে এগোবার সৎসাহস না থাকে, অন্তত ইউ. এন'এ একটা কাজ বাগাতে পারো কি না দেখ।'

'এর কোনওটাই পারবো না, তুমি ভালোই জান। রিটায়ার করার দু'বছরের মধ্যে বেসরকারি কাজ নেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। লোকে ভাববে আমি ওটা চাকরি-জীবনেই গুছিয়ে নিয়েছি।'

'তাহ'লে কি করবে?'

'দু'বছর অনেক সময়, বেদ।'

'বাজে কথা।'

'আর কিছু না হলে, 'আনন্দ-সঙ্ঘে' যোগ দেব। মহিমপুরের মাতাজীকে দেখে ভালোই লাগল।'

'পারবে না। আনন্দ মহারাজ তোমাকে নেবেন না। ভগবানের আশ্রয় পাবার যোগ্যতা তোমার নেই। আনন্দ মহারাজ কেবল তাদেরই আশ্রয় দেন যারা কালোবাজারে পয়সা কামিয়ে, ঘুষ নিয়ে, চুরি ক'রে, লোক ঠকিয়ে, আরও দশরকম অন্যায় পথে ধনী হ'য়ে জর্জরিত-বিবেক। আনন্দ মহারাজ তাদের বিবেক-রক্ষার ভার নেন, যাতে তারা পুরোদমে নিজেদের কাজ ক'রে যেতে পারে।'

'মহিমপুরের মাতাজীকে চেন?'

'না। নাম শুনেছি।'

'দেখতে বেশ।'

'বনমালী, যৌবনকালেই অন্য মেয়েদের প্রশংসা ক'রে, তাদের পেছনে ছুটে তুমি কখনও আমাকে ঈর্ষান্বিত করতে পারো নি। ঐ একটা অনুভূতি আমার একেবারে নেই। আজ পর্যন্ত কাউকে হিংসা বা ঈর্ষা করতে পারলাম না। তুমি যখন অরুণাকে বিয়ে করবে জানলাম, আমার না হ'ল ঈর্ষ্যা, না দুঃখ। বরং বেশ আনন্দ হ'ল। মনে হ'ল, তুমি উপযুক্ত স্ত্রী পাচ্ছ, অরুণা ঠিক-ঠিক আই-সি-এস-গৃহিণী হবে। এখন এই চুয়ান্ন বছর বয়সে, ছাপান্ন বছরের তুমি কোন্ পুরের কোন্ মাতাজীকে দেখে মজলে তা নিয়ে মাথাব্যথা আমার নেই। শুধু তোমাকে ব'লে রাখছি, এখনও দু'বছর সময় আছে, ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নাও। যদি গভর্নর হ'তে চাও, এ দু'বছর দম আটকে মন্ত্রীভজন করো, কংগ্রেসি রাজনীতিতে গা ঢাকা দিয়ে ঢুকে পড়ো, দেখতে পাবে তোমাদের জাতভাইদের অনেকেই তথায় বর্তমান। যদি না চাও, তবে কোম্পানিগুলির কোনও একটাতে সিংহাসন তৈরি করো। আমি এম. পি. না হ'য়েও বেঁচে থাকবো, তুমি কেউ-কেটা না হ'য়ে বেঁচে থাকতে পারবে না।'

'আমাকে নিয়ে তোমার এ দুশ্চিন্তাটুকু দেখতেও ভালো লাগছে।'

'কিন্তু আর বেশি ভালো লাগা ঠিক হবে না। ন'টা বেজে গেছে। অরুণা জানে তুমি এখানে?'

'না।'

'তাহ'লে এবার তোমার ওঠা উচিত। অরুণা তোমার জন্যে ডিনার নিয়ে বসে আছে।'

'হ্যাঁ, উঠতে হবে এবার। দিল্লিতে এই একটা স্থান আছে, যেখানে এলে আমি পুরোপুরি রিলাক্স করতে পারি। যেখানে আমার একটুও টেনশন হয় না। বেদ, অনেক সৌভাগ্য, তোমার আমার বিয়ে হয় নি।'

'বনমালী, এ বিষয়ে কোনওদিন আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, আজও নেই।'

বাড়ি ফিরে বনমালীশংকর যা দেখলেন, অরুণা সত্যি অপেক্ষা করছেন।

'তুমি খেয়ে নিয়েছ তো?' পোশাক বদলাতে বদলাতে প্রশ্ন করলেন বনমালী। 'বড্ড দেরি হ'য়ে গেল। কেউ এসেছিল কি?'

'না, কেউ আসে নি', বললেন, 'অরুণা, এবং সঙ্গে সঙ্গেই, 'শুধু রমা এসেছিল ঘণ্টাখানেকের জন্যে।'

'কোন্ রমা?'

'রমা আহুজা।'

'কেন?'

'এমনি। বেড়াতে।'

'শোনো অরুণা। রমা আহুজাকে তোমার খুব পছন্দ হ'তে পারে। কিন্তু স্বামীর চাকরি বিষয়ে তদ্বির করতে আমার বাড়িতে কেউ আসুক, এটা আমার একেবারে অপছন্দ। তুমি ওকে প্রশ্রয় দিও না।'

'সে জন্যে আসে নি রমা আহুজা। এমনি এসেছিল। তাহলেও অশোক আহুজা লোকটা ভালো. ওকে একটু সাহায্য করতে তোমার এত আপত্তি কেন বুঝতে পারি নে।'

'লোক ভালোমন্দের কথা নয়। কথা হ'ল যোগ্যতার। যোগ্যতা থাকলে, কাজটা ও পাবে। সিলেকশনের ভার আমার ওপর নয়। সে জন্যে একটা পুরো কমিটি আছে।'

'কমিটি থাকলেও তুমিই সব, সবাই জানে।'

'বাজে কথা বোলো না।'

'দেখ, চেঁচিও না। তুমি জানো টেনশন আমার একেবারে সহ্য হয় না। না চেঁচিয়ে কি একটা কথাও বলতে পারো না?'

'সরি। একটু জোরে বললেই যদি চেঁচান হয় তাহলে তো মুশকিল।'

'আসলে তুমি আমার অসুখটা নিয়ে কেয়ারই করো না। অশোক আহুজাকে একটু সাহায্য করলে'—

'তুমি খেয়ে নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি খেয়ে নিচ্ছি। তুমি আসবে?'

'তুমি বোসো গিয়ে, আসছি।'

খেতে ব'সে বনমালী অরুণার সারাদিনের কাজকর্মের বিবরণ 'রমীর জন্যে একটা শাড়ি কিনলাম। দামটা একটু বেশিই বোধহয় হ'ল। দু'শো তিরিশ টাকা।'

'হুম্।'

'তারপর জনকল্যাণ সমিতির সভা ছিল। আমরা একটা স্কুল করব ঠিক করেছি।'

'হুম্।'

'আচ্ছা, তুমি তো পি. বি. সকসেনাকে খুব জান। এক সময় তোমার নিচে ডেপুটি সেক্রেটারি ছিল।'

'হুম্।'

'সকসেনা এখন রিহ্যাব্ মিনিস্ট্রিতে জয়েন্ট। ওকে একটু বলে দেবে? আমাদের কিছু টাকা দরকার।'

'তোমরা বল।'

'আমরা তো বলবই। তুমি বলে দিলে'—

'জনকল্যাণ সমিতি তোমাদের, আমার নয়।'

'তার জন্যে তুমি আমাদের একটু সাহায্য করবে না?'

'না। এজন্যে নয়, যে একবার এ সব শুরু হ'লে তার আর শেষ নেই। জীবনে কোনওদিন তুমি যে কাজ আমাকে দিয়ে করাতে পারো নি, এখনও তারই জন্যে চাপ দিয়ে চলেছ।'

'চেঁচিও না! প্লিজ, শব্দ শুনলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে। তুমি যদি এমন গোঁয়ার না হ'তে তাহ'লে তোমার এ অবস্থা হ'ত না। দু'বছর তো আর মাত্র চাকরি আছে। তারপর কি করবে? তুমি ভাবছ ওরা তোমাকে গভর্নর ক'রে দেবে? কিচ্ছু করবে না তোমার জন্যে ওরা। তুমি কেবল ঝগড়া ক'রে চলেছ মন্ত্রীর পর মন্ত্রীর সঙ্গে। শুনেছ তোমার জন্যে এবার কি ঠিক করেছে ওরা? তোমাকে সেক্রেটারিয়েট

থেকে সরিয়ে কি একটা কমিশনের চেয়ারম্যান ক'রে দেবে। স্মল-স্কেল ইন্ডাস্ট্রি কমিশন। শুনেছ?'

'না। কে'বলল।'

'মিসেস আদারকার।'

'কে বলেছে তাকে?'

'কে আবার বলবে? মিঃ আদারকর।'

'সে জানবে কি ক'রে?'

'তা আমি কি জানি?'

'যা জানো না তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। দু'বছর চাকরি আছে, যা করতে বলবে তাই করব। তুমি এবার শুয়ে পড়ো। আমার কাজ আছে।'

লাইব্রেরি আর নিজস্ব অফিস নিয়ে বাড়ির একটা ঘর। বনমালীশংকর ঝা ঘরে এসে, আলো জ্বেলে দেখতে পেলেন টেবিলে আজকের চিঠিপত্র চাকর গুছিয়ে রেখেছে। চিঠিগুলি পড়লেন, অনেকটা না-পড়ার মতো। এলাহাবাদ থেকে খুড়তুতো ভাই বানোয়ারীশংকর ঝা লিখেছেন, ডিসেম্বরে তাঁর দিল্লি আসার সম্ভাবনা, ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে, বনমালী একটু মদত দিলেই তাঁর নতুন লাইসেন্সটা হ'য়ে যায়, যার অভাবে তিনি ব্যবসায়কে ঠিকমতো প্রসারিত করতে পারছেন না ; লুধিয়ানা থেকে নেমন্তন্ন এসেছে কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেমিনারে উপস্থিত থাকার ; বেনারস থেকে বনমালীর একদা-সহপাঠী অধ্যাপক অনন্ত গোপাল দুবে লিখেছেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দর্শনের অধ্যাপক করতে চায়, বনমালী এ বিষয়ে যদি পরামর্শ দেন তাহ'লে তাঁর সিদ্ধান্ত নেবার সুবিধে : শ্রীনগর থেকে চিঠি লিখেছে শ্রীধর পাণ্ডে, আই. এ. এস., এক সময় পুর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি ছিল, বর্তমানে কাশ্মীর গভর্নমেন্টে জয়েন্ট সেক্রেটারি, তার দিল্লিতে বদলি হবার কাকুতি জানিয়ে, প্রার্থনা ক'রে বনমালীর সামান্য সাহায্য। রোজ আসে এ ধরনের চিঠি, নিকট, কিছু-দূর, অনেক-দূর আত্মীয়দের কাছ থেকে, পুরাতন সহকর্মীদের, বন্ধুদের, পরিচিতদের কাছ থেকে। সবারই কিছু না কিছু, আরও কিছু, চাই, এবং চাই বনমালীশংকর ঝ'র কৃপা, মদত, সাহায্য। বনমালীশংকর ঝা যেন খুদে-ঈশ্বর, যে যা চাইবে, যার যা আকাঙ্ক্ষা, সব যেন পূর্ণ করবার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা তাঁর আছে। ওদের দোষ নেই, মনে মনে পুনরায় বললেন বনমালীশংকর ঝা, আমরাই নিজেদের খুদে-ঈশ্বর বানিয়ে রেখেছি, ন্যায় ভাবে হোক, অন্যায় ভাবে হোক, পুরস্কার বিতরণ ক'রে আমরা বহুকে আমাদের বংশবদ ক'রে না রেখে পারি নে। ফলে এ দেশে কারুর আর কোনও অধিকার নেই, আছে কেবল ফেবর। কেউ নিজের যোগ্যতার, অধিকারের দাবিতে

কিচ্ছু পায় না, পায় আমাদের করুণায়, আমাদের সেবার পুরস্কার। চিঠির জবাব লিখতে ব'সে গেলেন বনমালীশংকর ঝা; পত্রের জবাব দেওয়া চিরদিনের চারিত্রিক শৃঙ্খলা, সম্প্রতি দেখেছেন রোজকার চিঠির জবাব রোজ না লিখলে অনেক চিঠির জবাব দেওয়া হ'য়ে ওঠে না। খুড়তুতো ভাইকে লিখলেন, লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়া তাঁর ক্ষমতার বাইরে, এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু আশা করা উচিত হবে না, কিন্তু তিনি যদি দিল্লি থাকাকালীন বনমালীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন, সুখকারক হবে। লুধিয়ানায় লিখলেন, সেমিনারে, অন্য জরুরি কাজবশত, উপস্থিতি সম্ভব হবে না ; দুবেকে লিখলেন তাঁর দিল্লি আসার সম্ভাবনায় তিনি অত্যন্ত প্রীত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি জানেন না কিছুই, তা ছাড়া, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দুবেকেই। শ্রীধর পাণ্ডেকে লিখলেন, শ্রীনগরে তোমার তক্‌লিফের বিবরণ প'ড়ে দুঃখ পেলাম। দিল্লি বদলি হ'তে হ'লে হোম মিনিস্ট্রিতে দরখাস্ত করতে হয়, তুমি নিশ্চয় জানো।

মাথাটা আবার ব্যথা করতে লাগল। গৌতমকে চিঠি লিখতে বসে ব্যথাটা টের পেলেন। তোকে আজ আর লেখা হ'ল না রে গৌতম ; বেদ যা বলল তাই কি সত্যি? আসলে তুই বিদ্রোহী নোস? আসলে তুই-ও বুর্জোয় এবং ফিউডাল? বিলেত থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে কলেজে মাস্টারি ক'রে পাঁচ বছর পরে পরিতাপ করবি কেন বাবার দেওয়া চাকরিটা নিলাম না, কেন হলাম না আই. এ. এস.? না কি সরকারি কোনও নোকরির জন্যে বাবার কোনও একদা সহকর্মীর কৃপাপ্রার্থী হবি? তোর মধ্যে যে বিদ্রোহের আগুন দেখেছিলাম আসলে তা সাময়িক প্রতিবাদের সামান্য ঝিলিক? সে আগুন দেখে ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু বুকের মধ্যে অবাধ্য আনন্দ চেপে রাখতে পারছিলাম না রে গৌতম। মনে হয়েছিল, সারা জীবন যা দেখে এসেছি, বাপ-দাদা-দশপুরুষ যা দেখে গেছেন, সেই সনাতন ভারতীয় তাঁবেদারি বুঝি এবার শেষ হবে। সেই জী-হুজুর, হুজুর-মা-বাপ, বেঁচে-আছি-হুজুরের কৃপায়, সেই হাত-কচলান, ঘোলাটে-চোখ চাপা লোভের ভীরু পায়ে-তেল-মাখা চাকর প্রকাশের অবসান বুঝি সম্ভব হবে। ছোটবেলায়, অনেক অনেক দিন আগে, প্রায় তোরই মতো বয়সে এক ধরনের আগুন দেখেছিলাম যার মধ্যে, ভালো বেসেছিলাম, শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েছিলাম, সে-ই আজ, এই ঘণ্টা দু' এক আগে, কি বলল জানিস? বলল, আগুন নেই, আমার মধ্যে ছিল না, তোমার ছেলের মধ্যেও না। বেদ মেহ্‌তা কি সত্যি বলল, গৌতম? তোকে বিদ্রেহী দেখলে কি আমার সুখ হ'ত? না সুখ হ'ত না রে গৌতম কিন্তু আনন্দ হ'ত। সুখের সন্ধানে আমরা সবাই দিনরাত ছুটে ছুটে অনবরত ছোট হয়ে গেলাম, আনন্দের খোঁজ করবার গরজ রইল না। তবে কি এমনি চলবে

ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস? স্বাধীনতায় আগুন ছিল না, বর্জনের চেয়ে গ্রহণ ছিল অনেক, অনেক, তাই আমার, আমার মতো অনেকের, জীবন বড় সুখে কাটল, জনার্দন দীক্ষিত ঠিকই বলছিল, আমরা হাত বাড়ালেই আঙুর পেলাম, আর বহু, বহু মানুষ শহরে শহরে, রাজ্যে রাজ্যে ছুটল সুখের সন্ধানে, আত্মাকে মুঠোয় চেপে, প্রাণকে বদান্য বড়মানুষের কাছে বন্ধক রেখে, যে যা পারল নিল গুছিয়ে, আরও দাও, আরও দাও, চাই, আরও চাই, আরও, আর শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে অগণিত মানুষ পেল সামান্যই, আর শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার আনন্দে থেকে গোটা দেশটা বঞ্চিত রয়ে গেল। তোরাও কি এই ইতিহাসকেই মেনে চলবি, এই বিনা প্রতিবাদে গ্রহণের ইতিহাস, এই হাত-কচলান হ্যাঁ-হুজুরের ইতিহাস, এই টেবিলের নিচে হাত বাড়িয়ে বাড়তি পাবার ইতিহাস, এই বিনা-বর্জনের, নিশ্বাস চেপে অফুরন্ত নিষ্ফল প্রতীক্ষার ইতিহাস?

আলমারি খুলে হুইস্কির বোতল বার করলেন বনমালী। আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর চোখে রীটা সিং আর নরেন্দ্র সিং-এর সঙ্গিনী আর মহিমপুরের মাতাজী আর হেনরিয়েটা ম্যাকডোনাল্ড আরও অনেকে, একসঙ্গে গোলতাল হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল, অনেক রং, অনেক সুঠাম দেহ, নগ্ন পেট হ্রস্ব চৌলি, প্রগল্‌ভ হাসি, সুগঠিত বুক, আর অনেক কথা, যার কিছু বক্তব্য নেই, কেবল শব্দ, শব্দের তরঙ্গ, একের ওপর অন্যের আছড়ে-পড়া, এবং এক সময়, রাত যখন মধ্যভাগ অতিক্রান্ত, বনমালীশংকর ঝা টের পেলেন, কে যেন ঘরে এল, তাঁকে কি যেন বলল, তার কাঁধে ভর দিয়ে তিনি শোবার ঘরে গেলেন, শুয়ে পড়লেন বিছানায় এবং তখন পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, যদিও অল্প সময়ের জন্য, অরুণার বুকে তাঁর মাথা, এবং জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, এতো রাতে, তুমি কেন, তোমার তো শরীর ভালো নয়, তুমি কেন অরুণা, তুমি কেন।

তৃ তী য় অ ব চ্ছে দ

অবধান

ছাপান্ন বছর আগে বনমালীশংকর ঝা যে পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন তৎকালীন যুক্ত-প্রদেশের আগ্রা জিলায় তাদের বিস্তৃত জমিদারি ছিল। পিতা ললিতশংকর ঝা প্রথম শহরবাসী, বনমালীর শৈশব এবং কৈশোর কেটেছিল আগ্রা শহরে। জমিদারি শাসন করত মাইনে-করা ম্যানেজার, নায়েব এবং অন্যান্য কর্মচাবী, ললিতশংকর আগ্রা জিলা আদালতে ওকালতি করতেন, এক-আধটু নরমপন্থী রাজনীতিও, যাতে ক'রে তিনি দীর্ঘকাল আগ্রা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। জমিদারির সঙ্গে রাও বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন ললিতশংকরের পিতা হরিশংকর, সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের সঙ্গে সহায়তার পুরস্কার। ললিতশংকর মহামান্য ইংরেজ সরকারকে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা, সমীহ, ভয় ক'রে চলতেন, আদালতে সাহেব হাকিম সমাসীন থাকলে তাঁর কণ্ঠস্বর অপ্রয়াসে গদ্‌গদ হ'ত, প্রতি বাক্যের সঙ্গে তিন-চারবার 'ইয়র অনার', মাঝে মাঝে, 'ইয়র গ্রেট অনার' উচ্চারিত হ'ত। দিশী হাকিমকে 'ইয়র অনার' বললে ইংরেজ হাকিমকে 'ইযর গ্রেট অনার' না বলে ললিতশংকর বিবেককে শান্ত করতে পারতেন না। জিলা আদালতে ওকালতি করাব সময় ললিতশংকরের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় হ'ল তনি আই-সি-এস করবেন।

ছেলেটা এ আকাঙ্ক্ষা-তৈরির সহায়ক হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই সর্বদিকে তুখোড়। স্কুলে প্রথম হ'ত পরীক্ষায়, খেলায় ও অশান্ত জীবনশক্তিতে। চেহারাও শাসক হবার মতো। আগ্রা জিলা স্কুল থেকে মধ্যপথে ছাড়য়ে এনে ললিতশংকর তাকে ভর্তি ক'রে দিলেন হোলি ক্রস কনভেন্টে, ইংরেজি বলা যাতে সহজে আয়ত্ত করতে পারে। স্কুলে পড়ার সময় থেকে বনমালী জানত অন্যান্য অনেক সহপাঠী থেকে সে আলাদা, তার ভিন্নতা রক্ষা ক'রে চলবার সহজাত আদৎ সবাকার কাছে

তাকে অহংকারী ও দেমাকি করত, কিন্তু আসলে তার ছিল যত না অহংকার তার চেয়ে বেশি আভিজাত্যবোধ। গ্রামের বাড়িতে গিয়ে জমিদারি দেখতে ছোটবেলা থেকে বনমালীর ভালো লাগত, ম্যানেজারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে বার হ'ত প্রজা-পরিদর্শনে, সে যে অনেকগুলো সাধারণ মানুষের শাসক তাদের জীবনযাত্রার তার যে অনেকখানি প্রভাব, বনমালীর এ অনুভূতি তৃপ্তিকর মনে হ'ত। যে প্রশ্ন অনেকবার তার মনে উঠত যার জবাব সে পেত না, তা হ'ল : কেন তার পিতা এত বড় জমিদারির প্রত্যক্ষ শাসন পরিত্যাগ ক'রে, এত মানুষের অবনত আনুগত্য তুচ্ছ ক'রে, জিলা আদালতের হাকিমদের কাছে হাত-কচলানো জীবন বেছে নিলেন। ললিতশংকর নিজের 'দেশে' রাজা না হ'য়ে অন্য 'দেশে' প্রজা হ'তে গেলেন কেন? পিতাকে বনমালী অবশ্যই সম্মান, মান্য, ভয় সবই করত, তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস স্কুল জীবনে তার অনায়াত্ত ছিল, তাঁর জীবনধারার সব কিছু বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে দূর থেকে, কিছু বাস্তব, অনেক কল্পনা দিয়ে, সে দেখত, ভাবত, বুঝতে চেষ্টা করত, যেমন ললিতশংকরের প্রতি সন্ধ্যায় মদ্যপান, যেমন মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় ঘোড়ার গাড়ি চেপে সেজেগুজে তাঁর কোথাও-গমন, এবং অনেক রাত্রে মাতাল হ'য়ে প্রত্যাবর্তন, যেমন মাঝে মাঝে তাঁর কলকাতা-বোম্বাই দিল্লি যাত্রা, যা বনমালীর কাছে রহস্যময় লাগত, কেননা ললিতশংকরের এসব যাত্রার পেছনে ওকালতি অথবা জমিদারির প্রয়োজন থাকত না, তিনি যেতেন নিতান্ত নিজের কারণে, যা বনমালী আন্দাজ করত, ঠিক জেনে নিতে পারত না, কেননা প্রশ্ন করবার কেউ ছিল না, করলে উত্তর পাওয়া যেত না, এবং এ-অবস্থা থেকেই বনমালীর বাল্যকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য : নিজের পরিবারে সে নিতান্ত নিঃসঙ্গ ছিল।

মা ছিলেন, কিন্তু না-থাকার মতো, মা বনমালীর বাল্যজীবনের নিরেট অন্ধকার, ওখানে লক্ষকোটি কীটপতঙ্গের কুৎসিত ভিড়, আলোর একান্ত অনুপস্থিতি। জন্মের তিন বছর পর থেকে বনমালীর মাতৃস্মৃতি ব্যাপক অন্ধকার। মাকে সে দেখেছে, অনেক না-দেখার পর, কাছে পায় নি, অথচ দূরে থেকেও মার কাছাকাছি নিবিড় অবস্থিতির কল্পনা তাকে ঘিরে থেকেছে, মাকে সে ভয় করেছে, ঘৃণা করেছে, পরিত্যাগ করেছে, ভালোবেসেছে, কেঁদে কেঁদে মার দেহের স্পর্শ চেয়েছে। যে তাকে লালন-পালন করত সে মা নয়, সরস্বতী পিসিমা, বাবার বিধবা ছোট বোন, যাকে বনমালী কোনওদিন ভালোবাসে নি, যার প্রতি বিরূপতা তার ক্রমে বেড়ে গিয়েছে, এবং একদিন তের বছর বয়সে, যাকে সে প্রায় মেরে ফেলতে বসেছিল, বাবার লাঠি প্রাণপণ শক্তিতে তার মাথায় মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, যদিও সরস্বতী পিসিমা মরে নি, হাসপাতালে তিন দিন মাত্র থাকতে হয়েছিল তাকে, কিন্তু

ফেরত আসল পরে বাবা তাকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, বনমালীর তদারকের ভার দিয়েছিলেন ভৃত্য গণেশকে এবং আয়া রামদাসীকে। পিসিকে মারার কারণ বনমালী কাউকে বলে নি, একমাত্র নিজেকে বার বার ছাড়া, এবং, অনেক বছর পর, তখন সে এলাহাবাদ কলেজে পড়ে, বেদ মেহ্‌তাকে ছাড়া, অথচ কারণটা ছিল নিতান্ত পিছল, যে-অন্ধকারে বনমালী দিশেহারা ঘুরে বেড়াত, তার সঙ্গে সংযুক্ত। সে অন্ধকারের নাম মা। তিন বছর বয়স হবার পর মা একেবারে উধাও ; সারা বাড়িতে তার চিহ্নমাত্র ছায়ামাত্র নেই, শুধু অনেক, অনেক গন্ধ আর কল্পনা আর অব্যক্ত স্মৃতি ; তারপর একদিন মার প্রত্যাবর্তন, সব কিছু থেকে, সবার কাছে থেকে মা দূরে, গা বাঁচিয়ে, স্পর্শ বাঁচিয়ে, ছায়া বাঁচিয়ে মা অনেক দূরে, কদাপি কখন তাঁর আপাদকমস্তক আবৃত দেহের ওপর চোখ পড়ত বনমালীর, বুক কাঁপত, হাত-পা শক্ত হ'য়ে যেত, মা না আসত কাছে, না ডাকত কাছে। বছরে এক দুই মাস মা তখন থেকে থাকত আগ্রার বাড়িতে, তেমনি সবার কাছ থেকে দূরে, একেবারে নিজের মধ্যে সরে গিয়ে, বাবাও তার ঘরে গিয়ে দু'দণ্ড বসতেন না, দিশী ডাক্তার এসে রোজ তাকে দেখত, তার ঘরে অনেকক্ষণ থাকত ; তারপর মা চলে যেত আগ্রা থেকে, অনেক দিনের জন্যে, অনেক মাস, যেন অনন্তকাল, কেউ তার কথাও বলত না, অন্তত বনমালীর কাছে নয়। এমনি ক'রে নয় বছর যখন কাটল, বনমালীর বয়স বারো, তখন সে শুনল মা তার ম'রে গেছে, মাথা কামিয়ে তাকে শ্রাদ্ধ করতে হ'ল, এবং তখন মার কথা মন থেকে খেদিয়ে তাড়াতে গিয়ে বার বার বনমালী দেখল মার বুকে সে কেবল মাথা ঘষছে, নরম বড় বড় গরম বুক মার, বনমালীর হাতের মুঠোয়, গালে, চোখে, জিভে, অন্তরে মার বুক।

বারো বছর বয়সে বনমালী জানতে পেল তার মার কুষ্ঠরোগ ছিল, সে রোগে কাশীর এক হাসপাতালে তার মৃত্যু ঘটেছে।

অনেক বছর পর, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার সময়, বেদ মেহ্‌তাকে একদিন বনমালী বলেছিল, 'তোমাদের তরল দেশপ্রেমের সঙ্গে আমার অনেক ঝগড়া। তার মধ্যে একটা হ'ল দেশকে মা বলা।'

'তোমার ইংরেজপ্রীতির চেয়ে আমার দেশপ্রেম তরল হ'তে পারে', জবাব দিয়েছিল বেদ মেহ্‌তা, 'কিন্তু দেশকে মা বলা নিছক ভারতীয় ভাববিলাস নয়, ইংরিজীতেও মাদাবল্যান্ড বলে একটা শব্দ আছে।'

বনমালী বলেছিল. 'আমি দেশকে মা বলতে পারি নে, কারণ আমার জীবনে মা মানে এক নিবিড় অন্ধকার।'

বেদ মেহতা ঔৎসুক্য চেপে বলেছিল, 'আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এক একটা

অন্ধকার থাকে।'

বনমালীকে হঠাৎ নিজের কথা বলবার আবেগে পেয়ে বসেছিল। সচরাচর নিজের কথা সে কাউকে বলতে পারত না। এ নিয়মের বিচ্ছেদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল বেদ মেহতা।

'আমার মাব কুষ্ঠ ছিল,' বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠেছিল বনমালী।

'তাই বুঝি?'

'তিন বছর বয়েসের পর মাকে আমি আর কাছে পাই নি। বছরে দু'মাস তিনি আমাদের আগ্রার বাড়িতে এসে থাকতেন। একেবারে আলাদা থাকতেন, কেউ তাঁর ঘরে যেত না, বাবাও না। আপাদমস্তক তাঁর সর্বদা ঢাকা থাকত, মুখও ঢাকা থাকত শেষটায়। আমার যখন বারো বছর তখন তিনি মারা যান। তখন আমি জানতে পারি তাঁর কুষ্ঠ হ'য়েছিল।'

'তুমি নিশ্চয় একমাত্র ছেলে নও যার মা কুষ্ঠরোগে মারা গেছেন।'

'কিন্তু মা শব্দটা আমার মনে কমনীয় অনুভূতি আনে না। দেশকে মা বললে আমার কাছে দেশটাও কুষ্ঠরোগীব মতো ভয়াবহ, আতঙ্কনীয় কিছু হ'য়ে দাঁড়ায়।'

এবার বেদ মেহতা হেসে উঠেছিল।

'বনমালীশংকর ঝা, তুমি স্বদেশী করতে না চাও তো কেউ তোমাকে গলায় দড়ি দিযে টানছে না। বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখাতে চাও তো অন্য কিছু ভেবে রাখো। এই কুষ্ঠকাহিনীটা নিতান্তই ছেলেমানুষি শোনাল।'

'তা শোনাক। এমন ছেলেমানুষি আমাদের সবার মধ্যেই থাকে। আরও শুনবে?'

'তোমার নিজের গরজে যদি বল, শুনব ; আমি শুনতে চাই বুঝতে পারলে তুমি বলবে না।'

'মাকে আমি কখনও-সখনও দূর থেকে দেখতে পেতাম। দেখলেই ইচ্ছে হ'ত ঝাঁপিয়ে পড়ে মার কাপড়-চোপড় সব টান মেরে খুলে দি।'

'মাকে তুমি একান্ত ক'রে কাছে পেতে চাইতে। সব ছেলেই যা চায়।'

'পারি নি বলে আমার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের যৌনতা জন্ম নিয়েছিল। স্ত্রীলোকের দেহ সম্বন্ধে আমি খুব ছোটবেলা থেকে লুকোন কৌতূহলে মরিয়া হ'য়ে উঠেছিলাম। বাবা আমার জন্যে একটা আয়া রেখেছিলেন, নাম ছিল কুন্নী। তাকে প্রশ্ন করলে জানতে পারবে।'

'তুমি কি ভাবছ আমি কোনওদিন তোমার জীবনচরিত লিখব? আর অন্য কেউ বা যদি লেখে, তাতে তোমার এসব আসল পরিচয় থাকবে? ভারতবর্ষে লিখিত জীবনচরিতে মানুষের কাহিনী থাকে না, থাকে দেবতাদের কাহিনী। তুমি যদি

কোনওদিন জীবনচরিত লেখার মতো দেবতা হও, হবে বলে মনে হয় না আমার, তাহ'লে জীবনীকার নিশ্চয় সম্পূর্ণ বিপরীত শিলে তোমার বাল্য ও কৈশোরকে পুনর্নির্মাণ করবে, এবং তুমি একবারের জন্যেও প্রতিবাদ করবে না।'

বার থেকে ষোল বছরে বনমালীর জীবনে দারুণ পরিবর্তন হ'য়েছিল। একদিকে তার তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার মেধা, অন্যদিকে তার দাপান অহমিকা। দ্বিতীয়ের কিছুটা ছিল প্রকাশিত, বাকিটা গোপনে লালিত। ক্লাসে প্রথম হওয়া ছিল যেমন অনায়াসলভ্য, শিক্ষক এবং সতীর্থদের উপেক্ষা করাও তেমনই স্বাভাবিক। কুন্নীর সঙ্গে সম্পর্কটা যুগিয়েছিল একদিকে সদম্ভ আত্মবিশ্বাস, অন্যদিকে অনেক কিছু প্রতিষ্ঠিত মূল্যের প্রতি নীরব উপেক্ষা। এ সব কিছু মিলে বনমালীর মানসে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে যে প্রতীক আলেখ্য তৈরি হয়েছিল তা হ'ল বস্তুর ওপর কঠিন শাসন। ইতিহাসের প্রধান প্রধান সেনাপতিদের জীবনী পড়তে সে ভালোবাসত, এবং তার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্বপ্নবিলাস ছিল, একদিন সে সেনাপতি হবে ; নেপোলিয়ন হ'য়ে, নেলসন হ'য়ে, জর্জ ওয়াশিংটন হ'য়ে, গারিবল্‌দি হ'য়ে দর্পিত পদচিহ্ন রেখে যাবে ইতিহাসের পাতায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তুলনীয় বীরত্বের অভাব বনমালীকে স্বদেশ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাবান হ'তে সাহায্য করল। তৈমুর লং-নাদিরশাহ্ প্রমুখ অত্যাচারী সেনাপতিদের প্রতি তার চেতনা সায় দিত না, শিবাজিকে নেপোলিয়নের তুলনায় তার কাছে ম্লান মনে হ'ল, রাজপুতানার বীর যোদ্ধাদের রোমান্টিক পৌরুষ তাকে নাড়া দিতে পারত না। কি আশ্চর্য, বনমালী ভাবত, এই এতবড় একটা উপমহাদেশে, একমাত্র শিবাজি ছাড়া, রণকৌশলে বাহুবলে একজন নায়কও সাম্রাজ্য গঠন ক'রে তাকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে বাখতে পারে নি, একমাত্র মুগলরা ছাড়া, যাদের যে-কোনও কারণে, বনমালী ভারতীয় মনে করত না, তারা তো বিদেশী, পরদেশী সাম্রাজ্যের সংগঠক, সংরক্ষক। ছোটবেলার অনুমান পরবর্তীকালেও বনমালীর মনে সুস্থির প্রত্যয় জন্মিয়েছিল যে ভারতীয় মেধা আর যাতেই প্রস্ফুটিত হ'য়ে থাক, রাষ্ট্রনির্মাণে ও রাষ্ট্রসংরক্ষণে নয়।

'ইংরেজকে তোমরা খেদাতে পারবে না,' বেদ মেহ্‌তাকে একদিন বলেছিল

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বনমালীশংকর ঝা, 'আর যদিও পার, তারপর?'

'ইংরেজ তো যাবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে যাবে তোমার মতো সব তাঁবেদার,' উষ্ণ জবাব দিয়েছিল বেদ মেহ্তা। তরপর দেশ স্বাধীন।'

'তার মানে কি?'

'পরাধীনতার জ্বালা যে জানে না, তার পক্ষে সম্ভব নয় স্বাধীনতার মানে বোঝা।'

'ভাবপ্রবণতা বাদ দিয়ে একটু কথা বলবে?'

'স্বাধীন মানে আমাদের নিজশাসিত ঐক্যবদ্ধ, সবল ভারতবর্ষ।' 'যেখানে দরিদ্র থাকবে না, প্রপীড়িত থাকবে না, শোষণ থাকবে না, সবাকার সমান ভাবে বাঁচবার অধিকারের ওপর নতুন এক অহিংস সমাজবাদী সমাজ তৈরি হবে? তাই না?'

'নিশ্চয়।'

'হবে না।'

'কেন?'

'ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনওদিন হয় নি বলে।'

'আলবৎ হয়েছে।'

'ক্ষণকালের জন্যে। এক পুরুষ, দু পুরুষ পরেই সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়েছে আত্মবিভেদে, অথবা নেহাত শাসনক্ষমতার প্রচণ্ড অভাবে!'

'অতীত ভবিষ্যতের অধিনায়ক নয়।'

'ভারতবর্ষ বলতে যা তোমরা জান তা তো ইংরেজের সৃষ্টি। একটা ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক একতাকে রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতার রূপ দিয়েছে ইংরেজ।'

'বেশ তো। এ বনিয়াদ তো ভেঙে পড়বে না!'

'ইংরেজ গেলেই পড়বে। যা ওরা নিজেরা গড়েছে। ওদের অবর্তমানে তা থাকবে না।'

'ভুল।'

'তুমি যদি কারিগর হও, তোমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হ'ল নিজের যন্ত্রপাতি, মালমসলাকে ভালো ক'রে জানা। ভারতবর্ষকে যদি না চেন, গড়বে কি নিয়ে, গড়বে কাকে?'

তুমি চেন একমাত্র দাস ভারতবর্ষকে। তার কারণ তোমার মন দাসত্বে বন্দী।'

'আমি নিজেকে ইতিহাসের ছাত্র মনে করি। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভেদের, আত্মকলহের ইতিহাস। এ একটা দেশ নয়, অনেকগুলি দেশ নিয়ে একটা উপমহাদেশ। একমাত্র বিদেশীরাই এখানে স্থায়ী সাম্রাজ্য তৈরি করতে পেরেছে।

ভুলে যেয়ো না, ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজ্য যে-কটি তৈরি হয়েছিল প্রত্যেকটি আঞ্চলিক, কোনওটিই ভারতবর্ষ নিয়ে ব্যাপক নয়। এক গুপ্ত-সাম্রাজ্য ছাড়া এবং তা অনেক দিনের অতীত কাহিনী। এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যও বর্তমানের হিন্দুস্থানের একটা বৃহৎ অংশ মাত্র।'

'ভারতবর্ষ অতীতের দাস নয়।'

'ভবিষ্যতের দিশারি, তাও অপ্রমাণিত।'

'প্রমাণ হবে।'

আমার মনে হয় কি জান? ইংরেজ দারুণ ভুল করেছে ভারতবর্ষকে এক রাষ্ট্রে পরিণত ক'রে। আসলে কয়েকজন ভাইসরয়কে মুগল সাম্রাজ্যের ভূত পেয়ে বসেছিল। ইংরেজ এ দেশটাকে দশটা বা বারোটা উপনিবেশে পরিণত করলে আমরা আজ আর ভারতীয় ঐক্যের স্বপ্নও দেখতে পেতাম না। আরবদের দৃষ্টান্ত তাকিয়ে দেখ। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতির আরবদেশকে ইংরেজ ও ফরাসীরা আট দশ ভাগে টুকরো টুকরো করল প্রথম মহাযুদ্ধের পর। তার ফলে এখন মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, সৌদি আরব, ট্রান্সজর্ডান : এক এক দেশ, এক এক জাতীয়তা। আরব জাতিও আর নেই, আরব জাতীয়তাবাদও কেবল মরীচিকা।'

'ইংরেজ আমাদের জাতীয়তাবাদ এনে দিয়েছে, এ মিথ্যা ওদেরই তৈরি, তোমার মতো অনুগতদের জন্যে। ইংরেজ সৃষ্টি করেছে সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশ, তার সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি, আমাদের একজাতিত্ব এবং জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার দাবি আমাদের।'

'একটা মিথ্যাকে পরাস্ত করতে গিয়ে তুমি তার চেয়ে বড় আর এক মিথ্যার আশ্রয় নিলে। তা নাও, কিন্তু আমার আসল বক্তব্য ছিল অন্য কিছু। আমি বলছিলাম, স্বাধীন হ'লেও তোমরা ভারতবর্ষকে এক রাখতে পারবে না। ইংরেজ যদি বিদায় নেয়, যা আমার কাছে এখনও অবিশ্বাস্য, তাহ'লে যাবার আগে দেশটাকে সে টুকরো টুকরো ক'রে দিয়ে যাবে। তুমি হয়তো কোনদিন এক খণ্ডরাজ্যের মন্ত্রী হ'তে পারবে, অখণ্ড ভারতবর্ষের মন্ত্রী হবে এমন সম্ভাবনা দেখতে পাই নে।'

প্রথম যৌবনে বনমালী কখনও কখনও জমিদারিটাকে জীবন্ত ক'রে তোলবার স্বপ্ন দেখতো। বছরে একবার সে যেতই আগ্রার বাড়িতে, জমিদারি-ম্যানেজার মাতৃকাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তার ভাব জমে উঠেছিল। মাতৃকাপ্রসাদকে বনমালী কাক্কাজি ডাকতো, তার কাছারিতে ব'সে ব'সে জমিদারিশাসন অধ্যয়ন করা

বনমালীর অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল। মাতৃকাপ্রসাদের কাছ থেকে বনমালী যা শিখেছিল জীবনে অন্য কোনও পুরুষের কাছ থেকে তা শেখবার সুযোগ বা প্রয়োজন হয় নি। বনমালী শিখেছিল ইংরেজ কেন ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে"র মাধ্যমে একদল বিলাসী জমিদারের সৃষ্টি করেছিল, এ "বন্দোবস্ত" কিভাবে গ্রামগুলোকে ধারাবাহিক দৈন্যের অন্ধকারে ফেলে দিয়েছিল, জমিদার কিভাবে একসঙ্গে মহাজন এবং ব্যবসায়ীও হ'য়ে উঠেছিল। মাতৃকাপ্রসাদের সঙ্গে জমিদারি পরিদর্শনের ফলে বনমালী গ্রামের মানুষকে কাছ থেকে দেখবার ও জানবার সুযোগ পেয়েছিল, সে বুঝেছিল ভারতীয় সামন্ততন্ত্র হিন্দুধর্মের অদৃষ্টবাদ, জন্মান্তরবাদ এবং হিন্দুসমাজের জাতিভেদের সঙ্গে মিলে মিশে এমন এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত যা সহজে টলবার নয়, যা পৃথিবীর অন্য যে কোনও সমাজের সামন্ততান্ত্রিকতা থেকে পৃথক। মাতৃকাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব প্রজাদের শোষণ ও শাসন করার সবরকম চর্চিত পন্থার সঙ্গে কয়েকটি মৌলিক উপায় সংযোগ করেছিল, তার একটি হ'ল 'রাজকুমার' জমিদারি দর্শনে গেলে মোড়লদের একটা নির্দিষ্ট নজরানা যোগাতে হ'তে, 'রাজকুমার'কে অন্যভাবে আপ্যায়িত করা ছাড়াও। এ নজরানার টাকা বনমালীই পেত, এবং সে ভালোভাবেই জানত মোড়লরা কাদের কাছ থেকে কি ভাবে এ অর্থ সংগ্রহ ক'রে আনত। গ্রামবাসী প্রজাদের প্রতি বনমালীর সহানুভূতি ছিল না, বরং চাপা রাগ ও তাচ্ছিল্য ছিল, তারা যে ভাবে শোষণ ও অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নিত, অদৃষ্টকে দায়ী ক'রে এ-জন্মের পাপক্ষয়ের পথে পরজন্মের রাস্তা বানাতো, তাতে বনমালী তাদের মানুষ বলে স্বীকার করতে পারত না, নিজেকে তাদের থেকে ভীষণ আলাদা এবং অনেক বড়ো মনে হ'ত, বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে হ'ত যে ভারতবর্ষের ভূমি অধিনায়কের ভূমি, গণ-সমতার পক্ষে নিতান্ত অনুর্বর।

জবরদস্ত জমিদার হবার স্বপ্ন বনমালীর আঠার বছর বয়সে মারা গেল। মাতৃকাপ্রসাদ অবশ্য কোনওদিন এ স্বপ্নবিলাসে সহায়তা করে নি। জমিদারির, সে বার বার বলেছে, ভবিষ্যৎ নেই। দেশের মাটি বহুৎ বুড়ো হ'য়ে গেছে, দু বছর তিন বছর পরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এ মাটির আর শক্তি নেই সোনা ফলাবার। গ্রামের মানুষগুলোর দেহে ঘুণ ধরেছে, তারা আর মানুষ নেই, তাদের দিয়ে কোনও কাজ হবার নয়। 'দেখছেন না, রাজকুমারজি,' মাতৃকাপ্রসাদ বলত, 'জমিদারি দেখবার ভার নিতে শিক্ষিত ভদ্রলোকরা কেউ এগিয়ে আসেন না, এ ভার পড়ে আমাদের মতো অশিক্ষিত সাধারণ লোকেদের ওপর, আমাদের কি বিদ্যাবুদ্ধি আছে নতুন কিছু গড়বার? আমরা বড় জোর পুরনো ক্ষয়ে-যাওয়া দুর্গটাকে কোনমতে সামলে দিতে পারি, ভেঙে তো পড়বেই, যতদিন কোনমতে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়।' উত্তরে

বনমালী যদি বলত, 'আমি কাক্কাজি, ভাবছি জমিদারির ভার নেব,' তাহ'লে মাতৃকাপ্রসাদ দু কানে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠত : 'তোবা, তোবা, একথা মনেও আনবেন না যুবরাজজি। জমিদারি থেকে দূরে থাকুন, তবু বছরে কিছু পাবেন, এর মধ্যে এসে যান, এর সঙ্গে সঙ্গে আপনিও ডুবে যাবেন নির্ঘাত। কচুরিপানার দিঘি দেখেছেন তো? দূর থেকে ফুল আর পাতা দেখতে বেশ লাগে, দিঘিতে একবার পানায় জড়িয়ে পড়ুন, আর রক্ষে নেই আপনার।'

জবরদস্ত জমিদারির স্বপ্ন মরল আগ্রা থেকে চুয়াত্তর মাইল দক্ষিণে পীরগঞ্জ নামক এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে বনমালীর আঠাব বছর বয়সে একটি রাত্রিতে। গ্রীষ্মের ছুটিতে জমিদারি দেখতে বেরিয়ে এ গ্রামে মাতৃকাপ্রসাদ তিন দিনের জন্যে তাঁবু ফেলেছিল। পীরগঞ্জের তালুকদার গজাননচরণ কাশ্যপ 'যুবরাজ' ও জমিদার ম্যানেজারের আরাম আপ্যায়নের দায়িত্ব নিয়েছিল। জামিদারি পরিদর্শনকালে গ্রামে কারুর আতিথ্য গ্রহণ বনমালীর এই প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল না, এ কাজ সে অনেকবার করেছে, এবং আপ্যায়নের সব রকম ব্যবস্থার সঙ্গে তার পরিচয় ইতিমধ্যেই ঘনিষ্ঠ। গৃহস্বামীর সামাজিক ও আর্থিক শক্তিদ্বারা আপ্যায়নের রূপরেখা নির্মিত হয়, কোথাও বাঈজী আসে নাচ দেখাতে, কোথাও থাকে শিকারের ব্যবস্থা, কোথাও নদীতে নৌবিহার। প্রায় সর্বত্রই রাত্রিতে যুবরাজের সেবার জন্যে একটি সুন্দর সুঠাম কন্যার ব্যবস্থা থাকে। সে শয্যা তৈরি কবে, ফুটফরমাস খাটে, পান, জল, সিগারেট এবং মদ হাতে তুলে দেয়, এবং 'যুবরাজে'র ইচ্ছে হ'লে, শয্যাসঙ্গিনী হয়। এ ব্যবস্থার মধ্যে অন্যায় বা দুর্নীতি বনমালী দেখতে পায় নি, বরং সামন্ততান্ত্রিকতার সঙ্গে এ ব্যবস্থার সামঞ্জস্যটাই তার কাছে বড় মনে হয়েছে। এ-সব কন্যাদের সবাইকে সে বিছানায় টেনেছে তাও নয়, এ ব্যাপারটা নির্ভর করেছে তার মেজাজ, খুশি এবং চাহিদার ওপর। পীরগঞ্জেও যখন সে দেখতে পেল একটি ছিমছাম সুন্দরী কন্যা তার নির্দিষ্ট শয়ন ঘরের পরিচারিকা, ব্যাপারটাকে সে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করল, এবং মেয়েটিকে ফুটফরমাস করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হ'ল না। সন্ধ্যার পরে আশেপাশের পনের আনা গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে একত্র হবার ব্যবস্থা ছিল, সেখান থেকে ফিবে বনমালী টের পেল তার মাথাটা ব্যথা করছে, শরীরে জ্বরভাব। শোবার ঘরে এসে জামা-কাপড় ছাড়বে এমন সময় সেই মেয়েটি হাজির হ'তে বনমালী তাকে বলল, 'আমার শরীরটা ভালো নেই, একটু জ্বরজ্বর লাগছে, তুমি ওদের বলে দাও আমি রাত্রে কিছু খাবো না।' কয়েক মিনিটের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল, তালুকদার ছুটে এল, মাতৃকাপ্রসাদও, এবং আরও অনেকে। বনমালীর দারুণ লাগল, সে বেশ মেজাজের সঙ্গেই বলল, ডাক্তারের দরকার নেই, রাত্রিতে বিশ্রাম হ'লেই

জ্বর সেরে যাবে, তার একমাত্র প্রয়োজন একা থাকার। সকলে যখন চলে গেল, মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে, বনমালী তাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি মাথা টিপতে পারো?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, পারে।

'আমি শুয়ে পড়ছি। বড্ড গরম আজ, না? তুমি বরং আমার মাথাটা টিপে দাও। ঘুমিয়ে পড়লে চ'লে যেয়ো।'

শুয়ে পড়ার পর প্রথম বনমালী ভালো ক'রে মেয়েটিকে দেখল। বয়স বোঝা মুশকিল, বোধ হয় তারই বয়সী হবে। ছিমছাম সুন্দর দেহ, মুখখানা বেশ মিষ্টি, বিশেষ ক'রে নাক থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখখানা সুন্দর। মেয়েটির হাতে দুগাছা বালা, কানে মাকড়ি, নাকে নথ, কপালে সিঁদুর।

খানিকক্ষণ পর বনমালীর উষ্ণ কপালে নরম হিম হাতের স্পর্শ। আরাম লাগল বনমালীর। 'আহ্' বলে ওঠার সময়ই টের পেল হিম হাত কাঁপছে। এ অভিজ্ঞতাও নতুন নয়। চোখ বুজেই বনমালী বলল, 'বেশ লাগছে। একটু জোরে।' কপাল-টেপার জোর বাড়ল, বনমালীর দেহে আরাম ঘনীভূত হ'ল, আজ সন্ধ্যায় মদ পান হয় নি, শরীর অসুস্থ হ'লেও কেমন সুন্দর হালকা, নরম হাত এখন আর হিম নয়, বনমালী হাত বাড়িয়ে সে হাতখানি ধরল, তার স্পর্শ নিল গালে, গলায়, গালে, গলায়, গালে ওষ্ঠাধরে। মেয়েটির বাহু স্পর্শ করল বনমালী, নরম মসৃণ, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বনমালীর হাত তার স্তন স্পর্শ করল। চমকে উঠে বসল বনমালী।

'এ কি? ভেজা কেন?'

ভীত চকিত মুখে কয়েক মুহূর্ত কথা বেরুল না।

'ভেজা কেন?' চেঁচিয়ে উঠল বনমালী।

ভয়ে আড়ষ্ট স্বরে জবাব এল, 'আমার ছোট্ট ছেলে আছে।'

'ছোট্ট? কতো ছোট?'

'ন মাসের।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল বনমালী।

তারপর বলল, 'এদিকে এসো। আমার সামনে। এখানে বোসো। আমার সামনে।'

মেয়েটিকে সামনে বসিয়ে বনমালী তার নগ্ন বুক দেখল। দুটি স্তন থেকে ফোঁটা ফোঁটা দুধ ঝরছে।

কিছুক্ষণ ঘনীভূত বিস্ময়ে দেখল বনমালী। যখন কথা বলল তখন সে অতিশয় ক্লান্ত।

'তোমার ছেলের নিশ্চয় ক্ষিধে পেয়েছে। তুমি চলে যাও।'

মেয়েটি বসেই রইল।

বনমালী বলল, 'ভয় নেই। কোনও ক্ষতি হবে না তোমার স্বামীর। তুমি চলে যাও।'

বেদ মেহ্‌তাকে, তিন বছর পর, বনমালী এ ঘটনা একদিন শুনিয়েছিল। বলেছিল, জমিদারি দেখতে গিয়ে বেশ ক'টি মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি, অথবা, আরও ঠিক ক'রে বললে বেশ ক'টি মেয়ে আমাব সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, কিন্তু কেবল এ মেয়েটির কথাই আমার মনে আছে। এদের একজনেরও নাম আমি জানতে চাই নি, এই মেয়েটিরও না, ওরা আমার কাছে একরাত্রির খেয়ালখুশি ছাড়া কিছুই ছিল না, শুধু এই মেয়েটি ছাড়া, যে ছিল নতুন-মা-আমার কাছে একেবারে নতুন, এক বিস্ময়কর রহস্য। এদের দরিদ্র স্বামীদের জমিজমা ঘরবাড়ি নিশ্চয় বন্ধক ছিল মহাজনের কাছে, মহাজনই তো জমির মালিক, মালিকের মালিককে খুশি করতে এরা স্ত্রীদের পাঠিয়ে দিত, সমাজে এ ব্যাপারটা এত চিরাচরিত ছিল যে এজন্যে এদের বিশেষ কোনও অসুবিধে ভোগ করতে হ'ত না। এসব মেয়েরা বেশ স্বাভাবিকভাবেই আমার সঙ্গে রাত কাটিয়ে যেতো, একজনকে দেখি নি কান্নাকাটি করতে অথবা বাধা দিতে, বরং মনে হয়েছে সাজান সরমের আড়ালে সম্ভোগে তাদের সম্মতি ও সুখের অভাব ছিল না। এ মেয়েটিও নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ত না, কিন্তু আমার চোখে জমিদারি ব্যাপারটার জরাজীর্ণতা সেদিন রাত্রে হঠাৎ একেবারে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। নতুন মা'র বেহায়াপনার পেছনে বহুদিনের ঘুণধরা সমাজব্যবস্থার হঠাৎ পরিচয় আমাকে সেদিন কঠিন আঘাত ক'রে ছিল। তারপর জমিদারির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব হ'ল না। জবরদস্ত জমিদার হবার ইচ্ছাও ম'রে গেল। ম্যানেজার কাক্কাজি খুশি হ'ল, পিতাজিও নিশ্চিন্ত হলেন।'

'দেশ স্বাধীন হ'লে,' বেদ মেহ্‌তা বনমালীর কাহিনী শুনে বোকা উত্তেজনায় মন্তব্য করেছিল, 'জমিদারির জ-ও থাকবে না। জমি পাবে মালিক হবার একমাত্র অধিকার যার : চাষী। তোমরা যাদের লুটেপুটে সর্বহারা করেছ, জমির মালিক হবে তারাই।'

'হবে-না, হবে না, হবে না,' বনমালী সজোরে হেসে উঠে জবাব দিয়েছিল, 'আবার ভুল করছ বেদ। আসলে তুমি আমার ওপর দারুণ রেগে গেছ, নিতান্ত আমি তোমার বন্ধু, তাই আমাকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারছ না, অথচ একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে আমার অবস্থায় যা আমি করেছি প্রায় সবাই তাই করতো। তুমি একবাক্যে জমিদারি নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে আমাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে চাইছ, অথচ তুমি জানো সেটা সহজ নয়, আমি এত সহজে নিশ্চিহ্ন হবার নই। এর পরে,

জমিদারির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি যা বললে তা বলিষ্ঠ কল্পনা মাত্র। কংগ্রেস যদি স্বাধীনতা পায়, জমিদারির সংস্কার হবে, বিলোপ হবে না। বরং দেখবে সংখ্যায় অনেক বেশি, রাজকৃপায় পরিপুষ্ট নতুন এক শ্রেণীর ভূস্বামী তোমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রেব বনিয়াদ হ'য়ে উঠবে। তুমি যাদের গ্রামীণ সর্বহারা বলছ, যাদের তুমি চেন না, আমি চিনি, এবং যাদের জন্যে আমার মনে দরদ নেই, কেননা তারা মানুষ নয়, তারা তোমাদের রাজত্বেও সর্বহারাই থেকে যাবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

পিতা ললিতশংকরের সঙ্গে বনমালীর সম্পর্ক ছোটবেলা থেকে নিরুত্তাপ। বুদ্ধি বিবেচনা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বনমালীর কাছে পিতার জীবনটা বিরাট ফাঁকি ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। ললিতশংকর, বনমালীর কাছে, একসঙ্গে অনেক কিছু না-হবার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। না-জমিদার, না-ব্যবহারজীবী, না-রাজনৈতিক নেতা, না-স্বামী, না-পিতা। অনেকগুলি ছায়া এক সঙ্গে জড়িত হ'য়ে ললিতশংকর ঝা। কৈশোর থেকে বনমালীর জীবন আলাদা, সেখান যাদের উপস্থিতি তার মধ্যে ছিলেন না ললিতশংকর অন্যতম। স্কুল থেকে শেষ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করার সময়ও ললিতশংকর পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেন নি, বনমালী পিতার সান্নিধ্যে সযত্নে এড়িয়ে গেছে। ললিতশংকরের ইচ্ছে ছিল ছেলেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াবার, বনমালী তখনও জবরদস্ত জমিদারির স্বপ্ন দেখছে, তাই এলাহাবাদের কলেজে সে ভর্তি হ'ল, এবং পর পর দুটি পরীক্ষাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হ'ল। ইতিমধ্যে জবরদস্ত জমিদার হবার কল্পনা মারা গেল। বনমালী নিজেই সংকল্প করল সে আই. সি. এস. হবে। ভারতবর্ষে জীবনযাপনের পথ ঐ একটাই। শাসক ইংরেজের সমকক্ষ হবার, বহু মানুষের অনেক উঁচুতে নিজেকে স্থাপিত করবার ঐ একটাই উপায়। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বনমালীর যুবকঅন্তরে বিশেষ কোনও নালিশ ছিল না। বরঞ্চ তার দৃঢ় ধারণা ছিল, ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের কল্যাণ ঘটেছে, ঘটছে। স্বদেশী আন্দোলনটাকে তার কাছে অনেকটা তামাশা মনে হ'ত। তর্ক ক'রে, বক্তৃতা ক'রে, প্রবন্ধ লিখে, সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে, এবং মাঝে মধ্যে 'অসহযোগ' নামক হালকা প্রহসন মঞ্চস্থ ক'রে কোনও দেশ যে স্বাধীন হ'তে পারে বনমালীর মন তা মানতে পারত না।

এ 'প্রহসনে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল বনমালী যখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ে, তখন। উত্তরতিরিশে গান্ধীজির দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনে এলাহাবাদের মানুষগুলির একটা বড় অংশ মেতে উঠেছিল, এবং আন্দোলনের উত্তাপ বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছিল ছড়িয়ে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ আন্দোলনে ভূমিকা

প্রধানতম ছিল একটি মেয়ের। নাম তার বেদ মেহ্‌তা। পূর্বপুরুষ বহুবছর আগে রাজপুতানা থেকে যুক্তপ্রদেশে বাসান্তরিত। বেদ মেহ্‌তার পিতা কৃষ্ণজীবন মেহ্‌তা এলাহাবাদ হাইকোর্টের নাম করা অ্যাডভোকেট। বেদ মেহ্‌তা নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ছিল। বনমালী একসঙ্গে এম. এ. এবং আইনের ছাত্র, সে সুবাদে দুজনে সহপাঠী।

মেহ্‌তার সঙ্গে বন্ধুত্ব বনমালীর জীবনে অন্যতম বৃহৎ ঘটনা। দুজনের স্বভাবে কিছুটা আপাত সামঞ্জস্য ছিল। দুজনেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দেমাকি, নিজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন ; দুজনেরই স্বাভাবিক তেজস্বিতা ; দুজনেরই পছন্দ অপছন্দ পরিষ্কার এবং ধারাল। এ সমস্বভাবের বাইরে দুজনে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং সে কারণেই সম্ভবত, সবকিছু প্রতিকূল প্রভাব সত্ত্বেও, দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আইন ক্লাসে আলোচনার সময় বনমালী ও বেদ সর্বদা ভিন্নমত প্রকাশ করত, ক্রমে দুজনে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। এক দিন ক্লাসে হেবিয়াস কর্পাস নিয়ে দুজনের তীব্র বিতর্কের পর, লাইব্রেরিতে বনমালী দেখতে পেল বেদ মেহ্‌তাকে, কাছে এসে বলল, 'আপনার সময় হবে একটু বেড়িয়ে আসার? কথা ছিল আপনার সঙ্গে।' দুজনে গিয়ে বসল রাস্তা পেরিয়ে একটা ছোট রেস্তোরাঁয়। কোন রকম ভনিতা না ক'রে বনমালী বলল, 'একটা প্রস্তাব আছে।'

'বলুন।'

'আপনার কি কোনও বন্ধুর পদ খালি আছে?'

প্রশ্ন শুনে বেদ মেহ্‌তা হেসে ফেলেছিল।

'থাকলে?'

'আমি পদপ্রার্থী।'

'আপনার গুণাবলী?'

'অনেক দোষ সত্ত্বেও মানুষটা অকৃত্রিম।'

'আমাদের কোনও মিল নেই।'

'আছে। আমাদের দুজনকার বাবাই আইনজীবী।'

'সুতরাং?'

'আমাদের বন্ধুত্ব আইনসিদ্ধ।'

'আমার বন্ধুত্বে দরকার কি আপনার?'

'এই সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি মাত্র সজীব মানুষ আছে। তারা শত্রু হ'য়ে থাক বিধাতার কাম্য নয়।'

'আপনি ভীষণ অহংকারী।'

'বিনয় দুর্বলের ভূষণ। দুর্বলতা আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য।'

'বন্ধুত্ব বলতে কি বোঝেন আপনি?'

'সুস্থ সবল স্বাভাবিক বিনিময়।'

'কিসের?'

'মনের, চিন্তার, অভিজ্ঞতার। মানসের।'

'আমাদের মতের অমিল। আপনি ইংরেজ শাসনের সমর্থক, আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। আপনার ও আমার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য।'

'অনিবার্য নয়। আমি রাজনীতি করবার ইচ্ছে রাখি নে।'

'স্বাধীনতা সংগ্রাম রাজনীতি নয়।'

'আপনার সঙ্গে তর্ক করবার জন্যে ডেকে আনি নি আপনাকে আজ। এনেছি বন্ধুত্ব পাতাবার জন্যে।'

'কিন্তু'—

'আপনি কি এইমাত্র তাদেরই সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন যারা আপনার মতে কেবল সায় দিয়ে যাবে? আমি নিশ্চয় আপনার সঙ্গে অনেক বিষয়ে একমত হবো না ; নিশ্চয়, সুযোগ পেলে, আপনার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করবো ; আপনার মতের বিরুদ্ধে যে যুক্তি আছে, আপনি যা ভাবছেন, যা দেখছেন তাই যে সবটুকু সত্যি নয় তা জানতে পেলে আপনার কি ভীষণ ক্ষতি হবে? আমি আপনার বিরুদ্ধে দল গড়বো না, প্রকাশ্যে আপনাকে প্রতিরোধ করবো না, কারণ রাজনীতিতে আমার রুচি নেই, আমার ধারণা, আপনি যাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেন তা হচ্ছে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া রাজনীতি। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে কি মস্ত ক্ষতি হবে আপনার?'

বেদ মেহ্‌তা আবার হেসে ফেলল : 'না, হবে না।'

'তাহ'লে আমরা বন্ধু?'

'আখেরে একটা কথা আছে'।

'আরও একটা?'

'আর একটাই।'

'আমার ধৈর্যও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। বলুন।'

'মহব্বত নিষেধ।'

'এ কথাটা আমি বললে আপনি হয়তো অপমানিত বোধ করতেন। তাই, আপনার কাছ থেকে শোনার অপেক্ষায় ছিলাম। ভালো হ'ল, আজই বললেন। আমি সম্পূর্ণ একমত।'

বেদ মেহ্‌তার সঙ্গে বনমালীর যে বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছিল তাকে বিশাল ও বিস্তৃত

আখ্যা দেওয়া চলে। কিছু কিছু মেয়ে থাকে যাদের যৌন প্রতিবেদন অনেকটা গৌণ, যারা পুরুষের সঙ্গে সমান্তরাল সম্পর্ক গঠন করতে পারে, যারা সহজে প্রেমে পড়ে না ; বেদ মেহ্‌তা ছিল তেমনি। যে অসংবৃত যৌন কৌতূহল এবং অতৃপ্ত কামনা ভারতীয় যুবকদের মেয়েদের সঙ্গে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব থেকে সচরাচর বঞ্চিত করে বনমালীর তা ছিল না, বরং যৌনতা ও মহব্বতের বাইরে বন্ধুত্ব গ্রহণীয় কোনও একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা ওর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এলাহাবাদে এম. এ. এবং আইন পড়ার বছরগুলিতে ওরা অনেক সময় একসঙ্গে কাটিয়েছে, অনেক তর্ক বিতর্ক, মতের অমিল, দৃষ্টির বৈপরীত্য ওদের বন্ধুত্ব ক্রমাগত পাকা ক'রে তুলেছে। বেদ মেহ্‌তাই ছিল বনমালীর জীবনে একমাত্র বন্ধু যাকে সে নিজের কথা উজাড় ক'রে বলতে পেরেছে, শৈশবের কথা, কৈশোরের এবং প্রথম যৌবনের; মার কথা, জবরদস্ত জমিদারি স্বপ্নের কথা, জমিদারি পরিদর্শনের সময় রাত্রিতে এক একটি গ্রাম্য যুবতী উপঢৌকনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিল বেদ মেহ্‌তা, বনমালীর সঙ্গে ছাত্র কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক ছিল না, তথাপি কংগ্রেসের সংগ্রামনীতি ও লক্ষ্য নিয়ে দুজনের বিপরীত মতের বার বার সংঘর্ষ হয়েছে, কিন্তু তাতে ওদের বন্ধুত্ব মলিন হয় নি। বত্রিশ সালে বেদ মেহ্‌তা উদীয়মান নেতা জবাহরলাল নেহরুর উজ্জীবিত অনুগামী, এবং ঐ বছরই বনমালীর সংকল্প, বিলেতে গিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণ। সংকল্প তৈরি হবার দিন কয়েক পরে দুজনার কথাবার্তা আজও মনে পড়ে বনমালীর, 'আনন্দভবনে' ছাত্র কংগ্রেসের মিটিং সেরে হস্টেলে ফিরতে রাত হ'য়ে গিয়েছিল বেদ মেহ্‌তার, লাউঞ্জ দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে দেখতে পেল বনমালী একটা চেয়ারে চুপচাপ ব'সে আছে।

'তুমি বসে আছ যে?' বিস্মিত প্রশ্ন করল বেদ, 'তোমার তো আজ আসার কথা ছিল না!'

'তবু এলাম।'

'তুমি তো জানতে আমার মিটিং ছিল।'

'জানতাম। আজকের মতো যুদ্ধ শেষ? নাকি আরও চলবে?'

'যুদ্ধ এখনও শুরুই হ'ল না! না, আজ আর কিছু নেই।'

'তাহ'লে চলো কোথাও গিয়ে খাওয়া যাক। খিদে পেয়েছে।'

'দরকারি কাজ কিছু আছে কি?'

'কাজ নেই। কথা আছে।'

'একটু বোসো। আমি ঘর হ'য়ে আসছি।'

মিনিট পনের পরে বেদ ফিরে এল, বনমালী দেখল সে স্নান করে, শাড়ি বদলে

নিয়েছে।

'সারাদিন ঘুরে ঘুরে দশ পল্লা ঘাম জমেছিল শরীরে, চান ক'রে নিলাম। তুমি কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলে?'

'কিছুক্ষণ। বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'তোমার চোখ খারাপ হয়েছে, ডাক্তার দেখাও।'

'কোথায় যাবে? চাইনীজ?'

'চলো না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই একটা চীনে রেস্তোরাঁয় ঢুকে দুজনে খাবার অর্ডার দেবার পর, বনমালী বলল :

'মনে হচ্ছে তুমি আর বেশিদিন স্বাধীন থাকতে চাইছ না।'

'স্বাধীন? আমরা কি স্বাধীন?'

'ফ্রী তো বটেই! নই কি?'

'তুমি হ'তে পারো, আমি নই। আমরা নই।'

'থাক গে। আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'তুমি তো প্রশ্ন করো নি? মন্তব্য করেছ।'

'কবে জেলে যাচ্ছ?'

'জেলে? কৈ, যাচ্ছি কোথায়?'

'যে ভাবে চলছ, দেরি নেই। হয়তো আজ রাত্রেই ধ'রে নিয়ে যাবে তোমাকে।'

'খবর পেয়েছ নাকি?'

'এখানকার পুলিস আমার বন্ধু নয়। যা মনে হচ্ছে, বলছি।'

'ধরতে এলে ধরবে।'

'তোমাদের যুদ্ধে দেখতে পাই সবাই ধরা দেবার জন্যে উৎসুক অপেক্ষায় ব'সে আছে। এ এক অবাক যুদ্ধ।'

'তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে বিদ্রূপ কোরো না। এটা যুদ্ধ নয়, সংগ্রাম। এর রীতিনীতি আলাদা।'

'বুঝি না তা নয়। মানি না, বলতে পারো। সে কথা যাক। তোমাকে একটা খবর দেবার আছে।'

বেয়ারা খাবার পরিবেশন করল। খেতে খেতে বেদ প্রশ্ন করল :

'খবরটা বললে না তো?'

'আজ জানতে পেলাম আইন পরীক্ষার খবর।'

'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।' বেদ মেহ্‌তার কণ্ঠে উত্তেজিত প্রতীক্ষা।

'তাই তো শুনলাম।'

'মাই গড্‌! তুমি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলে? এম. এ.-তে ফার্স্ট, আবার ল'তে? অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছ যে কিছুই ঘটে নি।'

'যদি বলি, ফার্স্ট হওয়াটা বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে!'

'তোমার মতো অহংকারীর কাছে এ ধরনের জবাবই আশা করতে হয়।'

'কিন্তু, বেদ, এ খবরের জন্যে তোমাকে আজ ডেকে আনি নি।'

'এর চেয়েও বড়ো খবর আছে না কি? বলে ফেল!'

'তুমি কি স্বদেশী করেই জীবন কাটাবে?'

'জীবনটা তো অনেক লম্বা ব্যাপার, যদি হঠাৎ ম'রে না যাই। আপাতত মনে হচ্ছে এই আমার পথ।'

'এ বিষয়ে তুমি একেবারে স্থির?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? খবর তো তোমার! আমাকে নিয়ে তো খবর নেই কিছু এখনও।'

'আমি আসচে মাসে লন্ডন যাচ্ছি।'

'তাই নাকি? পড়তে?'

'পরীক্ষা দিতে।'

'আই-সি-এস?'

'আই-সি-এস'।

'শুনে সুখী হলাম না।'

'তোমাকে সুখী করতে হলে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে তোমার পাশে নেমে পড়তে হয়।'

'আমাকে সুখী করবার জন্যে এ ভূমিকায় নামা দারুণ বোকামি হ'ত। অত বোকা তুমি নও।'

'যদি এমন কিছু করণীয় থাকতো যাতে তুমি আমি দুজনেই সমান সুখী হতাম তাহলে আমি তার জন্যে প্রস্তুত।'

'এমন কিছু নেই, বনমালী।'

'তাই তো দেখছি!'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটবার পর বনমালী বলল :

'আমাদের মহব্বৎ হ'লে মন্দ হ'ত না।'

হেসে উঠল বেদ মেহ্‌তা। 'মহব্বৎ তো হ'লই না, বন্ধুত্বটুকুও বেঁচে থাকে কি না সন্দেহ।'

'কেন? বন্ধুত্ব যাবে কেন?'

'তোমার চোখ এবং মন থাকলে দেখতে, বুঝতে, সংগ্রাম বাড়ছে। তুমি যাই বলো না কেন, সংগ্রাম বাড়ছে। তুমি আসচে মাসে যে উদ্দেশ্যে বিলেত যাচ্ছ, তা সফল হ'লে, সফল তা হবেই, তুমি হয়তো আমার শত্রু হ'য়ে ফিরে আসবে। প্রয়োজন হ'লে আমি তোমাকে নিজের হাতে হত্যা করব।'

শুনে সর্বাঙ্গে শিহরন লেগেছিল বনমালীশংকর ঝা'র।

'পারবে? তোমরা না অহিংস?'

'আমি গান্ধীপন্থী নই। আমি দেশের আজাদী চাই। অহিংস পথে আজাদি আসুক, উত্তম। না এলে, হিংসার পথে আজাদি আনতে হবে। আর যদি তাই হয়, তুমি আর আমি বিপরীত দিক থেকে লড়বো। আমাকে মারতে তুমি দ্বিধা করবে না, তোমাকে মারতে আমার হাত কাঁপবে না একটুও।'

সেদিন রাত্রে একা শুয়ে শুয়ে বনমালীর মনে হয়েছিল, বেদ মেহ্‌তাকে বুঝি সে ভালোবাসে।

সেদিন রাত্রেই বেদ মেহ্‌তাকে পুলিস ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, এবং তার তেত্রিশ দিন পরে বনমালী দেশ ছেড়েছিল লন্ডনের উদ্দেশে। প্রথম চেষ্টায়ই আই-সি-এস হ'য়েও দু বছরের মধ্যে ফিরে এসেছিল ভারতবর্ষে।

যুক্তপ্রদেশ কেডারে স্থান পেয়েছিল বনমালীশংকর ঝা আই-সি-এস। ১৯৩৪ সালে তার কর্মজীবন শুরু। তিরিশের অসহযোগ আন্দোলন তখন নিঃশেষ, গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের প্রতিবাদে বাংলায় ও পঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কংগ্রেসে নেতৃত্বে সংগ্রাম ব'লে বিশেষ কিছু নেই, য়ুরোপে হিটলারের নাৎসিবাদ বিজয়দৃপ্ত, এশিয়ায় জাপানি সাম্রাজ্যবাদ খোলাখুলি গ্রাস করতে চলেছে দুর্বল চীনকে, এবং ভারতবর্ষে গোলটেবিল বৈঠকের মহাসুযোগ নিয়ে, ইসলামি রাজনীতি দেশবিভাগের দাবি সবেমাত্র উচ্চারণ করতে শিখছে। বনমালীর একবারও মনে হয় নি ইংরেজ শাসন তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতিতে ভারতবাসীর পক্ষে দুঃসহ গ্লানি; বরং তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে যে ইংরেজ শাসনের অবসান হ'লে ভারত হয় গৃহযুদ্ধে খণ্ড-খণ্ডিত হবে, নয়তো জার্মান অথবা জাপানি সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়বে। নিজের নতুন জীবন-ভূমিকা তাই বনমালী গভীর দায়িত্বজ্ঞানের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। প্রথম বছরগুলির শিক্ষানবিশির শেষে সে যখন মীরাট জেলার সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত এস. ডি. ও. হ'ল, তখন থেকেই আই-সি-এস জীবনের মান, মর্যাদা, আদব, দায়িত্ব এবং মূল্য সম্বন্ধে তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। আগ্রার ডিভিশনাল কমিশনার উদয়ভানু চতুর্বেদীর মেয়ে অরুণাকে বিবাহ করাও তার নতুন

জীবনের স্বাভাবিক রূপায়ণ মনে হ'ল। চতুর্বেদী যুক্তপ্রদেশের অন্যতম সিনিয়র আই-সি-এস ; অরুণা কনভেন্টে পড়া, বি. এ. পাস. তিন বার বাবা মার সঙ্গে 'হোম-লীভে' ইংলন্ড গেছে, বেড়িয়ে এসেছে য়ুরোপে ; আই-সি-এস-এর স্ত্রী হবার জন্যে জন্ম থেকে তাকে সযত্নে তৈরি করা হয়েছে। মধ্যতিরিশে বনমালীশংকর ঝা মহকুমা শাসনের সময়ই ঠিক বুঝেছিল আই-সি-এস ভূমিকা সাম্রাজ্যশাসনের ভূমিকা, সমাজগঠনের ভূমিকা নয়, যদিও তার হাতে বহু মানুষের জীবনযাত্রার ভার, তথাপি তার আসল কাজ সমাজকে শান্ত রাখা, রাজানুগত রাখা। এ কাজের সার্থকতার ওপরেই নির্ভরশীল বাজার তহবিলে রাজস্বের সুনিয়মিত গতি, নিয়মিত রাজস্ব আদায় চালু থাকা মানে সমাজ সুশাসিত, সুশান্ত। জমিদারি পরিদর্শনের ফলে যে অভিজ্ঞতা বনমালীর অর্জিত হ'য়েছিল, মহকুমা ও জিলা শাসনে সে তার ব্যবহার করতে শিখল . ভূস্বামীদের মাধ্যমে দরিদ্র গ্রামবাসীর সামান্য রুজিরোজগারের যতোটুকু সম্ভব তুলে এনে রাজকোষ ভরতি করার নামই দেশশাসন। এই এক ধারাবাহিক নিয়ম ইংরেজ শাসনকে ভারতের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি থেকে মুগল সাম্রাজ্য পর্যন্ত সব শাসনের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে, এই ঐতিহাসিক সত্য বনমালী সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তার শাসনে, অতএব, হৃদয়প্রবণতার স্থান ছিল না, কয়েক বছরের মধ্যেই সে কড়া এবং জবরদস্ত কালেক্টর হিসেবে সুনাম অর্জন করতে পেরেছিল। তিরিশের দশকে যুক্তপ্রদেশের দৌবাত্ম্য এমন কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে নি ; জবাহরলাল নেহেরু এবং তাঁর সহকর্মীদের কর্মক্ষেত্র ছিল প্রধানত এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস ও আর কয়েকটি জিলা শহর, মহকুমা থেকে গ্রাম পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশ মোটামুটি শান্ত ছিল। কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলিম লীগ আসর জমিয়ে তুলছিল লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, আগ্রা প্রভৃতি শহরে ; জিলা শাসক হিসেবে বনমালীকে কযেকবছর কংগ্রেস-লীগ রাজনীতির মোকাবিলা করতে হয় নি। যে সব সমস্যা তার সামনে হাজির হয়েছে তা ভারতবর্ষের চিরকালীন সমস্যা : অনাবৃষ্টিতে জমি ফসলহীন, কৃষকের ঘরে আহার নেই, জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে কৃষকের জোত-জমি, ঘর-বাড়ি, স্ত্রী, কন্যা বিপন্ন ; পথঘাটের অভাব, স্কুল-কলেজ যদি বা আছে মাস্টারদের মাইনে দেবার অর্থ নেই ; ম্যালেরিয়া-কলেরা-বসন্তে গ্রাম উজাড়; বন্যায় বহু মানুষ হঠাৎ গৃহহীন। এ সব সমস্যা ভারতবর্ষের ইতিহাসের মতো প্রাচীন, এদের সমাধান বহু সময়, আয়াস, প্রযত্ন ও ব্যয়সাপেক্ষ, এ সব সমস্যা গ্রামে আগুন জ্বালায় না, ভারতবর্ষের চাষী প্রতিবাদ করে না, অন্যায়-অত্যাচার দুর্ঘটনা অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয় বিধান হিসাবে মাথা পেতে নেয় ; অতএব এ সব সমস্যার সমাধানে ত্বরিত হবার প্রয়োজন নেই, জিলা শাসকের আয়ত্তের যা বাইরে, তা নিয়ে মাথা

ঘামাবার সময়ই বা তার কোথায়? তবু, মির্জাপুরের মতো শান্ত জিলায় কালেক্টরি করার সময়েও, কখনও সখনও এক অপরিচিত সংকটের ক্ষীণ ছায়া বনমালী দেখতে পেয়েছে। যেমন একবার এক রাওবাহাদুরের সঙ্গে এক উকিলের সংঘাত, রাওবাহাদুরের পুত্র উকিলের কন্যাকে ভালোবেসে বিবাহ করেছিল, কন্যার পিতা যেহেতু কংগ্রেসি রাজনীতির পথে কারাবাস করেছে, সেইজন্যে তার ওপর শ্বশুরবাড়িতে নানারকমের অত্যাচার হ'ত। উকিল ভদ্রলোক কন্যাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবার অধিকার চেয়ে বনমালীর আদালতেই নালিশ করেছিল, আবেদন প'ড়ে কৌতূহল হয়েছিল বনমালীর, দুপক্ষকে একসঙ্গে ডেকে সমস্যাটা সে বুঝতে চেয়েছিল। বাদীর মুখোমুখি ব'সে প্রতিবাদী রাওবাহাদুর স্পষ্টই বলেছিল, তার বংশ পুরুষানুক্রমে ইংরেজ সরকারের বান্দা, ছেলে ভুল ক'রে এক স্বদেশী মেয়েকে ঘরে এনেছে, তার হাবভাব আদব কায়দা সব আলাদা, সে তলে তলে কংগ্রেসি হামলাকারীদের সাহায্য করেছে, সর্বনাশ ডেকে আনছে সংসারে। রাওবাহাদুরের ছেলে লক্ষ্ণৌতে আইন পড়ছে, সে এসবের কিছুই জানে না, জানবার দরকারও নেই তার। কংগ্রেসি উকিল, উত্তরে বলেছিল, তার মেয়ের রাজনীতিতে উৎসাহ নেই কোনওদিন ছিল না, আসলে ছেলের বিয়ে দিয়ে রাওবাহাদুর আকাঙ্ক্ষা মতো যৌতুক, গহনা, দানসামগ্রী পায় নি, তাই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মেয়েটার ওপর ক্রমাগত অত্যাচার ক'রে যাচ্ছে। বনমালী রাওবাহাদুরকে পরের সপ্তাহে একা ডেকে পাঠিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়েছিল পুত্রবধূকে পুত্রের কাছে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে দিতে, হয়তো রাওবাহাদুর তাই করেছিল, কালেক্টর হুজুরের কথা স্বয়ং রামজীর বাণীর চেয়েও অলঙ্ঘনীয়, যাই হোক, উকিল ভদ্রলোক তার আবেদন তুলে নিয়েছিল। এ ব্যাপারটা আর বনমালীর সামনে আসে নি।

সাঁইত্রিশ সালে কংগ্রেস যখন ন'টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গঠন করল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ হলেন যুক্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, এবং লীগের সঙ্গে শাসনক্ষমতা সহভোগ না ক'রে কংগ্রেস নেতারা পরবর্তিকালের দেশবিভাগের পথ প্রশস্ত করলেন, বনমালীশংকর ঝা তখন আগ্রার জিলা শাসক। ইংরেজের সার্বভৌমতায় কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করবে এ ব্যবস্থা বনমালীর মনঃপূত হ'য়েছিল ; ভারতবর্ষে ইংরেজের অভিভাবকত্ব এবং স্বায়ত্তশাসন, এ দুয়ের সুচারু সংমিশ্রণ তখন ছিল তার কাছে আদর্শ ব্যবস্থা। স্বল্পস্থায়ী কংগ্রেসি রাজত্বে বনমালী প্রথম বুঝতে পেরেছিল, শাসন ক্ষমতা হাতে পেলেই কংগ্রেসি নেতারা সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করবেন, এমন সম্ভাবনা কম। দু বছর না যেতেই লাগল মহাযুদ্ধ, কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব ছেড়ে সংগ্রামের ধ্বনি তুলল, বেশ কিছু ইংরেজ আই-সি-এস যুদ্ধের প্রয়োজনে অন্য

কাজে নিযুক্ত হবার দরুন অন্যান্য দেশি সিভিলিয়ানদের মতো বনমালীরও দায়িত্ব বাড়ল। বিয়াল্লিশের সংগ্রামের সময় বনমালী বালিয়া জেলার শাসক, হঠাৎ তাকে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ঝড়ের সম্মুখীন হ'তে হ'ল, হঠাৎ প্রথমবার বনমালী দেখতে পেল স্বাধীনতার সংগ্রামে গ্রামের লোক পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, হঠাৎ তার মনে হ'ল ইংরেজের শাসন এবার টলমল। আন্দোলনকে দমন করায় বনমালী তৎপর হ'ল ; নিষ্ঠুরতা, কঠোরতায় সে একেবারেই কার্পণ্য করল না, এবং অল্প দিনের মধ্যেই আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙতে পারল, কিন্তু এরই মধ্যে একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যা তার অতীত জীবনের একটি অবিস্মৃত অধ্যায়কে টেনে নিয়ে এল বর্তমানে। গোয়েন্দা বিভাগের এক জরুরি রিপোর্টে বনমালী দেখতে পেল কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' সংগ্রামের অন্যতম প্রধান জঙ্গি নেতা বেদ মেহ্‌তা, বালিয়া জেলার গ্রামে গ্রামে অজ্ঞাতবাস করছে এবং গ্রামবাসীদের খেপিয়ে তুলছে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে। আই-সি-এস জীবন আরম্ভ হবার পর থেকে বেদ মেহ্‌তার কথা তার মনে হয় নি তা নয়, কিন্তু অতীতের অনেক স্মৃতি, বা স্তিমিত হ'তে হ'তেও কিঞ্চিৎ সৌরভ ছড়ায়, যা সত্যি নয় অথচ মিথ্যেও নয়, যা মূল্যহীন অথচ একেবারে ফেলে দেবার নয়, তার চেয়ে বেশি জুলুম করে নি বেদ মেহ্‌তা। এখন গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্ত রিপোর্টে বনমালী বেদ মেহ্‌তার দুরন্ত রাজনৈতিক ভূমিকার বিবরণ পাঠ ক'রে বিস্মিত ; কিছুটা চমৎকৃত হ'ল। গান্ধীপন্থীদের আদত মতো সে সংগ্রামের প্রথম অঙ্কেই প্রথম শ্রেণীর কারাগারে আশ্রয় নিয়ে নেতৃত্ব জাহির করে নি, মাসের পর মাস শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে গুপ্ত বাস ক'রে জনতার মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে, একেবারে ব্যর্থ হয় নি। বনমালীর মনে পড়ল বেদ মেহ্‌তার শেষ কথাগুলি : 'তুমি আর আমি বিপরীত দিক থেকে লড়ব। আমাকে মারতে তুমি দ্বিধা বোধ কববে না, তোমাকে মারতে আমার হাত কাঁপবে না একটুও।' কথাগুলি মনে পড়তে হাসি পেল : হিরো মাত্রেই রোমান্টিক, বেদ হয়তো নিজেকে এক খুদে জোয়ান-অব-আর্ক অথবা ঝাঁসী-কী-রানী মনে করছে, স্বপ্ন দেখছে, জাগ্রত জনতার আঘাতে সাম্রাজ্য মরবে, জন্ম নেবে স্বাধীন নতুন ভারত, অথচ বনমালীর ঠোঁট বেঁকে উঠল, তোমাকে গ্রেপ্তার করতে, ধরে নিয়ে জেলে পুরতে, আমার বিশেষ তকলীফ করতে হবে না, তুমি আমাকে মারার সুযোগ পাবে না, তোমাকে ধরতে পারলে আমার সুনাম হবে, ভারত সরকার তোমাকে ধরবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

বেদ মেহ্‌তাকে কব্জা করে নি বনমালী, কেন তা আজও সে পরিষ্কার জানে না। পুলিস সুপার এবং প্রধান গোয়েন্দার সঙ্গে বৈঠক বনমালী বলেছে, 'মিস মেহ্‌তাকে

গ্রেপ্তার করলে গ্রামে অশান্তি বাড়বে, বর্তমান অবস্থায় তা বাঞ্ছনীয় নয়। বালিয়ায় অনেক কিছু ঘটে গেছে, আর বাড়িয়ে লাভ নেই। কংগ্রেসি আন্দোলন প্রায় থিতিয়ে এসেছে, মিস মেহ্‌তা নিজেই বালিয়া থেকে পালাবেন এখন। আর কিছুদিন ওঁকে নজরে রাখুন তারপর দেখা যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে বনমালীর আদালতে যে উকিল ছেলেটি এ. পি. আই'র সংবাদদাতা, তাকে তলব ক'রে বনমালী জিলায় আইন ও শৃঙ্খলার দ্রুত উন্নতির বিবরণ দেবার সময় সতর্কে জানিয়ে দিল, বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা বেদ মেহ্‌তা যে বালিয়ার গ্রামে অবস্থান করেছেন, জিলা প্রশাসন জানে, এবং শীঘ্রই তাঁকে পাকড়াও করার ব্যবস্থা হচ্ছে। বনমালী জানত বেদ মেহ্‌তা সংবাদপত্রে এ বিবরণ পড়লে বুঝবে বনমালী তাকে পালাবার সুযোগ দিয়েছে।

দেশ যখন স্বাধীন হ'ল এবং বিভক্ত, বনমালীশংকর ঝা তখন কেন্দ্রীর সরকারে সুপ্রতিষ্ঠিত জয়েন্ট সেক্রেটারি ; অতএব, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে কজন ভারতীয় আই-সি-এস সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। এর আগে, দশ-বারো বছর, বনমালীর জীবনে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্কটা ছিল বিপরীত ; অর্থাৎ, বনমালী যখন অরুণাকে ভালোবেসে গৌতম নামক সন্তানের সৃষ্টি করল, তখন, মহাযুদ্ধের মুখে, ভারতে ঘনীভূত রাজনৈতিক সংকট ; বনমালী যখন প্রথম জিলা শাসক হ'ল তখন দেশে 'ভারত ছাড়ো' সংগ্রাম ; প্রথম যখন কমিশনার হ'ল তখন বঙ্গদেশে ও বিহারে দারুণ দুর্ভিক্ষ। এ সব সংকটে ইংরেজ প্রশাসনকে মজবুত রাখতে কঠিন এবং প্রাণান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার হিসাবে চুয়াল্লিশ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বনমালীকে যুক্তপ্রদেশ থেকে নিউদিল্লি মহাধিকরণে স্থানান্তরিত করলেন, এবং যুদ্ধের শেষ বছর তাঁকে এম. বি. ই. খেতাবে ভূষিত করলেন। অথচ, ইতিহাসের প্রতিবেদন মাঝে মাঝে এমনই করুণ, মহাযুদ্ধে বিজয় লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের সাম্রাজ্য রাখার শক্তি যে নিঃশেষ হ'য়ে এসেছিল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বনমালীর তা বুঝতে কষ্ট হয় নি। দেশ স্বাধীন হবে কি না হবে, হ'লে তার রাজনৈতিক চেহারা কি দাঁড়াবে, এ সব প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর বনমালীর জানা ছিল না, কিন্তু ইংরেজ শাসন যে সাবেকি নিয়মে আর চলবে না এ সত্য তিনি, তাঁর মতো আরো অনেকে, বুঝতে পেরেছিলেন। সে সময়কার আই-সি-এস মহলে চমকপ্রদ সম্ভাবনার সংকেত দিচ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বনমালীর মতো রাজপুরুষদের চিত্তচাঞ্চল্যও এক এক পথে ভবিষ্যতের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছিল। আই-সি-এস'দের অ্যাসোসিয়েশন একদিকে ভাইসরয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিবর্তনে নিজেদের অধিকার ও সুবিধা সংরক্ষণের জন্যে লন্ডনে ইংরেজ সরকারের দ্বারস্থ, কংগ্রেসি নেতাদের কাছে নিজেদের মূল্য বাড়িয়ে তুলতে তৎপর।

বনমালীশংকর ঝা, সতীর্থদের সঙ্গে একমত হ'য়েও, প্রথম থেকেই খানিকটা স্বকীয়তার আশ্রয় নিয়েছিলেন পরিবর্তন-উন্মুখ পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবার।

অরুণার ইচ্ছে ছিল বনমালী জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে নিজস্ব আঁতাত তৈরি করে নেন, যেমন কেউ কেউ করেছিলেন। 'পণ্ডিতজি তোমার কথা নিশ্চয় জানেন,' অরুণা বলেছিলেন একদিন বনমালীকে। তাঁর সঙ্গে দেখা করো না একবার। হাজার হোক, তিনিও এলাহাবাদের লোক, তুমিও।'

বনমালী রাজি হ'ন নি। 'তুমি অকারণ অস্থির হচ্চ, অরুণা। পাবলিক রিলেশন্স্ করার জন্যে আই-সি-এস হই নি। দেশের রাজনীতি যদি বদলায়, ইংরেজ সরকার যদি বিদায় নেয়, নতুন সরকারের নেতারা হয় আমাকে চাইবেন নয় চাইবেন না। তাঁরা জানেন, অন্তত তাঁরা জানবেন, আমি কি ধরনের অফিসার, আমার রেকর্ড কি, এ নিয়ে ক্যানভাস করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। যদি আমাকে তাঁদের প্রয়োজন হয়, আমি থাকবো ; যদি না হয়, সরকারের বাইরেও কাজকর্ম অনেক পাওয়া যাবে।'

'স্বদেশীদের সম্বন্ধে তোমার রেকর্ড তো তেমন ভালো নয়!' অরুণা ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন।

'আমি আই-সি-এস হই নি স্বদেশীদের প্রশ্রয় দিতে। তাহ'লে য়ুনিভারসিটিতে পড়ার সময়ই গান্ধীর দলে ভিড়তে পরতাম। এবং আজ হয়তো মন্ত্রী হবার সুযোগ হ'য়ে যেতো।'

'তুমি সবটাতে বড্ড একরোখা! দেখ না আমার বাবা'—

'তোমার বাবা সারাজীবন স্বদেশীদের ঠেঙিয়ে এখন হঠাৎ দারুণ দেশপ্রেমী হ'য়ে উঠেছেন! শুধু তিনি কেন, আই-সি-এস'দের মধ্যেও অনেকে তাই করছেন দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা হচ্চে মুসলিম লীগের বিরোধিতা করা, দেখছ না হঠাৎ আমরা কেমন অখণ্ড ভারতের সরব সমর্থক হ'য়ে উঠেছি। আমি অখণ্ড ভারত চাই, কিন্তু আমার পেশা রাজনীতি নয়, প্রশাসন। যদি আমাকে ওঁদের প্রয়োজন হয়, ওঁদের হ'য়ে আমি ততোটাই খাটবো যতটা যতোটা এতবছর খেটেছি ইংরেজ সরকারের জন্যে। সারা জীবন রাজনীতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থেকে, আজ হঠাৎ চাকরি বজায় রাখবার জন্যে শেষরাত্রে স্বদেশী হ'য়ে ওঠা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।'

বাপ সম্বন্ধে বক্রোক্তি অরুণার পছন্দ হয় নি, কিন্তু সবার মতো তিনিও জানতেন কমিশনার ইউ. বি. চতুর্বেদী, যাঁর ভয়ে একদা বাঘ ও শেয়াল একঘাটে জল খেত, এখন রাতারাতি নিদারুণ কংগ্রেস প্রেমিক হ'য়ে উঠেছেন। অরুণা, অতএব,

আত্মরক্ষার সুরে বলেছিলেন, 'মানুষ কি বদলায় না? বাবা হয়তো এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন।'

'আমি পারি নি, বনমালীর কণ্ঠস্বরে অনুতাপের বাষ্প ছিল না। 'ইংরেজের রাজত্ব রক্ষার জন্যে আই-সি-এস হওয়াটা ভুল হয়েছিল, অথবা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে চাকরি করাটা, এ কথা আমি মানতে রাজি নই। এতদিন চাকরি জীবনে যা করেছি ঠিক করেছি, ওঁরা আমাকে রাখলে ওঁদের জন্যেও ঠিকই কাজ ক'রে যাব, এই হ'ল আমার সহজ বক্তব্য।'

'কেউ কেউ বলছে ইংরেজের প্রিয় আই-সি-এস'দের ওঁরা রেহাই দেবেন না,' অরুণার স্বরে ভয়।

'তারা ভুল বলছে। তারা না চেনে কংগ্রেসি নেতাদের, না তাঁদের সংগ্রামকে, না সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিবর্তনের আসন্ন চেহারাকে। এসব কথায় তুমি তুমি কান দিয়ো না, অরুণা।'

যা অরুণাকে বনমালী বুঝিয়ে বলেন নি, তা একদিন সতীর্থ অর্জুন কাউলকে বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি নিঃসন্দেহ যে, কংগ্রেসি রাজত্বকালেও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে না। ডেমোক্রেসি হবে, নির্বাচন হবে, নতুন পার্লামেন্ট তৈরি হবে, নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হবে, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস ছাড়া সে গণতন্ত্র চলবে না। তুমি দেখবে, ইংরেজের তৈরি প্রশাসন নিয়েই নতুন নেতারা নতুন জমানা শুরু করবেন, আমাদের ডাক পড়বে স্বাধীন ভারত নির্মাণের কাজে, নেতারা রথী হবেন, আমরাই থাকবো সারথি।

অর্জুন কাউল কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, নেহেরু পরিবারের সঙ্গে দূর সম্পর্কিত। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এ সম্পর্ককে তিনি অনেকটা জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন।

অর্জুন কাউল বলেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে অমত হ'তে পারছি না, কিন্তু পুরোপুরি একমত হ'তেও সাহস হচ্চে না।'

'ভুলে যেয়ো না, ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কটা কখনই ঠিক শত্রুর সম্পর্ক নয়। ইংরেজি শাসন এঁরা চান না, কিন্তু ইংরেজকে এঁরা মানেন, রীতিমতো শ্রদ্ধা করেন। রাজনৈতিক নির্ভরতা এঁরা হয়তো শীগগিরই কাটিয়ে উঠতে পারবেন, কিন্তু ইংরেজের ওপর যে বিরাট সাংস্কৃতিক নির্ভরতা তৈরি হ'য়ে আছে, তা আরও বহুদিন চলবে। কংগ্রেসের আসল স্লোগানটা কি জান? 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু হোক, বৃটিশ রাজনৈতিক সিস্টেম্ দীর্ঘজীবী থাক।''

'তোমার মতো অ্যাংলোফিল দ্বিতীয় নেই,' অর্জুন কাউল মন্তব্য করেছিলেন।

'অনেক আছেন, তার মধ্যে সর্বপ্রধান হ'লেন স্বয়ং জবাহরলাল নেহেরু। আমার দোষ, আমি সাফ কথা বলি, তোমরা বলো না। কংগ্রেস স্বাধীনতা পাচ্ছে লড়াই ক'রে নয়, ইংরেজকে তাড়িয়ে নয়, ইংরেজের সঙ্গে আপস-ব্যবস্থায়। তুমি দেখবে ভাইসরয়ের প্রাসাদে রাষ্ট্রপতি প্রতিষ্ঠিত হবেন, মন্ত্রীরা বেছে নেবেন বড়বড় দৌলতখানাগুলি, আই-সি-এস'রা রাজত্ব চালাবে, বাইরে থেকে হঠাৎ বোঝাই যাবে না দেশটা বদলে গেছে, নতুন জমানা নিয়েছে জন্ম, অথচ সত্যি কিন্তু নতুনের দাবি উঠে আসবে চতুর্দিক থেকে, এবং আমরা, তোমার-আমার মতো যারা এতদিন ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষা করেছি, আমাদের দায়িত্ব হবে আর এক গোষ্ঠীর স্বার্থ ও সুবিধে সংরক্ষণের।'

'তুমি এবার বাড়াবাড়ি করছ, বনমালী,' অর্জুন কাউল আর সইতে পারেন নি, 'ওঁরা আমাদের নতুন সমাজ গড়বার মহান দায়িত্ব দিতে পারেন, কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত অন্ধকার।'

বনমালী হেসে উঠেছিলেন।

'অর্জুন, তুমি ইতিহাসের তুখোড় ছাত্র। বলতে পারো আমলারা কখনও কোথাও নতুন সমাজ তৈরি করেছে?'

বনমীলাশংকর ঝাকে দেশ স্বাধীন হবার সময় রাজকর্ম থেকে বিদায় নিতে হয় নি। বরং বিত্ত মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বিভাগে তিনি অ্যাডশনাল সেক্রেটারি নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। তাঁর কৌতুক লেগেছিল, এবং তিনি অনুমোদনও করেছিলেন, যখন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম বিত্তমন্ত্রী বাছাই করতে প্রধানমন্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত একজন শিল্পপতি অর্থাৎ অভিজ্ঞ ক্যাপিটালিস্ট এর শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। এবং যখন রাজস্ব বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন তৎকালীন সমাজকে ঢেলে সাজাবার দিকে নতুন নেতাদের তেমন নজর নেই, যেমন রয়েছে তাকে পাকাপোক্ত ক'রে তোলবার দিকে। আরও যখন বুঝতে পারলেন যারা বিত্তবান, বিত্ত তাদের শিল্পেই হোক অথবা জমিতে হোক, তাদের বিত্তচ্যুত ক'রে নতুন সমাজ গঠনের পরিকল্পনা স্থান পায় নি স্বদেশী নেতাদের মনে, বরং তাঁদের সংকল্প নতুন বিত্ত সৃষ্টি ক'রে দেশকে সতেজ ক'রে তোলার। এ নীতির সঙ্গে বিরোধ ছিল না বনমালীশংকর ঝার, গরিব দেশ ভারতবর্ষে কতিপয় বিত্তশীলকে দরিদ্র ক'রে তোলার মধ্যে তিনি মহৎ কিছু দেখতে পান নি, এবং ক্যাপিটালিস্ট বিত্তমন্ত্রীদের সঙ্গে

(পর পর দুজন মন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন বনমালী) তাঁর সদ্ভাবই ছিল রাজস্ব বিভাগের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি থাকাকালীন বনমালী বুঝতে পেরেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারিগুলির আয়ু শেষ হ'য়ে এসেছে, বিরাট মৃতপ্রায় জমিদারিগুলি এবার কয়েক গুণ বেশি বড় এবং মাঝারি জমিদারিতে পরিণত হবে। এ উপায়ে সৃষ্ট হবে নতুন সমাজের বৃহত্তর এবং দৃঢ়তর ভিত্তি, যাব নাম হবে জমিদারি সংস্কার, কিন্তু আসলে যা হবে জমিদারী প্রথার নতুন ধরনের বাঁটোয়ারা।

ললিতশংকর ঝার ইতিমধ্যে গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে। পিতৃবিয়োগ বনমালীর কাছে বড় রকমের দুর্ঘটনা অথবা ঘটনা মনে হয় নি। বিবাহের পরে বনমালীর জীবনে প্রকৃত ঘটনা গৌতম, তারপর রমী, যদিও গৌতম-ঘটনার মতো বিরাট সে নয়। বনমালী বাপ হবার আগে জানতে পারেন নি তাঁর মধ্যে এত ব্যাপক ও গভীর পিতৃত্ব ছিল, নিজের বাবাকে আপনার ক'রে না পাবার জন্যেই বোধকরি ; অকৃপণ ঔদার্যে তিনি প্রায় সবটুকু পিতৃত্ব গৌতমকে দিয়ে বসেছিলেন ; তাই, রমী যখন জন্মাল, গৌতমের দুবছর বয়সে, তখন বনমালীর দেবার মতো পিতৃত্ব উদ্বৃত্ত ছিল সামান্য, যে রমীকে ভালোবেসেও তিনি কোনওদিন একান্ত কাছে আনতে পারেন নি। ললিতশংকরের থেকে গৌতম পর্যন্ত তিন পুরুষের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে বনমালীর মনে যেমন একটা উষ্ণ সংকল্প গড়ে উঠেছিল গৌতম যখন স্কুল যেতে শুরু করল তখন থেকে ; বনমালীব মন যেন নিজেই স্থির ক'রে বসল গৌতম আলাদা, সে নতুন, সে ধারাবাহিক নয়, তাকে নিয়ে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এ সিদ্ধান্ত একদিন বনমালীকে নিয়ে গেল আগ্রা শহরে, পৈতৃক জমিদারির মন্ত্রণালয়ে যেখানে মাতৃকাপ্রসাদের একচ্ছত্র রাজত্ব।

'আপনার সঙ্গে একটু জরুরি কাজ আছে কাক্কাজি,' বনমালী বললেন মাতৃকাপ্রসাদকে, আহারান্তে, অপরাহ্নে ; 'জমিদারিটা আমি আর রাখতে চাই নে।'

মাতৃকাপ্রসাদ উদাস কণ্ঠে বলল, 'তাই তো, রাখবেই বা কি ক'রে? শুনছি সরকার জমিদারি নিয়ে নেবে, বদলে এক পয়সাও দেবে না।'

বনমালী বললেন, 'তা কখনও হবে না। জমিদারিগুলি বড় জোর খানিকটা ছোট হ'য়ে যাবে। তা ছাড়া, উদ্বৃত্ত জমি যদি সরকার নিয়ে নেয় তার জন্যে উচিত দাম অবশ্য দেওয়া হবে।'

'তুমি যখন বলছো তখন নিশ্চয় তাই,' মাতৃকাপ্রসাদ অবিশ্বাস অনুহ্য রেখে বলল, 'আমি মুখ্যু মানুষ, লোকে যা বলে তাই বলি।'

'জমিদারিটা বিক্রি ক'রে দেব, কাক্কাজি,' বনমালী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

'আপনি যদি চান, কিনে নিতে পারেন।'

'আমি?' আকাশ থেকে পড়ল মাতৃকাপ্রসাদ। 'আমার অর্থ কোথায়, বাবাজী? জমিদারির অবশ্য অনেকটাই গেছে, রাজামশাই বৃদ্ধবয়সে অনেকখানি বেচে দিয়েছেন। কিছু দানও করেছেন; তা ছাড়া, এখন, এ বাজারে জমিদারির দামও বিশেষ নেই, খদ্দের পাওয়া কঠিন, তবু আমার কি অর্থ আছে বাবাজী—'

মাতৃকাপ্রসাদকে থামিয়ে বনমালী বললেন, 'জমিদারির অনেকটাই নানা কায়দায় আপনি নিয়ে নিয়েছেন, আমার অজানা নেই। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, কাক্কাজি, আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনুন, আপনার ভালোর জন্যেই বলছি। জমিদারিটা সারা জীবন আপনি দেখে এসেছেন, আপনার সঙ্গে ওটার রক্তের সম্পর্ক। আপনি যা গুছিয়ে নিয়েছেন না-নিয়েছেন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথার সময় নেই। আমি চাইনে আমার ছেলে গৌতমের সঙ্গে জমিদারির কোনও সম্পর্ক থাক। আমি চাইনে গৌতম কখন ও বুঝতে শিখুক সে জমিদারের সন্তান। তাই ওটা বিক্রি ক'রে দেব। জমিদারি সংস্কার আইন এলেও তাকে কি ক'রে ফাঁকি দিয়ে, পুরো জমির মালিকানা রেখে, তার সঙ্গে সরকারের কাছে থেকে 'ক্ষতিপূরণ' আদায় করতে হবে তা আপনি খুব ভালো ক'রেই জানবেন। আগ্রা এলাহাবাদ দিল্লীর উকিল ব্যারিস্টাররা আপনাকে সব পথ বাতলে দেবে। আমি এক লাখ টাকা পেলে জমিদারি বেচে দেব। দামটা যে খুব সস্তা তা আপনি বিলক্ষণ জানেন। আপনাকে এক মাসের সময় দিচ্ছি। যদি কিনতে চান কিনে নিন নইলে অন্য খদ্দের আমার ঠিক আছে।'

গৌতম বনমালীশংকর ঝা'র জীবনে সবচেয়ে প্রধান ঘটনা হ'য়ে রইল। তার মধ্যে বনমালী খুঁজে পেলেন নতুন শৈশব, নতুন কৈশোর, যা নিজের জীবনে মনে হয়ে নি কোনওদিন পেয়েছেন, নিজের ছোটবেলা যেন তাঁর নিজায়ত্ত ছিল না, ওটা কেটেছিল অন্যের ব্যবস্থামতো, পিতৃ-সান্নিধ্যের অভাব এবং মার কাছ থেকে বাধ্যতামূলক দূরে-থাকা, এবং একদিন, হঠাৎ, অসময়ে, বড় তাড়াতাড়ি, মার মৃত্যু। জমিদার পরিবারের একমাত্র সন্তানের ছোটবেলা, তার মধ্যে যেটুকু বনমালীর নিজস্ব ছিল তা কেবল দুরন্তপনা, জেদ এবং অহংকার, যা দিয়ে বালক, কিশোর এবং যুবক বনমালী আত্মরক্ষা করতো, নিজের স্বকীয়তাকে কোনও মতে রাখতো বাঁচিয়ে। গৌতমের ছোটবেলা অন্যপ্রকার, যাতে নতুন মানুষের নতুন জীবন আরম্ভ, ধীরে ধীরে কখনও-বা দ্রুত, তার বিকাশ। বিবাহের সাত বছর পর গৌতমের জন্ম, সাত বছর বনমালী পিতা হবার দায়িত্ব গ্রহণে ছিল অপ্রস্তুত, শুধু এই কারণে যে নিজের

ছেলেবেলাটাকে কখনও তার কাছ বাঞ্ছনীয় মনে হয় নি। অরুণা বড় ঘরের শিক্ষিত আধুনিক মেয়ে, মা হবার তাড়া ছিল না তার তথাপি ছয় বছর অপেক্ষা করতে গিয়ে সে অস্থির হ'য়ে উঠেছিল, মা-হতে-পারার ক্ষমতা অপ্রমাণের অস্থিরতা। যখন বনমালী পিতা হবার জন্যে প্রস্তুত, যখন অরুণা প্রথম গর্ভবতী, তখন থেকে গৌতমের জন্ম পর্যন্ত অরুণা যেমন সুস্থির সৌকর্যে সুশান্ত-কোমল হ'য়ে উঠেছিল, বনমালীর হ'য়েছিল তেমনি নিদারুণ অস্থিরতা, অরুণার পেটের ওপর কান পেতে, হাত বুলিয়ে বনমালী সন্তানের জীবিত উপস্থিতি অনুভব করত, দশ মাসের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা তার কাছে লাগত অসহ্য। গৌতম পেটে থাকবার সময় অরুণাকে বোধহয় বনমালী সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিল, মাঝে মাঝে নিজের চেয়েও, তখন অরুণাকে কেমন রহস্যময়ী মনে হ'ত, কোনও এক রাতের সঙ্গম সময়ে তার দেহের মধ্যে কি জাদু ঘটে গেল, আমার বীজে অঙ্কুরিত হ'ল নতুন প্রাণ, নতুন মানুষ, তাকে প্রতিদিন অরুণা নিজের দেহ-প্রাণ-রসে জীবিত রাখছে, একটু একটু করে বড় করছে, সঙ্গে সঙ্গে অরুণা নিজেই যাচ্ছে বদলে, পেট বাড়ছে, স্তন বড় হচ্ছে, বোঁটার চারদিকে ঘনিয়ে আসছে কৃষ্ণবর্ণের মাতৃত্বের চিহ্ন। একদিন যখন অরুণা মা হ'ল, জন্ম দিল প্রথম পুত্রের, বনমালীর মনে হ'ল পৃথিবী নতুন ক'রে সূর্যের পরিক্রমা শুরু করল, তার নিজের জন্ম হ'ল পুনর্বার। সেই প্রথম দিন থেকে গৌতম বনমালীর পুত্র : তাকে যে মাতৃস্তনের জন্যে অরুণার ওপর নির্ভর করতে হয় তাও বুঝি বনমালীর অপছন্দ। গৌতম বছরের পর বছর এগিয়ে চলল, বনমালীও তার সঙ্গে চলল এগিয়ে, অন্য-জীবনের অন্য-স্তরে। গৌতমকে নিয়ে বনমালীর সব চেয়ে বড় ভয় ছিল ধারাবাহিকতার, সে চায় নি গৌতম বনমালীশংকর ঝা'র সংস্করণ হয়ে উঠুক, চেয়েছিল সে স্বতন্ত্র হোক, নতুনের অধিকার নিয়ে পৃথক অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণতা পাক।

'গৌতম, তুমি বড় হ'য়ে কি হবে?' বনমালী প্রায়ই প্রশ্ন করত ছেলেকে, যখন সে স্কুলের মধ্যমস্তরে।

'উঁচু হব বাবা,' জবাব দিত গৌতম প্রথম প্রথম, 'তোমার মতো উঁচু হবো।'

'ও ঠিক আর এক বনমালীশংকর ঝা হবে, দেখে নিয়ো,' ভবিষ্যৎবাণী করত অরুণা।

'না, হবে না,' জোরের সঙ্গে ঘোষণা করত বনমালী। 'কিছুতেই হবে না। গৌতম অন্যরকম হবে, অন্য কিছু।'

'ডাক্তার? এনজিনিয়র? কি হবে গৌতম?' ঔৎসুক্যে প্রশ্ন করত অরুণা।

'ওসব তো সবাই হয়?' মন উঠত না বনমালীর।

'আই-এ-এস? আই-এফ-এস?'

'মাই গড!' আঁতকে উঠত বনমালী।

'তবে কি? জার্নালিস্ট? অধ্যাপক?' অরুণার কণ্ঠে হতাশা। 'তা হ'লে তো দুবেলা ভাত জুটবে না।'

'গৌতম আলাদা হবে। অন্য কিছু।' অন্ধকারে পথহারা মন্তব্য করত বনমালী।

'অন্য কিছু মানে কি? দারোয়ান? ড্রাইভার?' অরুণার হাসিতে বনমালীর পরাজয় দেখে প্রচ্ছন্ন সন্তোষ।

'ওর যা ইচ্ছে তাই হবে। গৌতম অন্য কারুর ইচ্ছেয়, অন্য কারুর নিয়মে কিছু হবে না। নিজের ইচ্ছেয়, নিজেকে ভালোবেসে, বেঁচে থাকাতে ভালোবেসে যা হ'তে চায় তাই হবে।'

স্বামী হেরে গিয়ে অর্থহীন কথা বলছে বুঝতে পেরে অরুণা মজা পেত।

'তুমিও তো নিজের ইচ্ছেয় আই-সি-এস হ'য়েছিলে!'

'ভুল। আমাদের কালে বড় ঘরের মেধাবী ছেলেদের আই-সি-এস হওয়া নিয়ম ছিল। মেধাবী যুবক মাত্রেরই প্রধান লক্ষ্য ছিল আই-সি-এস।'

'তুমি তো জবরদস্ত জমিদার হ'তে চেয়েছিলে!' অরুণার স্বরে আতঙ্ক।

'আমি বোধহয় নেপোলিয়ন বা গারিবল্‌দি অথবা জর্জ ওয়াশিংটন হ'তে চেয়েছিলাম। সে পথ বন্ধ দেখে, ইচ্ছে হয়েছিল জবরদস্ত জমিদার হবার। শেষ অবধি হলাম আই-সি-এস।'

'ভাগ্যিস হ'য়েছিলে। নয়তো আমার সঙ্গে বিয়ে হ'ত না। জবরদস্ত জমিদারের সঙ্গে বাবা আমার কক্ষনও বিয়ে দিতেন না।

'ব্যারিস্টার হ'লে বেদ মেহ্‌তাকে বিয়ে করা যেতো।'

অরুণা রুষ্ট হ'য়ে বলত, 'সামলাতে পারতে না। জেলে জেলে জীবন কাটাতে হ'ত।'

'আজকে হয়তো মন্ত্রী হবার সুযোগ পেতাম।'

'তাহ'লে গৌতমকে পেতে না।'

'তা ঠিক। এখানে তোমার চরম বিজয়, অরুণা। তোমাকে না পেলে গৌতমকে পেতাম না।'

'তা হ'লে দেখ, আই-সি-এস তোমাকে হ'তেই হ'ত!'

'না হ'য়ে উপায় ছিল না বলেই তো হলাম! কিন্তু গৌতম?'

'গৌতম কি?'

'গৌতমের উপায় থাকবে। নিজের ইচ্ছেমত বেঁচে থাকতে ভালোবেসে যা কিছু

হবার উপায় থাকবে। ওকে আর-কোনও-পথ-নেই বলে কোনও একটা নির্দিষ্ট পথে চলতে হবে না।'

চাকরি করতে গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধ লাগল মধ্য পঞ্চাশে, যখন ভারত সরকারের সামাজিক নীতির প্রথম রূপায়ণ হ'ল শুরু। বনমালীশংকর ঝা নতুন গঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন। সরকারি মালিকানায় নতুন শিক্ষা গঠনের প্রয়োজন মেনে নিতে তাঁকে বেগ পেতে হ'ল না, হ'লেও এ বিষয়ে আমলা হিসেবে তাঁর করণীয় ছিল খুব কম, কেননা রাজনীতির প্রথম পাঠেই লিপিবদ্ধ রয়েছে, যে নীতির রূপায়ণ হবে রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা, তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকবে প্রশাসনের। ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশে বৃহৎ শিল্প নির্মাণে সরকারের মুখ্য সক্রিয় ভূমিকা অনিবার্য, বনমালী স্বীকার করলেন, যা স্বীকার করলেন না তা হ'ল একে সমাজবাদ নামে বিভূষিত করা। মন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনার সময় বনমালী বুঝতে পারলেন সমাজবাদের সত্যিকারের তাৎপর্য সম্বন্ধে রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা একেবারেই সুস্পষ্ট নয়। বনমালী মন্ত্রীকে বললেন :

'স্যার, পাবলিক সেক্টর তৈরি করলেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হবে, এ কিন্তু ঠিক নয়।'

মন্ত্রী বললেন, 'উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হ'লেই সমাজতন্ত্র। আপনি দেখছি সমাজতন্ত্র বিষয়টাই বোঝেন না।'

উত্তরে বনমালী বললেন, 'আমার যতদূর ধারণা, আসল কথা হচ্ছে রাষ্ট্রের মালিক কে।'

'তার মানে? রাষ্ট্রের মালিক জনসাধারণ! পার্লামেন্ট!'

'তাই যদি আপনাদের মনে হ'য়ে থাকে। তাহ'লে আমার ভুল হয়েছে স্বীকার করতেই হবে।'

মন্ত্রী ঈষৎ হেসে বললেন, 'পণ্ডিতজির নিজের হাতে রচিত দ্বিতীয় যোজনার ভূমিকাটা ভালো ক'রে পড়বেন। ওটা আপনাদের বাইবেল অথবা গীতা। বুঝলেন?'

বনমালী এ নিয়ে কথা বাড়ালেন না। সমাজতন্ত্রে তাঁর নিজের কিছু ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না কোনওদিন, এখনও নেই। শিল্পায়নের একমাত্র প্রশস্ত পথ তাঁর মতে, ধনতন্ত্রের পথ, শিল্প-বিপ্লবের পথ। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সরকারের নেতৃত্বে সমাজবাদী ব্যবস্থা তৈরির সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ অকৃত্রিম। ভূমি-সংস্কারে গরিব চাষী, ভাগচাষী জমি পায় নি, পেয়েছে দেশব্যাপী দু'কোটি অবস্থাপন্ন চাষী যারা সবাই জমিদার, এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের সমাজের সত্যিকারের কাঠামো।

সরকারী নেতৃত্বে গঠিত শিল্পে শ্রমিক মজদুরদের কর্তৃত্ব থাকবে না, বরং দেশী ধনতন্ত্রের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের ক্রমে ক্রমে ব্যাপক মিতালি গ'ড়ে উঠবে, বুদ্ধির স্বচ্ছতা এটুকু বনমালীকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল। তার চেয়ে, বনমালীর নিজস্ব মতে, শিল্প গঠনের মুখ্য দায়িত্ব দেশী-বিদেশী পুঁজিবাদীদের হাতে তুলে দিলে সরাসরি শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হ'ত অল্প সময়ে। মন্ত্রীরা সোজা ধনতান্ত্রিক পথে যেতে চান না, সমাজতন্ত্রের পথ ধরে ধনতন্ত্রে পৌঁছতে চান। তা না হয় চাইলেন, সেক্রেটারি বনমালীশংকর ঝা'র তাতে কিছু করণীয় নেই, কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি ক'রে ধনতন্ত্রকে সমাজবাদ বলে চালিয়ে দেবার সুগঠিত প্রয়াসকে সহজে তিনি মেনে নিতে পারলেন না।

গৌতম তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ছে। গৌতমকে বনমালী বললেন, 'বেঁচে থাকবার অনেক মাশুলের মধ্যে একটা হ'ল তুমি যা জান সত্যি, অন্যের দাপটে তাকে মিথ্যে বলে মেনে নিয়ে, যা সত্যি নয় তাকেই সত্যি বলে চালান।'

গৌতম বলল, 'বিজ্ঞাপনে তো তাই করা হচ্ছে প্রতিদিন, তাই না বাবা?'

'আজকাল গভর্নমেন্ট চালাতে গিয়েও হামেশা বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করতে হয়।'

'তোমাকে করতে হয়?'

'হয় বৈ কি? ধরো এই ইন্ডিয়ান সোশ্যালিজম। আসলে ওটা হচ্ছে ক্যাপিটালিজম ইন অ্যান আন্ডারডেভেলপ্‌ড্ সোসাইটি। অথচ বিজ্ঞাপনে রোজ প্রচার করতে হয় সোশ্যালিজম।'

'এরই নাম প্রচার, না বাবা?'

'তোকে একথা কেন বললাম জানিস? শুধু তোকে জানিয়ে রাখতে যে তোর বাবা জেনে শুনেও মিথ্যে প্রচার করছে।'

'তুমি একা নও। সবাই করছে।'

'জানি রে, গৌতম, জানি। সবাই করছে। তাই ভয়ে ভয়ে ভাবি, তুই-ও কি করবি?'

বিরোধ বাধল দুটি বিষয়ে। প্রথম পাবলিক সেক্টর প্রজেক্ট কারা চালাবে তাই নিয়ে। বনমালী দেখতে পেলেন অধিকাংশ আই-সি-এস অফিসরদের ইচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের হাতেই থাক।

মন্ত্রীদেরও তাঁরা অনেকখানি স্বমতে গিয়ে এসেছেন। আই-সি-এর'দের সমর্থন পেয়ে আই-এ-এস অফিসাররা আরও জোরের সঙ্গে শিল্প-পরিচালনায় আমলাদের শীর্ষত্ব সমর্থন করলেন।

বনমালীশংকর ঝা এ ব্যবস্থার দুর্বলতা দেখিয়ে নোট পাঠালেন মন্ত্রীকে।

'আপনার নোট পড়লাম,' মন্ত্রী বললেন উদারতা দেখিয়ে। 'আপনার যুক্তিগুলি একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সিভিল সার্ভিস দিয়েই আমাদের পাবলিক সেক্টর প্রজেক্টগুলি চালাতে হবে। ভবিষ্যতে এ জন্যে একটা পারদর্শী 'ক্যাডার' তৈরি করতে হবে।'

বনমালী বললেন; 'স্যর, একবার আমাদের হাতে পাবলিক সেক্টরের ম্যানেজারিয়েল পদগুলি এসে গেলে আমরা সহজে ছেড়ে দেব আপনি কি বিশ্বাস করেন? নতুন 'ক্যাডার' তো তখন আমরাই তৈরি করব। দেখতে পাবেন এমন ভাবে তা তৈরি হবে যে ম্যানেজারদের ওপর কর্তৃত্ব আমাদের হাতেই থেকে যাবে।'

মন্ত্রীর ঠোঁটে হাসির কুঞ্চন দেখা দিল।

'আপনারা চেষ্টা করলেও, যাতে তা না হয় সেটা দেখবার শক্তি আমাদের আছে।'

বনমালীর কান গরম হ'য়ে উঠল : 'সার, আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে সরকার নামক সংসার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বার্থগোষ্ঠী নিজের ক্ষমতা, সুবিধে বাড়াতে ও গুছিয়ে নিতে তৎপর। আমরা সাধারণত বলে থাকি সিভিল সার্ভিস কেবল আদেশ আর নীতি পালন করে, রাজনীতি করে না। এ ধারণা ঠিক নয়। সিভিল সার্ভিস নিরপেক্ষও নয়। তারও রাজনীতি আছে, নীতির বাছাই আছে। যে কোনও গভর্নমেন্ট, সিভিল সার্ভিস একটা শক্তিশালী স্বার্থগোষ্ঠী, সে চায় অনবরত তার শক্তি ও সুবিধে বাড়ুক।

মন্ত্রী কুঞ্চিত হাসি বজায় রেখে জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনার ধারণা আমরা এসব বুঝি নে, জানি নে!'

বনমালী বলেছিলেন, 'যা আমরা জানি এবং বুঝি, অন্তত তাই দাবি করি, তা বার বার প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশে লাভ ছাড়া ক্ষতি আছে কি স্যর?'

মন্ত্রী এবং সেক্রেটারির মধ্যে রেষারেষি কিছুটা সর্বদাই লেগে থাকে, দুজন দুজনকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দেন। মন্ত্রীকে নির্ভর করতে হয় সেক্রেটারির ওপর, সেক্রেটারির ক্ষমতা-উৎস মন্ত্রী। মন্ত্রী যদি বিরাট পুরুষ হন, রেষারেষির ক্ষেত্র এমনিতেই সংকুচিত হ'য়ে যায়। বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয় মন্ত্রী অপেক্ষাকৃত দুর্বল হ'লে।

শিল্পমন্ত্রী না ছিলেন বিরাট পুরুষ, না একেবারে দুর্বল। সেক্রেটারির সঙ্গে রেষারেষি, অতএব, প্রায় অবধারিত।

বনমালী বলেছিলেন, 'স্যর, শিল্পপ্রধান দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়

শিল্প-পরিচালনায় হয় পুঁজিপতিদের প্রাধান্য, নয়তো একচ্ছত্র ক্ষমতাসীন পার্টির। সিভিল সার্ভিস দিয়ে শিল্প পরিচালনার নজির নেই ইতিহাসে। তা ছাড়া, শিল্পপবিচালনায় যে পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য দরকার সিভিল সার্ভিস তাতে অভ্যস্ত নয়। আমার ভয়, আই-সি-এস, আই-এ-এস দিয়ে সরকারি শিল্প চালাতে গেলে প্রত্যেকটি প্ল্যান্টকে আমরা এক একটি সরকারি দপ্তরে পরিণত করব। লাল-ফিতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, লাভ-ক্ষতির জন্যে ম্যানেজারদের দায়িত্ব থাকবে না, ক্রমে ক্রমে প্রতিটি শিল্প এক একটি সাদা হাতিতে পরিণত হবে।'

অসামান্য বিজ্ঞতার সঙ্গে মন্ত্রী শেষ রায় দিয়েছিলেন : 'এসব সম্ভাবনা নেই তা নয়। কিন্তু আপনি এগুলোকে খুব বাড়িয়ে দেখছেন। আমাদের বিশ্বাস এ-সব সম্ভাবনা যাতে বাস্তবে পরিণত না হয় তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।'

বনমালীশংকর ঝা এ মতবিরোধে পরাস্ত হ'য়েছিলেন।

কিন্তু একেবারে নতজানু হন নি।

মাস ছয়েক পরে তিনটি বৃহৎ শিল্পে ম্যানেজারিয়েল নিয়োগের সময় মন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধ অন্য-পথে দেখা দিয়েছিল।

মন্ত্রী চেয়েছিলেন তাঁর জামাতাকে একটি শিল্পের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত করতে। সরাসরি তিনি বনমালীকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। অন্যতম জয়েন্ট সেক্রেটারি, জনৈক সিনিয়র আই-এ-এস, যিনি মন্ত্রীর নিজ প্রদেশের লোক, এবং একান্ত নির্ভরযোগ্য অনুগত, বনমালীর কাছে বিষয়টা উত্থাপন করেছিলেন।

শুনে বনমালী বলেছিলেন, 'সরকারি শিল্পগুলি তাহ'লে আমাদের এবং মন্ত্রীদের সমবেত স্বার্থের তীর্থভূমি হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, কি বল, সাহানী?'

জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহনলাল সাহানী বলেছিল, 'এ লোকটিব যোগ্যতার অভাব নেই।'

'যোগ্যতার প্রশ্ন উঠছে না। আমরা বিজ্ঞাপন দিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মারফত নিয়োগ করছি না, করছি মন্ত্রণালয়ের মারফত। এর চেয়ে যোগ্যলোকের আবেদনের সুযোগ পর্যন্ত দিচ্ছি না।'

'তাহ'লেও, লোকটির যোগ্যতা সম্বন্ধে যদি আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি, তাহ'লে আপত্তির কারণ আছে কি?'

'আছে, এবং তুমি তা ভালো ক'রেই জান।'

'এইচ-এম-আই আশা করবেন আপনার সহায়তা।'

'আমার ব্যাপারটা একেবারে ভালো লাগছে না।'

নিয়োগের জন্যে পাঁচ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের

প্রতিনিধি, এবং বাইরে থেকে তিনজন পারদর্শী নিয়ে বিশেষ নির্বাচন কমিটি তৈরি হ'য়েছিল। কমিটির সভা বসলে বনমালীশংকর ঝা দেখতে পেলেন প্রস্তাবিত নামগুলির অর্ধেক বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক নেতাদের সুপারিশ। সিভিল সার্ভিস থেকে যাদের নাম এসেছে তারাও মন্ত্রীদের অথবা অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশ বহন করছে। বনমালী আরও দেখতে পেলেন পাঁচ জন সেক্রেটারির মধ্যে তিনজন শিল্পমন্ত্রীর জামাতার নিয়োগের সমর্থক।

বনমালীশংকর ঝা একটা ছোটখাট বক্তৃতা করলেন। সরকারি মালিকানায় যে সব শিল্প তৈরি হচ্ছে তাদের সার্থকতার ওপর দেশের অর্থনীতি ও সমাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। শিল্পের প্রধান সমস্যা হ'ল ম্যানেজমেন্ট। উপযুক্ত ম্যানেজমেন্টের অভাব হ'লে শিল্পগুলি ঠিকমত চলবে না, উৎপাদন বাড়বে না, হিসেবের অঙ্কে লাল গভীরতর হবে। কমিটিকে অতএব, কঠিন বিবেকের সঙ্গে নিয়োগের জন্যে লোক বাছতে হবে। পদপ্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশ লাভ করেছে। কেউ কেউ তাঁদের নিকট আত্মীয় অথবা উমিদার। কমিটি, তিনি আশা করেন, এসব সুপারিশে বিচলিত হবে না। একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিদের নামই নির্বাচিত হবে।

শেষপর্যন্ত দেখা গেল মন্ত্রীদের সুপারিশে অনেকেই নির্বাচিত হ'ল। তার মধ্যে শিল্প-মন্ত্রীর জামাতা অন্যতম। বনমালীশংকর ঝাও শেষ পর্যন্ত তার পক্ষেই হাত তুললেন।

গৌতম তখন স্কুল শেষ ক'রে কলেজে ভর্তি হয়েছে।

মর্ডান স্কুল থেকে সেন্ট্ স্টিফেন্স্।

মন্ত্রণালয়ের কাজকর্ম সেরে বনমালীর বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। অরুণা বাড়ি ছিলেন না, পরমেশ্বর দেশমুখের মেয়ের জন্মদিনে গিয়েছিলেন রমীকে নিয়ে। বাড়ি ফিরে বনমালী একা একা হুইস্কি পান করছিলেন। এমন সময় গৌতম ফিরল কলেজ থেকে।

'ক্লাবে যাও নি, বাবা?' গৌতম বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

'না। মেজাজটা ভালো নেই, অন্তত ছিল না,' বললেন, বনমালী।

'নিশ্চয় দেশের মঙ্গলের জন্যে আবার বড় কিছু একটা ক'রে ফেলেছ!'

'পাবলিক সেক্টর প্রজেক্টগুলির জন্যে পঁচিশজন ম্যানেজেরিয়েল পার্সোনেল নির্বাচন হ'ল। তার মধ্যে সাতজন মন্ত্রীদের আত্মীয় অথবা উমিদার।'

'বাকিরা?'

'আই-সি-এস, আই-এ-এস।'

'থ্রি চীয়র্স, ড্যাডি।'

'সাতজনের মধ্যে আমাদের মন্ত্রীর জামাতাও আছে।'

'তাই নাকি? তাহ'লে এইচ-এম-আই জিতলেন শেষ পর্যন্ত?'

'আমি আর শেষ পর্যন্ত বিরোধিতা করলাম না!'

'তার মানে তুমি এ মিনিস্ট্রি ছাড়তে চাইছ না।'

'কিছুটা তাই। কোথায় ঠেলে দেবে কে জানে? পরিচিত অসুর অপরিচিত অসুরের চেয়ে বাঞ্ছনীয়।'

'অন্তত জ্ঞানীরা তাই বলেন।'

'তা ছাড়া, দেখা গেল এইচ-এম-আই কমিটির অন্য মেম্বারদের হাত ক'রে রেখেছেন।'

'এবং তুমি যে-যুদ্ধে হার নিশ্চিত তা লড়তে চাইলে না।'

'লাভ ছিল না।'

'বরং ক্ষতি হ'তে পারত, কি বল?'

'তুই কি আমাকে বিদ্রূপ করছিস, গৌতম?'

'তুমি কি নিজের তারিফ করছ বাবা?'

'যা ঘটল তাই তোকে বলছি।'

'যদি বলতাম খুব ভালো হয়েছে, তুমি সুখী হ'তে, বাবা?'

'ভালো-মন্দের কথা নয়, গৌতম। যা হয়েছে তাই হবার ছিল। অন্য কিছু হ'তে পারত না।'

'মাঝে মাঝে তুমি আর আমি একমত হ'য়ে থাকি, বাবা।'

বনমালী হেসে বললেন, 'কাদচিৎ, কখনও।'

গৌতম বলল, 'ইউ আর এ' গুড ফাদার, ড্যাডি।'

'ভেবেছিলাম তোকে আলাদা হ'য়ে গড়ে ওঠবার সুযোগ দেব। তুই যদি সব বিষয়ে আমার মন আমার চোখ দিয়ে ভাবতিস আর দেখতিস, বেঁচে থাকার আনন্দ অনেক ক'মে যেতো।'

'কিন্তু, বাবা, আমাকে তুমি নিয়মের মধ্যেই জুতে দিয়েছ। মর্ডান স্কুল, সেন্ট স্টিফেন্স্ কলেজ! দিল্লির বুর্জোয়া পরিবারদের ছেলেদের জন্য অ্যাসফল্টেড রাজপথ।'

'বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে যা সবচেয়ে ভালো তা না পেয়ে সবচেয়ে খারাপটুকু কুড়োবার মধ্যে মৌলিকতা নেই। শতকরা নব্বুইটি ছেলে মেয়ে শিক্ষাব্যবস্থার খারাপগুলি কুড়োচ্ছে। এদের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

'এর পর, বাবা, একদিন কোনও এক বৃহৎ কোম্পানি তোমাকে এসে বলবে, আপনার ছেলের জন্যে কুরশি তৈরি, আড়াই হাজারে শুরু। আর তুমি বলবে, গৌতম. লেগে যা না, চাকরিটা দারুণ, পাঁচ বছরে তিন সাড়ে তিন হাজার মাইনে হবে।'

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বনমালী যখন বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, ভারী।

'বলতে পারি, গৌতম, আজ যা করে এলাম, তারপর অনায়াসে বলতে পারি। শুধু তাই নয়, তোকে চাপ দিতেও পারি। কিন্তু'—

'কিন্তু কি বাবা?'

'আশা রাখব, তুই সেদিন আমার দারুণ অবাধ্য হবি।'

মন্ত্রীর অজানা থাকে নি যে তাঁর জামতার নিয়োগে বনমালীশংকর ঝা সহায়তা করেন নি। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান মানুষ, তাই প্রকাশ্যে এ নিয়ে সেক্রেটারির প্রতি বিরূপতার চিহ্নমাত্র দেখান নি। অথচ এ ঘটনার পরে বনমালীশংকর ঝা দেখতে পেলেন মন্ত্রণালয়ের তিনজন জয়েন্ট সেক্রেটারিকেই মন্ত্রী কাছে টেনে নিয়েছেন, তাঁদের একজনও আর সেক্রেটারির সঙ্গে পুরো সহযোগিতা করেছেন না। মিটিং-এ মন্ত্রী এখন থেকে ক্রমাগত সেক্রেটারির মতামত উপেক্ষা করে জয়েন্ট সেক্রেটারিদের মতামত সমর্থন করতে লাগলেন ; নোটিং-এও দেখা গেল জয়েন্টদের সঙ্গে মতের অমিল হ'লে, যা এখন হামেশা হ'তে লাগল, মন্ত্রী সেক্রেটারির সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ অগ্রাহ্য করছেন। অর্থাৎ মন্ত্রী বাস্তবক্ষেত্রে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন বনমালীশংকর ঝা তাঁর কাছে আর প্রয়োজনীয় সহকর্মী নন। অথচ তিনি বনমালীকে মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দেবার কোনও চেষ্টাই করলেন না। বনমালীর পক্ষে অবস্থা দুঃসহ হ'লেও মনে মনে তিনি মন্ত্রীর চতুরতার তারিফ না ক'রে পারলেন না। অগত্যা একদিন তাঁকে নিজেই মন্ত্রীর মুখোমুখি অবস্থার সমাধান চাইতে হ'ল।

'আপনার সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত কথা ছিল, স্যর,' বনমালী প্রসঙ্গ উত্থাপনের ক্ষেত্র তৈরি করলেন।

'নিশ্চয়।'

'কয়েকমাস ধরে বুঝতে পারছি আপনার কাছে আমি আর বাঞ্ছনীয় সেক্রেটারি নই।'

'তাই নাকি? কি ক'রে বুঝলেন? আমি কি মন্দ ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে?'

'সোজাসুজি করেন নি। কিন্তু আপনি আমাকে প্রায় পঙ্গু ক'রে এনেছেন।'

'কই? আমি তো তা জানি নে। বরং সবাই বলে বি. এস. ঝা এক জবরদস্ত আই সি এস।'

'যদি মার্জনা করেন তো বলি, আমি আপনার ট্যাক্‌টিক্‌স্‌-এর তারিফ করছি। কিন্তু পঙ্গু হ'য়ে থাকা আমার অভ্যাস নয়। আপনি বরং আমাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিন।'

'সে অভিপ্রায় আমার নেই। যদি আপনি নিজে বদলির ব্যবস্থা করতে পারেন, অন্য কথা।'

'আপনি অন্য কাউকে চেয়ে হোম মিনিস্টরকে লিখলে ব্যাপারটা সহজ হয়।'

'আমি তো তার কোনও প্রয়োজন দেখছিনে। আপনাকে নিয়ে তো আমার বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না।'

এবার বনমালীশংকরের মেজাজ গরম হয়ে গেল।

'স্যর, আমি পুরানো জমানার লোক। সিভিল সার্ভেন্ট হিসাবে কতকগুলি নীতি মেনে চলা আমার অভ্যাস। কিন্তু প্রয়োজন হ'লে আমাকে আত্মরক্ষা করতে হবে।'

'নিশ্চয়। তাই তো বলছি, আপনি বদলি চেয়ে, আবেদন করুন। আমি সুপারিশ ক'রে দেব।'

'আমি তিন মাসের ছুটি চাইছি।'

'আমার আপত্তি নেই।'

'আশা করব আপনি নতুন সেক্রেটারি চাইবেন।'

'নাও চাইতে পারি। আসল কথা কি জানেন? আপনাদের মতো আই-সি-এস'দের দিয়ে আমার তেমন সুবিধে হয় না। আপনারা নতুন ভারতবর্ষ নির্মাণের পথে সহায়ক নন, অন্তরায়। আই-এ-এস'রা আপনাদের চেয়ে অনেক বাঞ্ছনীয়। আপনি গেলে আসবেন আর এক বি. এস. ঝা। তার চেয়ে বরং আপনিই থাকুন। মিনিস্ট্রির কাজকর্ম তো আটকাচ্ছে না? বরং বেশ ভালোই চলছে।'

কষায় মন নিয়ে বনমালী মন্ত্রীর কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। অরুণা ঘটনার বিবরণ শুনে বলেছিলেন, 'বাবাকে লিখে দিচ্ছি। তিনি পণ্ডিতজিকে বললে একটা ব্যবস্থা হবে।' অরুণার বাবা তখন আসামের গভর্নর। বনমালী বলেছিলেন, 'কক্ষণও নয়। আমার লড়াই আমিই লড়তে পারব।'

গৌতম বলেছিল, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে টাটা-বিড়লা-সাহু জৈনদের সঙ্গে ভিড়ে যাও, বাবা। মাইনে ডবল পাবে, মনের ও মতের মিলও হবে।'

বনমালী বলেছিলেন, 'ওখানেও আমার চাকরি থাকবে না। কবে দেখব তুমি মজদুরদের ক্ষেপিয়ে ট্রেড য়ুনিয়নি করছ, আর লড়াই লেগে যাবে তোমাকে আমাতে। এই একটা লড়াই আমি লড়তে পারব না, তোমাকে ব'লে রাখছি।'

'তুমি ভুল করলে, বাবা,' গৌতম বলেছিল। 'ট্রেড য়ুনিয়ন আমি করব না। যদি তোমাদের বিরুদ্ধে কোনওদিন লড়ি, কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে লড়ব। শহরবাসী কারখানার শ্রমিকদের দিয়ে কৃষিপ্রধান দেশে বিপ্লব হয় না। তুমি জবরদস্ত জমিদার হলে তোমাকে আমাতে লড়াইয়ের সম্ভাবনা হ'তেও পারত। তুমি টাটা স্টিলের জেনারেল ম্যানেজার হ'লে সে সম্ভাবনা থাকবে না।'

ঘটনাচক্রে এ সময়ে হঠাৎ এমন একটি মোড় নিল যার জন্যে বনমালীশংকর ঝা একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যতম ডেপুটি সেক্রেটারি, কে. পি. মুরারি বনমালীর খানিকটা বিশ্বস্ত ছিল। লোকটি অন্ধ্রপ্রদেশের, বত্রিশ বছর আগে অ্যাসিস্ট্যান্ট্ হ'য়ে কেন্দ্রীয় সরকারে ঢুকেছিল, বর্তমানে সি-এস-এস'এর অন্তর্ভুক্ত ডেপুটি সেক্রেটারি। মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পার্লামেন্টের যা সব কাজ মুরারি তার তত্ত্বাবধান করে।

বনমালী একদিন লাঞ্চ থেকে দপ্তরে পৌঁছতেই প্রাইভেট সেক্রেটারি বলল ডি. এস.-ফোর, অর্থাৎ মুরারি জরুরি কাজে দর্শনপ্রার্থী। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মুরারি এসে বসল বনমালীর মুখোমুখি চেয়ারে। লোকটির মাথাজোড়া টাক, চোখ দুটো এত বড়, কপাল এত ছোট যে হঠাৎ মনে হয় মুখের ওপরে চোখের প্রচণ্ড দাপট। বড় মোটা নাকের নিচে পুরু কর্কশ ঠোঁট। বনমালী তাকিয়ে দেখলেন মুরারির চোখে দারুণ উত্তেজনা, এবং তাতে সারা মুখে একটা প্রচণ্ড উত্তাপ।

'কিছু জরুরি কাজ আছে?' প্রশ্ন করলেন বনমালী।

মুরারী কিছু না বলে ফাইল থেকে একখণ্ড কাগজ বনমালীর সামনে রাখল।

বনমালী পড়লেন। লোকসভা দপ্তর থেকে আনা কাগজটি জনৈক এম. পি. কর্তৃক শিল্প-মন্ত্রীকে একটি প্রশ্নের প্রতিলিপি। স্পিকার প্রশ্নটি অনুমোদন ক'রে তারকাচিহ্ন দিয়েছেন, মন্ত্রীকে তার উত্তর দিতেই হবে। মন্ত্রণালয়ে প্রশ্নটি এসেছে মন্ত্রীর উত্তরের জন্যে।

বনমালী পড়লেন প্রশ্নটি : শিল্প-দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী কি অনুগ্রহ ক'রে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দেবেন : (ক) পাবলিক সেক্টর প্রজেক্টগুলির জন্যে উচ্চতর ম্যানেজারিয়েল পদে গত তিন মাসে ক'জন লোককে নিয়োগ করা হয়েছে? (খ) এ নিয়োগের নিয়মাবলী কে বা কারা তৈরি করেছিলেন? (গ) নিয়োগের পূর্বে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে পদপ্রার্থীদের আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না? (ঘ) না হ'য়ে থাকলে তার হেতু কি? (ঙ) নিয়োগের জন্যে পদপার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব য়ুনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দেওয়া হয়েছিল কি না? (চ) না হ'য়ে থাকলে তার কারণ কি, এবং নির্বাচন কি ভাবে করা হ'য়েছিল। (ছ) নিযুক্ত

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারদের মধ্যে একজন শিল্প-মন্ত্রীর জামাতা কি না? (জ) এই লোকটির উক্ত পদ পাবার জন্যে কি কি যোগ্যতা ছিল; এবং (ঝ) উক্ত লোকটির চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিকে ঐ পদ থেকে বঞ্চিত করা হ'য়ে ছিল কি না।'

প্রশ্ন যিনি করেছেন তাঁর নাম শ্রীমতী বেদ মেহ্‌তা।

কাগজখানা পড়ে বনমালীশংকর ঝা স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন। বার বার তিনবার পড়া হ'য়ে গেলেও তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

অথচ তিনি বুঝতে পারলেন মুরারি কি ভেবে বসে আছে। মুরারি ভেবেছে বনমালী নিজেই কোনও এম. পি -কে দিয়ে এ প্রশ্ন করিয়েছেন। মুরারি যা ভাবছে, মন্ত্রণালয়ের, গোটা সেক্রেটারিয়েটের, সবাই তাই ভাববে। মন্ত্রী তো ভাববেনই।

তাঁকে নীরব দেখে মুরারি গলা নামিয়ে বলল, 'এটা আজই ডাকে এসেছে, স্যর। বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে।'

বনমালীর ইচ্ছে হ'ল মুরারিকে বলবার যে তিনি এ প্রশ্নের কিছুই জানতেন না, কিন্তু বলে লাভ নেই, তাই চেপে গেলেন।

বললেন, 'তুমি নিজেই একটা উত্তর তৈরি কর। কবে পাঠাতে হবে উত্তরটা?'

'কালকের মধ্যে।'

'ফাইলগুলি সংগ্রহ ক'রে জবাবের একটা খসড়া কর। ক'রে নিয়ে এসো।'

মুরারি উঠবার সঙ্গে সঙ্গে, বনমালী আবার বললেন, 'না তুমি ওটা আমার কাছে রেখে যাও। মন্ত্রীকে আমি বলব। ফাইলগুলি সব যোগাড় কর। আমি তোমাকে ডাকব।'

বনমালীর মনে পড়ল মাস চারেক আগে যুক্তপ্রদেশে এক উপনির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে বেদ মেহ্‌তা পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন। দু একবার তিনি ভেবেছেন অভিনন্দন জানিয়ে একখানা পত্র লিখবেন, কিংবা টেলিফোন করবেন। করেন নি। অনেকটা আলস্যে, কিছুটা এম. পি.-দের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ সিভিল সার্ভেন্টের পক্ষে উচিত কি না তা নিয়ে সন্দেহ। কিন্তু বেদ মেহ্‌তা এ প্রশ্ন ক'রে বসলেন কেন? কে তাঁকে সব খবর জোটাল?

এসব ভাবতে ভাবতে বনমালী মন্ত্রীর সম্মুখীন হলেন।

'লোকসভায় আমাদের মিনিস্ট্রিকে কয়েকটা প্রশ্ন করা হয়েছে, একটু আগে প্রশ্নগুলি এসেছে, আজকেই উত্তর পাঠাতে হবে,' বনমালী বললেন মন্ত্রীকে।

'কি সম্বন্ধে?'

'ব্যাপারটা বড় ডেলিকেট।' প্রশ্নের কাগজটি বনমালী মন্ত্রীর হাতে দিলেন।

পড়তে পড়তে মন্ত্রীর গমবর্ণের ভরপুর মুখখানা তামাটে হ'য়ে উঠল। বনমালীর

মত মন্ত্রীও দু'তিনবার প্রশ্নগুলি পড়লেন, তারপর বনমালীর চোখে চোখ রাখলেন।

'আপনি বিশ্বাস না করলেও বলতে হচ্ছে, এ প্রশ্নের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই।'

'বেদ মেহ্তাকে আপনি চেনেন? আপনারা দুজনেই তো যুক্তপ্রদেশের লোক!'

'এলাহাবাদ য়ুনিভারসিটিতে এক সময় উনি আমার সতীর্থ ছিলেন। তারপর আর কোনও যোগাযোগ হয় নি।'

'আপনি বলতে চান, বেদ মেহ্তার এই প্রশ্নে আপনার কোনও হাত নেই।'

'তাই বলতে চাই। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যাই হোক না কেন, পার্লামেন্টে প্রশ্ন তুলে আপনাকে বিব্রত করা আমার সিভিল সার্ভিস নীতির বাইরে, এ কাজ আমার দ্বারা কক্ষনও হ'তে পারে না। পার্লামেন্ট মন্ত্রীদের জন্য, সিভিল সার্ভেন্টদের জন্যে নয়।'

'উনি এতসব খবর পেলেন কি ক'রে?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না।'

'এই তো সেদিন এম পি. হ'ল বেদ মেহ্তা! আপনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি নি?'

'না।'

'মহিলা কংগ্রেসে থেকে চিরদিন হাই কমান্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে এসেছেন। এ সব ঘরের শত্রু বিভীষণকে পণ্ডিতজি কেন প্রশ্রয় দেন বুঝতে পারি নে।'

বনমালী নীরব রইলেন।

'এ সব প্রশ্নের কি জবাব দেওয়া যেতে পারে?'

'জবাব ঠিকমত তৈরি করা যাবে। সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্নের জন্যে ব্রিফও তৈরি হবে। মুশকিল হল একটা প্রশ্ন নিয়ে।

মন্ত্রী উচ্চস্বরে বললেন, 'আমার জামাই হওয়াটা কারুর পক্ষে অপরাধ নয়!'

'বনমালী চুপ রইলেন।

'জবাবের খসড়াটা নিয়ে পাঁচটার সময় আসুন।' বনমালী উঠতে উঠতে মন্ত্রী বললেন, 'বেদ মেহ্তার মতো চুনোপুঁটিকে আমি ভয় পাই নে। ভয় পাই তাদের যারা ঘরের খবর বার ক'রে দিতে দ্বিধা করে না।'

পরদিন সকালে বনমালী ফিরোজ শা' রোডের বেদ মেহ্তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। তখনও আটটা বাজে নি, প্রথম মার্চের সকালে শীতের আমেজ লেগে রয়েছে। বনমালীর গাড়ি পনের নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড়াল, তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেল টিপলেন।

দরজা খুলে যিনি মুখোমুখি দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে বনমালীর বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

তিনি অপরিচয়ের কুয়াশা কাটিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠলেন: 'বনমালীশংকর ঝা, আই-সি-এস!!'

'চিনতে পেরেছ দেখছি!'

'চিনতে পারব না কেন? বুড়ী হ'লেও চোখের দৃষ্টি এখনও প্রখর, স্মৃতি এখনও সজাগ। এসো, ভেতরে এসো। এতদিন দিল্লি ব'সে আছি কেউ-কেটা এম. পি. হ'য়ে, তোমার টিকিটির সন্ধান নেই। আমি ভেবেছি দু'একবার তোমার খোঁজ নেব, কিন্তু সাহস হয় নি।'

বেদ মেহ্তার সরব হাসিতে বনমালী যোগ গিতে পারলেন না। বেদ মেহ্তার সঙ্গে ভেতরে গিয়ে দুজনে বৈঠকখানায় বসলেন।

'চা খাবে তো?'

বনমালীকে নীরব দেখে বেদ মেহ্তা চাকরকে ডেকে চা আনতে বললেন।

'তার্পর? তুমি তো বিশেষ বুড়ো হও নি! আরে চেয়ে দেখ আমার দিকে।'

'এতক্ষণ তা ছাড়া আব কি করছি?'

'দেখছ তো? মোটা হ'য়ে গেছি, অর্ধেক চুল সাদা। উঠতে বসতে কোমরে ব্যথা।' হেসে উঠলেন বেদ মেহ্তা আবার। 'তুমি তো খাসা আছ। দিব্যি ছিম্ছাম্, কে বলবে তোমার বয়স হয়েছে?'

'চব্বিশ বছর পর তোমাকে দেখেছি।'

'তা হবে! তুমি যে সেই আই-সি-এস হবাব জন্যে বিলেত চলে গেলে তারপর তো আর দেখা হয় নি।'

'১৯৪২ সালে বালিয়ায় হ'তে পারত।'

'হ'লে মন্দ হ'ত না। তা বলো, তোমার সব খবর শুনি। বড় বড় খবরগুলি আমার জানা আছে। তুমি তো ইউ. সি. চর্তুবেদীর মেয়ে অরুণাকে বিয়ে করেছিলে? খুব ভালো মেয়ে শুনেছি, মাঝে মাঝে তুমি বুদ্ধিমানের মতো কাজ ক'রে থাক, ছাত্রকালেও দেখেছি। ছেলেপিলে? ও, তাই নাকি, হাউ নাইস, একটি ছেলে, একটি মেয়ে? ছেলেব নাম কি? গৌতম? গৌতমশংকর ঝা? শংকর নয়? শংকর ছাঁটাই হ'য়েছে গৌতমের সঙ্গে? রমী! বেশ সুন্দর নাম তো! গৌতম কলেজে পড়ছে? কি করবে তাকে? ডাক্তার না এঞ্জিনীয়ার না বৈজ্ঞানিক না আই-এ-এস? তাই নাকি? একটাও না? মানে, তুমি কিছুই করবে না তাকে, সে যা হ'তে চায় তাই হবে? কবে থেকে এমন উদারচিত্ত হ'লে তুমি? কি বলছ? গৌতম কম্যুনিস্ট হ'তে চলেছে?

তোমার ছেলে কম্যুনিস্ট? ভাবতেও পারছি না যে! তা থেকে, ভয়ের কিছু নেই, আমাদের কম্যুনিস্টরা তো চমৎকার ভদ্রলোক! মোটেই বিপজ্জনক নয়। ওদের নিয়ে একদিন এসো, নয়তো আমাকে নেমন্তন্ন করলে আমিই গিয়ে আলাপ করব...'

বনমালীর বিস্মিত অবলোকন তখনও শেষ হয়নি। এতগুলি বছর কেটে গেছে, জীবনে ঘটনা কম ঘটে নি, স্ত্রী পুত্র, কন্যা, দেশের স্বাধীনতা, আরও কত ঘটনা, অথচ আজ বেদ মেহ্তাকে দেখবার আগে বনমালী বুঝতে পারেন নি বিগত কালের প্রবাহ কতখানি নিয়ে যায় জীবন থেকে। বেদ মেহ্তার আধ-পাকা মাথা আর মেদবহুল দেহ আর কুঞ্চিত গাল না দেখলে বনমালী বুঝতেই পারতেন না তাঁর জীবনেরও অনেকখানি চলে গেছে, যা আর আসবে না, যদিও মনে হয় নি বড় কিছু তিনি হারিয়েছেন। সময় মানুষের দেহ নিয়ে কি জুলুমটাই না করে! মনে পড়ছিল এলাহাবাদে বেদ মেহ্তার চেহারা, তার সঙ্গে আজকের বেদ মেহ্তার মিল কোথায়? দুজন কি একই জীবনের পরিণতি? বেদ মেহ্তার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে একসময় বনমালী নিজেকে বলতে শুনলেন, 'আমার সব খবর তো জানলে। এবার তোমার কথা বলো!'

'আমার কথা? বলবার মতো কি আর আছে বলো? সাতচল্লিশের আগে পর্যন্ত মন্দ কাটে নি। স্বরাজ আসবার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু যেন থিতিয়ে গেল। চেহারা দেখেই তো বুঝতে পারছ।'

'তুমি তো কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও বিরোধী ছিলে!'

'ছিলাম তো! কিন্তু স্বরাজ পাবার পর তা আর সম্ভব হ'ল কোথায়? কংগ্রেস এমন এক ব্যাপার যার সঙ্গে পা ফেলে চলা মুশকিল, আবার তার বিরুদ্ধতা করাও মুশকিল। দেখছ না সাংবাদিকরা বলে থাকে নেহেরু একধারে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেতা! এমন লোকের সঙ্গে মিত্রতাও করা যায় না, শত্রুতাও না।'

'তুমি তো এখন কংগ্রেসি এম. পি.! তার মানে, পণ্ডিতজির নিজের লোক!'

'মোটেই নয়। পণ্ডিতজির রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তোমরা অনেক সময় ধরতে পার না। উত্তরপ্রদেশের আগাগোড়া রাজনীতি দুটি ব্যক্তির আয়ত্তাধীন। চন্দ্রভানু গুপ্ত আর কমলাপতি ত্রিপাঠী। দুজনের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। রাজধানী লক্ষ্ণৌ থেকে সুদূর গ্রামগুলি পর্যন্ত ক্ষমতার যা কিছু যন্ত্রপাতি, সব এ দুজনের মধ্যে ভাগ করা। রাজ্য সরকার থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত। আমার মত কয়েকজন এ বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বছর সাতেক লড়েছিল। এখন আমরা খানিকটা স্থান ক'রে নিয়েছি নিজেদের জন্যে উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসি রাজনীতিতে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তাড়াবার জন্যে গুপ্তত্রিপাঠীরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় পণ্ডিতজি হঠাৎ

বার্তা পাঠালেন তিনি আমাকে লোকসভায় চান। বুঝলাম, য়ু. পি. থেকে সরে যাবার আদেশ! এম. পি. হবার একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার। কিন্তু ঐ যে বললাম, পণ্ডিতজিকে অমান্য করবার উপায় নেই।'

'করলে কি হ'ত?'

'রাজনৈতিক মৃত্যু, অথবা তার চেয়েও ভয়াবহ, জরা।'

'কংগ্রেস ছাড়াও তো দল আছে।

'আছে বুঝি?'

'হেসে উঠলেন বেদ মেহ্‌তা। বনমালী বললেন, 'তুমি এখনও সুন্দর হাসতে পার।'

'ছোটবেলার এটুকুই কেবল বেঁচে আছে।'

'ল' প্র্যাক্‌টিস করলে না কেন?'

'সুবিধে হ'ত না। স্ত্রীলোক অ্যাডভোকেটদের কাছে বড় মামলা আসত না কখনও। তা ছাড়া, বাবা অনেক টাকা রেখে গেছেন। ভাইবোনরা প্রত্যেকে আমরা কম পাই নি। আমার রুটির অভাব হবে না যতদিন বেঁচে থাকব।'

'বিয়ে করলে না কেন?'

'বিয়ে তো এদেশে আমরা কেউ করি না। আমাকে কেউ বিয়ে দিলে না, তাই বিয়ে হ'ল না।'

'তোমার বাবা মা?'

'দুজনেই গত হয়েছেন।'

'প্রশ্ন করছিলাম, বাবা মা বিয়ে দিলেন না কেন?'

'ধরতে পারলেন কোথায়? যে বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় তখন আমি কোথায়? তাঁদের নাগালের একেবারে বাইরে।'

'সারাজীবন তুমি কারুর লাগালে এলে না।'

'সত্যি বলতে, তার জন্যে আপসোস নেই একটুও।'

আর কিছু কথাবার্তার পর বনমালী বললেন, 'তুমি জান আমি কোন মিনিস্ট্রিতে কাজ করি?'

'জানি। তুমি তো মিনিস্ট্রি অব ইনডাস্‌ট্রির সেক্রেটারি।'

'আমাদের মন্ত্রীকে লোকসভায় তুমি ক'টা প্রশ্ন করেছ?'

'হ্যাঁ। কাল তার জবাব পাবার কথা।'

'একটা প্রশ্ন তোমাকে করতে হচ্ছে। আপত্তি থাকলে জবাব দিও না।'

'শুনি তো প্রশ্নটা!'

'মন্ত্রীকে প্রশ্ন ক'রে তুমি কি আমার কোনও উপকার করতে চেয়েছ?'

'না তো! তুমি তো মন্ত্রীর পক্ষে লোক! মন্ত্রীরা অনাচার করে তোমাদের পুরো সাহায্য নিয়ে।'

'সব সময় নয়।'

'বনমালী, তোমাকে পরিষ্কার বলছি, তোমাদের মিনিস্ট্রিতে ভীষণ অনাচার চলছে। প্রশ্ন করবার সময় তোমার কথা আমার মনেও হয় নি। যদি প্রশ্নের দরুন তোমার ক্ষতি হয়ে থাকে, আমি দুঃখিত। অবশ্যি, তোমার ক্ষতি হবে বলে প্রশ্ন করব না এমন প্রত্যাশা তুমি করবে না জানি, আমিও সে-কারণে পিছপা হব না। কিন্তু কেন তুমি এসব জানতে চাইছ?'

'পরে বলব, আজ নয়। তোমার কথায় আশ্বস্ত হলাম।'

'তুমি কি এ জিজ্ঞাস্য নিয়েই এসেছিলে?'

'প্রধানত। কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা আজ তোমাকে বলতে পারছি না। আর একদিন বলব।'

'শুনে সুখী হলাম তুমি আবার আসবে।'

'আসব বৈ কি? আমাদের বন্ধুত্ব কি মরে গেছে?'

'বেঁচে আছে বলে তো খবর পাই নি।'

'আমি কিছু পাচ্ছি মনে হচ্ছে।'

'বেশ তো! একদিন আই-সি-এস হ'য়ে তুমি আমার শত্রু বনে ছিলে। আজ অন্য জমানা। তোমাদের আমি মিত্র মনে করি নে, তোমার মত আমলাদের। আমার ধারণা, স্বাধীনতার ভুজঙ্গকে শান্ত ক'রে সংকীর্ণ বিত্তবান কয়েকটি গোষ্ঠীর কায়েমি স্বার্থ গ'ড়ে তোলবার কাজে তোমরা আমাদের নেতাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য ক'রে আসছ।'

'তুমিও তো এরই মধ্যে, বেদ,' হাসতে হাসতে বনমালী বললেন।

'নিশ্চয়। তাই তো বলছিলাম তুমি আর আমি আজ আর শত্রু নই। কিন্তু তোমাকে মিত্র ব'লে মানতে আমার এখনও বাধে। যে বেদ মেহ্‌তাকে একদা তুমি জানতে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেছে, কিন্তু এখনও একেবারে ম'রে যায় নি।'

এর পরে শিল্প-মন্ত্রী মন্ত্রণালয় থেকে বনমালীশংকর ঝা'র বদলির জন্যে হোম মিনিস্টারকে নিজেই অনুরোধ করেছিলেন। লিখিত ভাবে সরকারি অনুরোধ নয়, ব্যক্তিগত ভাবে সনির্বন্ধ আবেদন। সেক্রেটারিয়েট মহলে অনেকেরই বিশ্বাস হয়েছিল বনমালীশংকর ঝা বেদ মেহ্‌তাকে দিয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্ন তুলে শিল্পমন্ত্রীকে

নাস্তানাবুদ করেছিলেন। বেদ মেহ্‌তা এবং বি এস. ঝাকে নিয়ে মুখরোচক বেশ কিছু রূপকথাও তৈরি হয়েছিল। যে ক'জন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি বনমালীকে লোকসভার প্রশ্নগুলির সঙ্গে জড়িত করতে রাজি হন নি তার মধ্যে ছিলেন অনেক বছরের বন্ধু হোম সেক্রেটারি যশোবন্তরাও খাণ্ডেলকর। বনমালী খাণ্ডেলকরের সঙ্গে এ নিয়ে টেলিফোনেও কথা বলেন নি, তথাপি হোম মিনিস্টর খাণ্ডেলকরকে ইন্ডাসট্রি মিনিস্টরের অনুরোধের কথা বলতে, খাণ্ডেলকর বলেছিলেন, 'বি. এস. ঝাকে আমি বহুদিন জানি, অতি গোঁয়ার লোক, একেবারে ইংরেজের মার্কা মারা আই-সি-এস, তার দ্বারা অনেক বোকামি সম্ভব, কিন্তু মন্ত্রীকে জব্দ করতে এম. পি.'র শরণাপন্ন হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। বি. এস. ঝা বরং বরখাস্ত হবে, কিন্তু সিভিল সার্ভিস কোডের বাইরে এক পা তুলবে না।'

বনমালীশংকর ঝা'র টেবিলে লাল রং টেলিফোন এক অপরাহ্ণে বেজে উঠল।

'ঝা।'

'আমি খাণ্ডেলকর।'

'আরে যশোবন্ত! কি খবর তোমার? অনেকদিন দেখা নেই।'

'তুমি সংকটে পড়েও মধুসূদন স্মরণ করবে না তো আমি কি করব?'

'হিন্দুব ছেলে, প্রাণপণ করলেও নাস্তিক হওয়া অসম্ভব। মধুসূদন স্মরণে আপত্তি নেই, কিন্তু বিপদে প'ড়ে যশোবন্ত রাও খাণ্ডেলকরের কাছে যেতে আপত্তি আছে।'

'তোমার অহংকার আমার খুব জানা আছে। শোন, তোমাকে ইনডাস্ট্রি ছাড়তে হচ্ছে।'

'আজই ছাড়তে রাজি আছি।'

'ছেড়ে যাবে কোথায়?'

'কেন? লোকসভার ঘটনার পর কোন মন্ত্রীই বুঝি বি. এস. ঝাকে সেক্রেটারি করতে রাজি নন! সব চাকুরে জামাতা, পুত্র, ভাগ্নে, ভাইপোদের নাম পার্লামেন্টে এসে পড়বে?'

'একটু-আধটু আপত্তি জমে উঠেছে বৈ কি?'

'দারুণ কমিয়ে বলছ।'

'এইচ-এস আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, বি. এস. ঝা অনেক বোকামি করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু সিভিল সার্ভিস কোডে অনুমোদিত নয়, এমন কাজ সে কখনও করবে না।'

'ধন্যবাদ, যশোবন্ত, অনেক ধন্যবাদ', বনমালীর স্বর ভারী হ'য়ে এল।

'একটা কিছু দাঁড় করান গেছে!'

'বল।'

'পে কমিশনের মেম্বর সেক্রেটারি।'

'সত্যি? ধন্যবাদ, যশোবন্ত। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।'

'তোমার ফিনান্স ব্যাকগ্রাউন্ডটা কাজে লেগে গেল।'

'কবে খালাস পাচ্ছি?'

'পে কমিশন তো আসচে সপ্তাহেই ঘোষিত হচ্ছে। মাস খানেকের মধ্যে তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে।'

'আজ সন্ধ্যায় কি করছ? ক্লাবে এসো না! আমার সঙ্গে একটু ড্রিঙ্ক করবে।'

'বেশ তো! সাতটায়। তার আগে বেরুতে পারব না।'

'সাতটা। বেশ।'

'শোনো, বনমালী, দরকার হ'লে বন্ধুদের এক আধটু স্মরণ কোরো। তাতে তোমার মানহানি হবে না।'

'বুড়ো হ'য়ে গেছি, যশোবন্ত, এখন আর স্বভাব বদলান সম্ভব নয়।'

দু বছর পে কমিশনে কেটে গেল বনমালীশংকর ঝার। ইতিমধ্যে বেদ মেহ্‌তার সঙ্গে ঝা পরিবারের আলাপ পরিচয় খানিকটা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'ল। গৌতম বি. এ. পাস করল অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে, প্রথম শ্রেণীতে, ভর্তি হ'ল এম. এ. পড়বার জন্য দিল্লি স্কুল অব ইকনমিকস্-এ। রমী স্কুল শেষ ক'রে মিরান্দা হাউসে ভর্তি হ'ল দর্শন অনার্স নিয়ে। অরুণার ব্লাড প্রেসার দেখা দিল, তার সঙ্গে নার্ভাস টেনশন। বনমালীশংকর ঝা হঠাৎ কেমন যেন বুড়ো হ'তে চললেন, গতিতে ক্ষিপ্রতা কমে এল, সকালে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে রাত্রির ক্লান্তি দূর হ'তে চাইল না। চীন এবং ভারতের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে যুদ্ধ বাধল। নেহেরু নেতৃত্বের বিলম্বিত সায়াহ্নে ভারতবর্ষ মন্দগতিতে কাটাতে লাগল দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

পে কমিশনের রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব বনমালীকেই নিতে হ'ল। প্রথম খসড়া জয়েন্ট সেক্রেটারিরা লিখতেন ডেপুটি সেক্রেটারিদের সাহায্য নিয়ে। শেষ খসড়া তৈরি করতে হ'ত বনমালীকেই। তা ছাড়া, রিপোর্টের মুখবন্ধ এবং প্রথম অধ্যায়, যাতে কমিশন তার সিদ্ধান্তগুলির ব্যাখ্যা করেছেন, সবটাই বনমালী নিজে লিখলেন। কমিশনের চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শংকরন গোবিন্দন নায়ারের সঙ্গে বনমালীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং ভাবমিনিময়ের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় এ কাজটা তাঁর ভালোই লাগল। তবু সারাদিনের কাজ সেরে উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় গৃহে ফিরে বনমালীর দেহমন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ত। হুইস্কি পান ক'রেও সে ক্লান্তি দূর হ'ত না। সকালবেলা তার অবশিষ্টাংশ নিয়েই শয্যা ছাড়তে হত।

একদিন বাড়িতে অফিস-ঘরে বসে বনমালী হুইস্কি পান করছেন আর শূন্য দৃষ্টিতে আলমারিতে আবদ্ধ আইনের বইগুলোর দিকে তাকাচ্ছেন, এমন সময় গৌতম এল।

'তোমার কাছে একটু বসতে পারি, বাবা?'

'নিশ্চয়। এ চেয়ারটায় বসো।'

'তোমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তাই না?'

'কই? ভালোই তো আছি।'

'তোমাকে বেশ ক্লান্ত দেখায়। মা বলছিল রাত্রে তোমার ভালো ঘুম হয় না।'

'বয়স বাড়ার সঙ্গে ঘুম কমে যায়।'

'আমি ভাবছিলাম, তুমি একটা মেডিকেল চেক-আপ করালে ভালো হ'ত।'

'প্রয়োজন নেই। ভালোই তো আছি মনে হচ্ছে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে গৌতম বলল, 'তুমি আমার কথা ভেবে মন-খারাপ করছ না তো বাবা?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বনমালী জবাব দিলেন, 'তোর কি তাই মনে হচ্ছে?'

'খোলাখুলি বলছি, বাবা, আমি জানি আমার জন্যে তোমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

মৃদু স্বরে বনমালী স্বীকার করলেন, 'তা হচ্ছে।'

'কিন্তু কেন? আমাকে নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে কেন?'

'ঠিক তোকে নিয়ে নয়, গৌতম। দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমাকে নিয়ে। তুই আর আমি যেখানে বন্ধুত্বে আবদ্ধ, সেখানকার আমাকে নিয়ে।'

'তোমার কথাগুলির অর্থ খুব প্রাঞ্জল নয়, বাবা।'

'অনেক ভাবনা, অনুভূতি আছে যার ভাষা নেই। সাধারণ মানুষের কাছে নেই। কবিদের আছে, ঔপন্যাসিকদের আছে। সবচেয়ে বেশি ভাষা যার আছে তার ভাবনা, অনুভূতি নিতান্ত কম।'

'যেমন ভারত সরকার!'

'যেমন যে কোনও সরকার।'

গৌতম বলল, 'কি তোমার দুশ্চিন্তা বলো?'

বনমালী সামান্যই পান করেছিলেন। হুইস্কির বোতল এবং গেলাস সরিয়ে রেখে, আস্তে আস্তে বললেন, 'বলছি, অন্তত চেষ্টা করছি। তুই জীবনে এমন স্থানে এসে পৌঁচেছিস যেমন দু এক বছরের মধ্যে তোকে জীবন যাত্রার একটা পথ বাছতে হবে। এতদিনে এ কথাটা আমার মনে হয় নি। আমি এতদিন, বহুদিন, নিজেকে, এবং তোকে, বলে এসেছি, গৌতম, আমার ছেলে গৌতম, হবে না, হবে না আর সবার

ছেলের মত নিশ্চিন্ত পথের যাত্রী, নিশ্চিন্ত-লক্ষ্য। সে অন্য কিছু হবে, যা হ'য়ে বেঁচে থাকার আনন্দ ও উত্তেজনা তার ফুরিয়ে যাবে না, সে তাই হবে। এটা-যে-কি তা ভাববার প্রয়োজন হয় নি। এখন হচ্ছে। এখন দেখতে পাচ্ছি জীবনের অনেকগুলি পথ তোর সামনে বন্ধ। তুই ডাক্তার হবি নে, ইনজিনীয়র না, বৈজ্ঞানিক না। অথচ এবার তোকে একটা কিছু হ'তে হবে। কিছু না হ'য়ে বেঁচে থাকা ভারতবর্ষে সম্ভব নয়।'

'তা জানি, বাবা। এখানে, হাজার হাজার বছর ধরে, মানুষ কিছু না কিছু হয়েই জন্মায়। যেমন ধরো, চাষী, মজদুর কেরানি এরা জন্ম থেকে চাষী, মজদুর, কেরানি। আবার আমরা, যাদের বাবাদের অনেক আছে, জন্ম থেকেই হয় ডাক্তার, ইনজিনীয়র, নয় আই-এ-এস অথবা কভেনেন্টেড অফিসর।'

'আমি যখনই ভাবছি তুই কিছু একটা হবি, তখনই বুকে কেমন একটা ব্যথা লাগছে। তোকে আই-এ-এস বা কভেনেন্টেড অফিসর ভূমিকায় দেখতে হবে এ সম্ভাবনা আমার অসহ্য মনে হচ্ছে। অথবা দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স্ এ লেকচারার রূপে। অথচ এসবেরই একটা কিছু তোকে হ'তে হবে।'

'দুচার বছর না হ'লেও চলবে, বাবা। এম. এ. টা যদি ভালো হয়, ইচ্ছে আছে কেম্ব্রিজে গিয়ে পড়বার।'

'তারপর? ফিরে এসে দিল্লিতে অধ্যাপনা?'

'সে তো অনেক দিনের কথা! সে ভাবনা এখন কেন?'

'মানে, তখন আমি আরও বুড়ো হবো। রিটায়ার করবার বয়স এসে যাবে। আর তখন আমাকে দেখতে হবে তুই দিল্লির কোনও এক কলেজে অমনোযোগী একপাল ছাত্রদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইকনমিক্স্ পড়াচ্ছিস!'

'নাও করতে পারি।'

'অথবা আরও কয়েক হাজার ভারতীয় যুবকদের মত ইংলন্ডে কিংবা আমেরিকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হ'য়ে কেবল অর্থ আর বিদ্যাচর্চার অনুসরণে কাটিয়ে দিবি বছরের পর বছর!'

'নাও দিতে পারি, বাবা!'

হঠাৎ উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন বনমালী : কিছু একটা হ'তে হবে তো! তোকে যে ভূমিকায়ই দেখি, মনে হয় চারদিকে তোর দেয়াল, তোকে দেয়ালগুলো আটকে রেখেছে, চেপে রাখছে। আসলে ওটা কিন্তু তুই নোস, গৌতম, ওটা আমি। আজ এই বুড়ো বয়সে মনে হচ্ছে আমি দেওয়ালের আড়ালে চাপা প'ড়ে গেছি, যা হব ভেবেছিলাম, তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারি নি।'

'সব উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এ সংকটের সম্মুখীন হয়, বাবা।'

'উচ্চকাঙ্ক্ষা! হ্যাঁ, বহুদিন তাই ছিল বটে আমার। ছোটবেলা নেপোলিয়ন হ'তে চেয়েছিলাম, নয়তো জর্জ ওয়াশিংটন। অন্তত বিরাট এক ক্ষমতাশীল জমিদার। তারপর একদিন মনে হ'ল বেঁচে থাকার একমাত্র গ্রহণীয় পথ আই-সি-এস। মেঘে মেঘে বেলা অনেক হ'ল। সাম্রাজ্য নষ্ট হ'ল, জন্ম হ'ল স্বাধীন রাষ্ট্রের। নতুন দেশ, নতুন সমাজ গড়বার উদ্যোগ শুরু হ'ল। আমাদের কিন্তু লাভ বৈ ক্ষতি হ'ল না। ইংরেজ আমাদের যা দিয়েছিল, নতুন রাষ্ট্রে তার চেয়ে অনেক বেশি আমরা পেলাম। অনেক ক্ষমতা, বহু মানুষের বিগলিত স্তাবকতা, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার অপরিমেয় সুযোগ। কিন্তু পেলাম না শুধু একটা জিনিস। যার নাম আমি দিয়েছি জীবনের শুভ্রতা। অনেক পাবার জন্যে মাশুল দিতে হ'ল অনেক। যা আমার হিসেবের মধ্যে ধরতে রাজি নই। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই বড় ছোট হ'য়ে গেলাম, গৌতম, অথবা নিজের কাছেও তা স্বীকার করতে চাইলাম না।'

দুহাতে মুখ ঢেকে, বনমালী বললেন, 'তুই—তোরা—তোরা কি অন্য কিছু হ'তে পারবি? আমরা যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলাম তার বাইরে তোরা যাবি কোথায়? আমার কি মনে হয় জানিস? আমদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে, আমাদের তৈরি পথে চলে, তোরা আমাদের চেয়েও ছোট হ'য়ে যাবি।

'তোর সম্বন্ধে এসব যখন ভাবি, নিজেকে বড় দুর্বল লাগে, বড় ক্লান্ত লাগে।'

পরবর্তী দুবছরে বনমালীর জীবনে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। পে কমিশনের কাজ শেষ হ'তে তিনি পূর্ত ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী জনার্দন দীক্ষিতের সঙ্গে মতান্তর শুরু হল, ক্রমে ক্রমে পুনরায় নতুন এক ঠাণ্ডা যুদ্ধে লিপ্ত হ'য়ে পড়লেন বনমালীশংকর ঝা। রমী বি. এ. পাস করার সঙ্গে সঙ্গে একটি তামিল ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইল, ছেলেটি আই. এ. এস. অতএব অরুণা সম্মতি দিলেন, বনমালীও ; ওদের বিয়ে হ'য়ে গেল। অরুণার নার্ভাস টেনশন এবং ব্লাড প্রেসার একটু একটু ক'রে বাড়তে থাকল, যদিও ডাক্তাররা আশ্বাস দিলেন, ভয়ের কিছু নেই, উত্তেজনা বর্জন ক'রে স্বাভাবিক জীবন যাপন ক'রে যাওয়াই একমাত্র চিকিৎসা ; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম ঔষধও অরুণা সেবন করতে লাগলেন। পঞ্চান্ন বছর উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে বনমালীর নিজের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা গেল ; হঠাৎ তিনি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নতুন

ক'রে উৎসাহী হ'য়ে উঠলেন। উৎসাহটা সহসা বা সহজে বাহ্যিক রূপ পেল না, কিন্তু বনমালী দেখতে পেলেন তাঁর কল্পনায়, চিন্তায়, ভাবনায় যৌন পদার্থের মাত্রা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। ক্লাবে, পার্টিতে, এমন কি দপ্তরে স্ত্রীলোকের দেহ তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে লাগল, বিশেষ ক'রে ক্লাবে গিয়ে তিনি ক্রমাগত পরিচিত, অপরিচিত মেয়েদের বুক, পেট, কোমর এবং নিতম্বের ওপর দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। একদিন একটি সুন্দরী তরুণী আপিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে বনমালী বুঝতে পারলেন তাঁর দৃষ্টি কন্যাটির নিচু-কাটা ব্লাউজের আড়ালে নাতিস্ফুট বুক দুটির ওপরই স্থির হ'তে চাইছে। কনট প্লেসে গিয়ে তিনি 'প্লে-বয়' ম্যাগাজিন কিনে এনে প্রথম আপিসে, পরে গৃহে তার আস্বাদন করতে লাগলেন। প্রথম যৌবনে গ্রামে যে সব মেয়েদের বিছানায় পাবার সুযোগ হ'য়েছিল, চোখের সামনে তাদের কল্পিত মূর্তি বার বার ভেসে উঠল।

অরুণা একদিন বললেন, 'তোমার হঠাৎ সেক্স লিটারেচারে উৎসাহ গজিয়ে উঠল কেন? আজকাল তো দেখছি কেবল সেক্সের বইই কিনছ!'

বনমালী হেসে জবাব দিলেন, 'রিটায়ার ক'রে সেক্স নিয়ে লিখব, ভাবছি। বাজার আছে, চাকরি করার দরকার হবে না।'

'বুড়ো বয়সে অনেক পুরুষেরই সেক্সুয়াল ইনটারেস্ট গজিয়ে ওঠে। সাবধান হয়ো। এই বয়সে কিছু একটা ক'রে বসলে লজ্জার শেষ থাকবে না।'

বনমালী বললেন, 'এখনও তো কিছু ক'রে বসি নি, ইচ্ছেও হয় নি। যদি প্রবল ইচ্ছে হয়, তখন দেখা যাবে।'

'তার মানে?'

'মানে, বর্তমানে দুশ্চিন্তার কারণ নেই তোমার। উত্তেজনার তো নয়ই।'

গৌতমের সঙ্গে বনমালীর এ সময়ে খানিকটা দূরত্ব রচিত হ'য়ে গেল। এম. এ. পড়ার সময় গৌতম কিছুটা দলীয় রাজনীতিতে ভিড়ে গিয়েছিল, এবং যে দলের নাম ছিল সি-পি-আই। বনমালীর ব্যাপারটা পছন্দ হয় নি। গৌতমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখতে পেলেন বাবার অপছন্দ তাকে সরিয়ে আনবে না। 'তুমি চিরদিন ব'লে এসেছ, আমি নিজের ইচ্ছেমত জীবন যাপন করতে পারব। কিন্তু যেই মাত্র শুরু করেছি, তক্ষুনি বাধা দিচ্ছ। আগে থেকে বাধা দাও নি কেন? এখন আমি তোমার কোন কথাটা মানবো? যা এতদিন বলে এসেছ, না যা আজ এখন বলছ?' বনমালী এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি।

রাজনীতি করবার জন্যে গৌতমের এম. এ. পরীক্ষার ফল আশানুরূপ ভালো হ'ল না। তাহলেও মেধাবী ছাত্র হিসেবে, অধ্যাপকদের অনুগ্রহে, সে স্কুল অব ইকনমিক্স্-এই একটা রিসর্চ ফেলোশিপ পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করতে লাগল কেম্ব্রিজে ভর্তি হবার। বনমালী বললেন, 'ভর্তি যদি হ'তে পারো, টাকার ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে।' গৌতম বলল, 'একেবারে না ঠেকে গেলে তোমার কাছে টাকা চাইব না। চেষ্টা করছি নিজের দমে চলতে এখন থেকে। দেখা যাক, কতটুকু চলতে পারি।'

একদিন রাত্রিবেলা গৌতমকে ডেকে পাঠালেন বনমালী অফিসঘরে।

'বোসো। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

গৌতম বসলে, 'কেম্ব্রিজের কিছু হ'ল?'

'না, তবে আশা আছে।'

'হালকা না মজবুত?'

'মাঝামাঝি।'

'কবে পর্যন্ত জানতে পারবে?'

'মাস দু'য়ের মধ্যে।'

'যদি না হয়?'

'এখানে পি-এইচ. ডি. করব।'

'তারপর?'

'বছর দুই পড়ালে বিদেশে ফেলোশিপ পেয়ে যাবো।'

'বিদেশে তোমাকে যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'বিদেশে না গেলে ইকনমিক্স্ ভালো পড়া হবে না।'

'তুমি কি এখনও পার্টি করছ?'

'না।'

'পার্টি ছেড়ে দিয়েছ?'

'না।'

'কিন্তু তুমি এখনও কম্যুনিস্ট?'

'তাই তো মনে হয়।'

'তুমি মনে করো সি. পি. আই. বিপ্লব আনবে?'

'বর্তমানের সি. পি. আই. বিপ্লব আনবে না। ভবিষ্যতে কি হবে কি ক'রে বলব?'

'আমি তোমাকে নিয়ে ক'দিন খুব ভাবছি।'

'বুড়ো হ'তে চলেছ, আর তোমার নতুন নতুন মানসিক রোগ হচ্ছে।'

'বাপ ছেলের জন্যে ভাববে, এটা মানসিক রোগ?'

'তোমার ক্ষেত্রে তাই। আমাকে নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আমি বেশ আছি। বেশ থাকব।'

'তোমার জন্যে একটা চাকরি আছে। খুব ভালো চাকরি।'

'কোথায়?'

'দিল্লিতেই।'

'কাদের চাকরি?'

'ঠাকুরদাস রতনলাল। বর্তমানে সারা দেশে অন্যতম প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠান। ওরা একজন ইকনমিস্ট চাইছে।'

'আমি ইনডাস্ট্রিয়াল ইকনমিক্স্ বিশেষ জানি নে। আমার কাজ কৃষি নিয়ে। বলতে পার, ভূমি আর কৃষক নিয়ে।'

'তাতে কিছু আসে যাবে না। ওঁরা তোমাকে পেলে খুশি হবেন। সাতাশ শ'তে শুরু। দুবছর পরে তিন হাজার হবে। তা ছাড়া বাড়ি, গাড়ি এবং অন্যান্য এলাউয়্যান্স্ আছে।'

'বেশ বড় চাকরি তা হ'লে!'

'নিশ্চয়।'

'এত মাইনের চাকরির যোগ্যতা আমার নেই।'

'সে বিচার তোমার নয়, ওঁদের।'

'গৌতমের কণ্ঠস্বর এবার লোহার মত শক্ত : 'চাকরিটা ওরা আমাকে দিচ্ছে, না তোমার ছেলেকে?'

'তার মানে?'

'খুব সোজা। তুমি তো সোজাসুজি ঘুষ নাও না, আশা করি এখনও নাও না। তাই তোমার ছেলেকে চাকরি দিচ্ছে, দিচ্ছে, কি বল?'

'মোটেই নয়। ওরকম হ'লে আমি তোমাকে বলতাম না।'

'বাবা, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। তুমি জান ঠাকুরদাস রতনলাল বিরাট কারখানা বসিয়েছে ইলেকট্রিক ল্যাম্প-পোস্ট তৈরির। তুমি জান, পাম্প-সেট তৈরিতেও ওরা সবার আগে। তুমি জান ঠাকুরদাস রতনলাল দশটি জার্মান, আমেরিকান, সুইডিশ ও বৃটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'কোলাবরেশন' করছে, যার আসল নাম, দালালি। তোমার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা ঠাকুরদাস রতনলালের

পক্ষে অপরিহার্য। আর তাই তারা তোমার ছেলেকে দু হাজার সাত শ' টাকা মাইনের এবং আরও হাজার টাকা উপরির চাকরি দিচ্ছে। আর তাই তুমি আমাকে গ্রহণ করতে বলছ?'

'আমি মিঃ ঠাকুরদাসকে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করেছি, তিনি ইষ্ট দেবতার নাম ক'রে বলেছেন, আমার জন্যে তোমাকে ওঁরা চাইছেন না, তোমার জন্যেই চাইছেন।'

'বাবা ওদের ইষ্ট দেবতার নাম মুনাফা, এবং তিনি লাভের অঙ্ক বাড়তে দেখলে কোনও অন্যায় বা মিথ্যাতেই নারাজ হন না।'

'তুমি এ কাজটা প্রত্যাখ্যান করছ?'

'নিশ্চয়।'

'খুব ভুল করছ। এর জন্য একদিন অনুতাপ হবে তোমার।'

'একটুও ভুল করছি না, বাবা। ভুল করছ তুমি। আমাকে এ ধরনের কাজ করতে বলাটাই তোমার দারুণ ভুল হচ্ছে।'

'কাজটা নিলে তুমি ভালো করতে। দিল্লিতেই থাকতে, বৃদ্ধ বয়সে আমার কখন কি হ'য়ে যায়, তোমার মার কখন কি হ'য়ে যায়, তুমি কাছেই থাকতে। বিদেশে যাবারও অনেক সুযোগ ঘটত।'

'বাবা, তুমি দুর্বল হ'য়ে উঠছ। তুমি জান, এসব সেন্টিমেন্টাল কথায় আমার কিছু এসে যায় না।'

'গৌতম, তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুরহৃদয় হ'য়ে উঠেছ।'

'বাবা, তুমি দুর্বল হ'য়ে যাচ্ছ। এখন যদি না সামলাও, তুমি এর পরে ঘুষ নেবে, রিটায়ার ক'রে যাতে আরও বেশি মাইনের কাজ পাও তার ব্যবস্থা ক'রে নেবে, তোমার সারা জীবনের যা ভিত্তি তা ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে, নিজেকে তুমি একটুও শ্রদ্ধা করতে পারবে না, আমিও তোমাকে আর শ্রদ্ধা করতে পারব না।'

'গৌতম, তুমি যা বলছ তার সব ভুল, তুমি ভুল বলছ, আমি ঘুষ নেব না। রিটায়ার ক'রে কোনও প্রাইভেট ফার্মে কাজ নেব না, বিবেক ও সিভিল সার্ভিস কোডের বাইরে কেউ আমাকে কিছু করাতে পারবে না। আমি কোনও দিন আমার ওপরে শ্রদ্ধা হারাব না, যদি হারাই তাহ'লে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে কঠিন হবে। (গৌতম ঘর থেকে চলে গেল, বনমালী দেখেও লক্ষ করলেন না) কিন্তু, গৌতম, আমি তো একটা নই, আমি দুটো, এক-আমি'র নাম বনমালী, অন্য-আমির নাম গৌতম, এক-আমিকে ছাড়া অন্য আমি বড় শূন্য, বড় ফাঁকা। তুই জানিস নে গৌতম, কি বিরাট আর গভীর ষড়যন্ত্র গ'ড়ে উঠেছে তোকে পিষে মারতে। তোকে বাড়তে না দিতে, তোকে আর-সবার মতো সাধারণ করে রাখতে। এঁরা সব নতুন ভারত

গ'ড়ে তুলছেন, এঁরা আর আমরা, যেখানে কারুর মাথা উঁচিয়ে চলবার উপায় নেই, যেখানে পথ চলতে বার বার দলপতি, গোষ্ঠীপতিদের পায়ে মাথা ঠোকাতে হয়, যেখানে যে যার স্বার্থ গুছিয়ে নিচ্ছে কুৎসিত প্রতিযোগিতায়, যেখানে বিঘোষিত নীতি আর বিলম্বিত বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক্রমাগত ক্ষীণ হ'য়ে আসছে, যেখানে লোলুপ বার্ধক্য শাসন করছে আকাশ-পিয়াসী তারুণ্যকে, দাবি যেখানে অন্যায়, লুকিয়ে গুছিয়ে নেওয়া যেখানে ন্যায়, সেখানে জীবন চলছে হাজার 'না' মেনে, চলতে চলতে পড়ছে মুখ থুবড়ে। এ সমাজ গড়ছি আমরা, গড়ছেন ওঁরা, বড় বড় স্লোগান উড়িয়ে, আমরা বলছি এ নতুন সমাজ, নতুনের পদধ্বনিতে মুখরিত। কিন্তু এ সমাজের নতুনের স্থান নেই এখনও, সেই সনাতন ভারতবর্ষ এখনও বৃদ্ধ, গ্রামে গ্রামে এখনও প্রাচীন অন্ধকার, প্রাগৈতিহাসিক দারিদ্র্য, শহরে শহরে আধুনিক লালসা, ধারাবাহিক ঔদাসীন্য। মরীচিকার অভাব নেই অনুর্বর সমাজে। সমাজবাদের মরীচিকার পেছনে ধেয়ে ওঁরা, আমাদের রথে চ'ড়ে, দুর্বল ধনতান্ত্রিকতার ধূসর উপত্যকায় উপনীত হ'য়েছেন। তোবা এবার চলেছিস বিপ্লব-মরীচিকার পেছনে, যেখানে নিদ্রায় অচেতন, তার ক্রম-স্ফীত সন্তানরা কেবল সব কিছু মাথা পেতে মেনে নিতে জানে, অন্যায় যত কঠোর হোক, অত্যাচার যত ব্যাপক হোক, বঞ্চনা যত গভীর, ছলনা যত প্রাঞ্জল হোক। গৌতম, তোকে আমি নতুন ক'রে তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলাম, সে যে আমারই জরাগ্রস্ত লোভ, যা পাই নি, যা হয় না, যা নেই তার জন্য বেহায়া লাজ্জুক লোভ, যা পাই নি, যা হয় না, যা নেই, যেমন চিন্তার স্বাধীনতা, কর্মের শক্তি, প্রতিবাদের সাহস, প্রতিরোধের সমবেত বল, প্রত্যাঘাতের দুর্জয় সংকল্প, বিজয়ের দুরন্ত কামনা। এ সমাজে নেই, নেই। তাই তোকে লুকিয়ে বাখতে চাই, কোনওমতে বাঁচিয়ে আমার কাছে, আমার মধ্যে, যাতে কেউ তোর খোঁজ না পায়, ওরা, যারা প্রতিবাদ সইতে পারে না, প্রতিরোধকে শিশুহত্যা করতে যারা সর্বদা প্রস্তুত। গৌতম, এ মাটিতে অশোকতরু নেই, যাদের তোরা অশোক বলিস তারাও কেবল উদ্ভিদ, মাটির সঙ্গে সম্পর্ক কেবল শোষণের। গৌতম, বাইরে যাসনে, ঝড়ের ঝাপটা তোর সইবে না, উদ্ভিদ অশোক তোকে ডাকছে, ঘরে আয়, ঘরে থাক, যতদিন না মৃত্যু এসে ক্লান্তকে শান্ত করে।'

এক সময় অরুণা এসে দেখলেন বনমালীশংকর ঝা টেবিলে মাথা রেখে গভীর নিদ্রিত। সামনে হুইস্কির বোতল একেবারে শূন্য।